রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা



সংখ্যা : ০৬ ॥ শরৎ ১৪২৯

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

প্রকাশক
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ৬৭৭০

স্বত্ব
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সংখ্যা : ৬ ॥ শরৎ ১৪২৯ ॥ জুন ২০২৩

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা–১২০৫

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

The Rabindra Biswabidyalaya Patrika
[Bilingual Journal of Rabindra University, Bangladesh]
Editor : Md. Shah Azam
Volume : 06 ॥ Sharat 1429 ॥ June 2023
ISSN : 2709-2348

অনলাইন সংস্করণ : www.rub.ac.bd

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সম্পাদক

প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ আজম

সহযোগী সম্পাদক

মো. জাবেদ ইকবাল

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ আজম (সম্পাদক)
মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ড. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন (সদস্য)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. শেখ মতিউর রহমান (সদস্য)
অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম (সদস্য)
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোঃ রিফাত-উর-রহমান (সদস্য)
চেয়ারম্যান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

দেবশ্রী দোলন (সদস্য)
চেয়ারম্যান, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মো. জাবেদ ইকবাল (সহযোগী সম্পাদক)
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য, অভিমত বা মন্তব্যের দায় সম্পাদনা পরিষদের নয়, তা একান্তই লেখক/লেখকবৃন্দের।

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ISSN নম্বরযুক্ত একটি *Peer Reviewed* গবেষণা জার্নাল। বিশেষজ্ঞ-মতামতের ভিত্তিতে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক-জিজ্ঞাসা ও গবেষণা-ফল সংবলিত প্রবন্ধ জার্নালটিতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ষষ্ঠ সংখ্যা (শরৎ ১৪২৯) প্রকাশিত হলো। বর্তমান সংখ্যায় শিল্পদর্শন, শিক্ষাচিন্তা, সংগীত, সংস্কৃতি, নাটক, কথাসাহিত্য, স্থানীয় সরকার, চিত্রশিল্প ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পনেরোটি গবেষণা-প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পদর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে নিবিড় মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রথম প্রবন্ধে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হকের গল্পে প্রতিফলিত জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়েছে। সমরেশ বসুর ছোটগল্পে রূপোপজীবিনীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে তৃতীয় প্রবন্ধে। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাচিন্তাকে নূতন আলোকে নিরূপণ করা হয়েছে চতুর্থ প্রবন্ধে। সৈয়দ শামসুল হকের নিরীক্ষাধর্মী সামাজিক নাটক *অপেক্ষমাণ*কে নূতন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পঞ্চম প্রবন্ধে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রাসঙ্গিকতাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে ষষ্ঠ প্রবন্ধে। সপ্তম প্রবন্ধে শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবনকে ও অষ্টম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষা-ভাবনাকে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবম প্রবন্ধের মূল বক্তব্য রবীন্দ্র সংগীতের কথা ও ভাবে কালের বিবর্তনের প্রভাবকে নির্দেশ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসে প্রতিফলিত ব্রাত্যজীবন নূতন আঙ্গিকে মূল্যায়িত হয়েছে দশম প্রবন্ধে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে বাংলাদেশের ভোলা জেলার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে একাদশ প্রবন্ধে। বাংলাদেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে দ্বাদশ প্রবন্ধে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রিত ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকর্মসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ত্রয়োদশ প্রবন্ধে। বাংলাদেশের যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে জলাবদ্ধতার প্রভাব এবং তা থেকে উত্তরণের কৌশল নিরূপণ শেষোক্ত প্রবন্ধটির উপজীব্য।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর নূতন মত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন ও গবেষণাফল জ্ঞানের জগতে মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ আজম

সূচি

মোঃ হুমায়ুন কবির ॥ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পদর্শন : উদ্ভব ও বিকাশ ॥ ০১

মাখন চন্দ্র রায় ॥ মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* : জীবনোপলব্ধির স্বরূপ ॥ ১১

মীর হুমায়ূন কবীর ॥ সমরেশ বসুর ছোটগল্পে রূপোপজীবিনী ॥ ২৩

মোহাঃ তানভীর হায়দার ॥ বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাচিন্তা : ব্রিটিশ পর্ব ॥ ৩৯

জান্নাত আরা সোহেলী ॥ *অপেক্ষমাণ* : সৈয়দ শামসুল হকের নিরীক্ষাধর্মী সামাজিক কাব্যনাটক ॥ ৫১

উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রাসঙ্গিকতা (১৯৬০-১৯৮৩) ॥ ৭৭

নূর নাহার শারমিন সুলতানা ॥ শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন ॥ ৯৩

খায়রুন নিসা ॥ 'স্ত্রীশিক্ষা' : রবীন্দ্র সমকাল ও রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি ॥ ১১৫

দেবশ্রী দোলন ॥ রবীন্দ্রসংগীতে কালের বিবর্তন : প্রসঙ্গ কথা ও ভাব ॥ ১২৯

মোছা. চারমিন সুলতানা ॥ বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* : ব্রাত্যজনের কথাশিল্প ॥ ১৩৯

Pinke Rani Dey ॥ Climate Change in Bhola District, Bangladesh : A Study of Coastal Households' Perception of Effects and Causes ॥ 159

Malina Khatun ॥ Strengthening Community Participation in the Management of Upazila and Union Parishad : A Study on Kushtia Sadar Upazila in Bangladesh ॥ 177

S M Saiful Islam & Shakti Pada Halder ॥ A Historical Study of Mughal Miniature Paintings During Emperor Jahangir's Reign (1605-1627) ॥ 201

Piyush Mondal ॥ Impact of Waterlogging and Coping strategies of Women : A Sociological study on Jashore and Satkhira District ॥ 213

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পদর্শন : উদ্ভব ও বিকাশ

মোঃ হুমায়ুন কবির*

[সারসংক্ষেপ : জগতের উৎপত্তি, পরিণতি ও শিল্পের বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক দার্শনিকের মতো ভারতীয় দার্শনিকগণও নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শিল্প সৃষ্টিতে অপরিহার্য কিছু নিয়ম-নীতি তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ে জগৎ সম্পর্কে প্রাচীন চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দিকে মনোযোগ দিলে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সভ্যতা ও সমাজে শিল্পদর্শন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনের জনক গ্রিক দার্শনিক থেলিস মনে করেন, পানি থেকেই জগৎ এবং জগতের সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। এ সময় গ্রিক দার্শনিকগণ ধারণা করেন যে, বায়ু, আগুন ও সংখ্যার সাহায্যে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। একইভাবে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ধারণা, পঞ্চভূতের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি এবং তার মধ্যেই সবকিছু বিলীন। বৌদ্ধরাও বলে থাকেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত তত্ত্বে ৫টি উপাদান রয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানের সাহায্যে জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেই ভারতীয় শিল্প সৃষ্টিতে কিছু নিয়ম-নীতি বা শিল্পতত্ত্ব বা শিল্পদর্শনের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে 'ষড়ঙ্গ' উল্লেখযোগ্য। শিল্প-সমালোচকদের মতে, ভারতীয় শিল্পের বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'ষড়ঙ্গ' এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে 'প্রতীকবাদিতা' ভারতীয় শিল্প সৃষ্টিতে বিস্তার লাভ করে। আলোচ্যমান প্রবন্ধ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পদর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের বিষয়টিকে স্পষ্টতা দানের একটি সামান্য প্রয়াসমাত্র।]

মানবজাতির আদিতম শিল্পে তার প্রথম জয়যাত্রার আনন্দ ও উৎসাহের প্রভা ও তেজ লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে অনেক দার্শনিকের মতো ভারতীয় দার্শনিকগণও নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। বস্তুবাদ সম্পর্কে প্রাচীন চিন্তাবিদদের অনুসন্ধানী চিন্তাই পরবর্তী সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণ এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। আধুনিককালে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পৃথিবী সৃষ্টির মূলে পদার্থের অস্তিত্ব ছিল, আর এই পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে নতুন নতুন শক্তির বা পদার্থের উৎপত্তি হয়। এক অর্থে পদার্থের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে শক্তি রূপান্তর হিসেবেও আখ্যা দেয়া যায়। এই যে নতুন একটি পদার্থ বা রূপের সৃষ্টি হলো, এই রূপটি তার স্বরূপ ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায় অনন্তকাল। প্রতিটি পদার্থের এই স্বরূপ ধরে রাখার চেষ্টাকে পরম্পরা বা ঐতিহ্য বা ইতিহাস বলা যায়। এভাবেই রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি। পদার্থের এই মূল শক্তিটি অদৃশ্যমান, অবিনশ্বর ও সর্বময় বিরাজময় এবং পদার্থের এই মূল শক্তিটির রূপ এক ও অভিন্ন। একইভাবে পদার্থের এই শক্তি রূপান্তর খেলায় রয়েছে সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনশীলতা। বস্তুতপক্ষে এটা বলা যায় যে, শিল্প হচ্ছে পদার্থ ও রূপান্তরিত পদার্থের এমন এক শক্তি যা তার ঐতিহ্য রক্ষায় শূন্য হতে মহাবিশ্বে যেন এক মহাশক্তি। অর্থাৎ শুধু মানবসৃষ্ট সৃজনশীল কর্মই নয়, পৃথিবীর মধ্যে বিরাজমান অন্যান্য কর্মই নয়, এরও বাইরে মহাশূন্যেও শিল্পের অস্তিত্ব বিরাজমান। তবে এই

*সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পদার্থ বা বস্তুবাদকে কেন্দ্র করেই প্রাচীনকালে বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। গ্রিক দার্শনিকদের মতো প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদেরা জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, পরিণতি এবং জগতের রহস্য সম্পর্কে অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছুর আশ্রয় ছাড়াই শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে, পদার্থ থেকেই জগতের সবকিছুর সৃষ্টি। এই পদার্থের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার এক পর্যায়ে সৃষ্টি হয় মনের। যদিও গ্রিসের শিল্পদর্শনের ইতিহাস থেকে প্রাচীন ভারতের শিল্পদর্শনের ইতিহাস বেশ প্রাচীন, তবুও ভারতীয় শিল্পদর্শনের সাথে গ্রিসের শিল্পদর্শনের পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রিসের বিভিন্ন দর্শন ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হলেও ভারতীয় প্রাচীন দর্শনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় (গালিব, ১৯৯০ : ৩)। মূলত প্রাচীনকালে ভারতীয় চিন্তাবিদেরা জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করাতেই শিল্পদর্শনের উদ্ভব হয়। "মানুষের সৃষ্টি শিল্পকে বুঝতে যদি সাধনার দরকার এটা বুঝি, তবে সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টিরচনার ভিতরের ও বাহিরের রহস্য বুঝে চলার জন্যে শিল্পী-মানুষকে কতখানিই না সাধনা করতে হয়" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১৫)। তবে এই শিল্পতত্ত্ব শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই দর্শন বিস্তার লাভ করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে শিল্পতত্ত্ব বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রিক দার্শনিক থেলিস বা মাইলেটাসের থেলিস (থাল্যাস্ হো মিল্যাসিওস্, ৬২৪-৫৫০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রাচীন গ্রিক গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং দর্শনের জনক হিসেবে নন্দিত। তার মাত্র দুটি উক্তি অক্ষত অবস্থায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, একটি হলো "সবকিছুই ঈশ্বরে পরিপূর্ণ" এবং অন্যটি "সবকিছুর আদিমতম উপাদান হচ্ছে জল" (Kenny, 2012 : 10-11)।

তাঁর মতে, জগতের আদি কারণ হলো জল বা পানি; পানি থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি এবং পানিতেই সবকিছুর বিনাশ। অর্থাৎ তিনি পানিকেই পৃথিবীর আদি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করছেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ২৮৩)। বিশ্ব-বিখ্যাত চিন্তাবিদদের কেউ কেউ আবার বায়ু, আগুন অথবা পরমাণুর সাহায্যে জগতের উৎপত্তি ও পরিণতির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ পদার্থকে কেন্দ্র করে জীবনের প্রতিকূল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। *কঠ উপনিষদে* অগ্নি থেকে জগৎ সৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায় : "অগ্নিই প্রথমজাত শরীরী বা বিরাট পুরুষ। ইহা হইতে জগতের উৎপত্তি, এই জন্য অগ্নিকে জগতের প্রতিষ্ঠাতা বা আশ্রয় এবং সর্বলোকের আদি কারণ বলা হয়েছে" (অতুল ও অন্যান্য, ১৯৯৪ : ৭২)। প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ ব্রাহ্মণগণ মাটি, পানি, আগুন, বাতাস এবং আকাশের সাহায্যে জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। আনন্দ থেকেই উপাদানসকল জন্মগ্রহণ করে, আনন্দের সঙ্গেই তারা জীবনযাপন করে এবং আনন্দের অভিমুখেই তারা প্রবেশ করে। এই আনন্দবাদ কিন্তু সুখবাদ নয়। সুখ অগভীর এবং আমাদের বস্তুগত জীবনের ব্যাপার। আনন্দ গভীর এবং ইন্দ্রিয়গম্য সকল কিছুর ঊর্ধ্বে আনন্দের জগৎ। দুঃখ, বিরহ ইত্যাদি আনন্দের অন্তরায় নয়। সুখই আনন্দের অন্তরায়। সুখে মানুষ আত্মহারা ও চঞ্চল হয় এবং অধিকতর সুখের লোভে বস্তুর পিছনে ছোটে। দুঃখেই মানুষের আত্মসমাহিতি ও আত্মোপলব্ধি ঘটে। দুঃখেই আমরা নিজেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। অনাদি-অনন্ত কালপ্রবাহে ও এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের পার্থিব জগতের লাভক্ষতি অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। সে উপলব্ধি বস্তুজগতের সুখের মধ্যে হয় না, হয় দুঃখের দাহে।

বৌদ্ধগণ বলে থাকেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত তত্ত্বে ৫টি উপকরণ রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে *মহাভারত* উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে পঞ্চভূতের উল্লেখ রয়েছে :

> এই জগতে যে-কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদয়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব্যপদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদয় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণীগণের পঞ্চইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক, শ্রোত্র আকাশাত্মক, ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক, রসনা জলাত্মক, ত্বক্ বাতাত্মক ও চক্ষু তেজোময়। (কালীপ্রসন্ন, ২০০১ : ৬৭০)

জগতের উৎপত্তি, পরিণতি এবং মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের উপাদান যেমন পঞ্চভূতের সমন্বয়ে সৃষ্টি তেমনি নিঃশেষও হয় এই পঞ্চভূতেই। অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থ আবার নিজ নিজ স্থানে চলে যায় (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ২৮৬)। অজিত কেশকম্বলীর[২] বিভিন্ন মন্তব্যে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ এবং বায়ু এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে সৃষ্টি। জীব ও জীবন সৃষ্টি হয় এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে এবং মৃত্যুর পর উপাদানগুলো নিজ নিজ স্থানে চলে যায়, শুধুমাত্র চেতনা চলে যায় শূন্যে বা আকাশে। বিশুদ্ধ দীর্ঘনিকায় এর উল্লেখ পাওয়া যায় :

> এই জগতে দান, যজ্ঞ, হোম ও ভালমন্দ কর্মের ফল নাই। ইহলোক-পরলোক নাই, মাতা-পিতা নাই, ঔপপাতিক জীব নাই, পূর্ণজ্ঞান লব্ধ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই, যাহারা ইহলোক পরলোক স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া উহা ব্যক্ত করে। মানুষ চার মহাভূত হইতে উৎপন্ন। মৃত্যুতে মানুষের সকল ধাতু মহাপৃথিবীতে লীন হয়। অপ ধাতু জলে, তেজ ধাতু অগ্নিতে, বায়ু ধাতু বায়ুতে, ক্ষিতি ধাতু ভূমিতে এবং ইন্দ্রিয়সকল আকাশে লীন হয়। মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইয়া উহা ভস্মে পরিণত হয়। (সাধনকমল, ২০০২ : ৭০)

পঞ্চভূতের সমন্বয়ে সৃষ্ট উপাদানগুলোকে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে চিহ্নিত করেন। মূলত এই প্রতীকগুলোই প্রাচ্যশিল্পে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে ভারতীয় শিল্পে পঞ্চভূত বা উপাদানগুলোর অবদান অতিগুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই পাঁচটি উপকরণের প্রতীক সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

মাটি

মাটি অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতীকগত ব্যঞ্জনা হচ্ছে একটি চতুষ্কৌণিক আয়তক্ষেত্র বা কিউব। কিউব হচ্ছে চতুষ্পার্শ্ববিশিষ্ট একটি ঘনাকৃতি। কিন্তু দু'মাত্রার স্বরূপ হচ্ছে চতুষ্কৌনিক রেখাঙ্কনের নানাবিধ বিস্তার এবং সংকোচনকে ব্যবহার করতে তা আঁকা যায়।

পানি

পানির প্রতীক হচ্ছে গোলক। দ্বিমাত্রিকতায় এই গোলক একটি বৃত্তে পর্যবসিত হয়। আমরা জানি পানি যখন আকাশ থেকে পড়ে তখন গোলকের আকারে পড়ে। পানি বাধা পেয়ে যখন অগ্রসর হতে থাকে তখন তার গতি ধারায় আমরা বৃত্ত বা অর্ধবৃত্তের আকৃতি লক্ষ করি।

আগুন

আগুনের প্রতীক হচ্ছে শঙ্কু বা ত্রিভূজ। ত্রিভূজের সূচালো মুখটা উপরের দিকে এবং নিম্নাংশটি সমান্তরাল। আগুন যখন উপরের দিকে উঠে, তখন সূঁচালো হয়েই উঠে। আগুনের গতি শুধু উর্দ্ধে ধাবিত হতে দেখা যায়। এর কারণ আগুনের কোন ভর বা ওজন নেই।

বাতাস

বাতাসের প্রতীক হচ্ছে অর্ধচন্দ্র। যেহেতু বাতাসকে চোখে দেখা যায় না সুতরাং বাতাসের প্রভাবে বিভিন্ন বস্তু যে রূপ বা আকৃতি ধারণ করে, সে আকৃতিকেই বাতাসের প্রতীক হিসেবে নির্ণয় করা হয়েছে। বাতাস সাধারণত চঞ্চল এবং পরিবর্তনশীল। এর চাঞ্চল্যের ফলে যে আকৃতি তৈরি হয় সেটা অনেকটাই আঁকা-বাঁকা রেখার মতো। প্রতীক হিসেবে একেই অর্ধচন্দ্র বলা হয়েছে। বায়ু বা বাতাসের রূপ নেই কিন্তু ধ্বনি আছে, পদ নেই গতি আছে, স্পর্শ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়, একে শিল্পে নিরূপিত করে ধরা সহজ কর্ম নয় (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ২৬)। ঋষির ভাষায় বায়ুদেবতার রূপ বর্ণনায় দেখা যায় :

> রথের ন্যায় যে বায়ু বেগে ধাবিত হন তাঁহাকেই আমি বর্ণন করি : বজ্রধ্বনির ন্যায় ইঁহার আরাব, ইনি বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিতে-করিতে আসেন, ইনি দিক-বেদিক রক্তবর্ণ করিতে-করিতে শূন্যপথে গমনাগমন করেন, ধরণীর ধূলি বিকীর্ণ করিতে-করিতে চলিয়া যান, পর্বতাদি যে কিছু স্থির পদার্থ তাহারা বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে এবং ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ এই বায়ুর প্রতি অভিগমন করে। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ২৭)

আকাশ বা শূন্য

ভারতবর্ষে শূন্যবাদের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। *ঋকবেদ*-এর সময়কালে শূন্যবাদ প্রচলিত ছিল (আনিসুজ্জামান, ২০১৯ : ২৮৫)। জৈন ধর্মাবলম্বীদের চিন্তা-চেতনায় শূন্যবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈনরা বলেন : "শূন্য শূন্য নহে, শূন্য হতে শূন্যই দেখা যায়, ত্রিভুবন শূন্য, পাপ শূন্য, সমস্তই এই শূন্যভাবে বিলীন হয়" (কল্যাণী, ১৯৫০ : ৩৪০)। ভারতবর্ষে মূলত বৌদ্ধ যুগকে শূন্যবাদের যুগ বলা হয় এবং এই যুগেই শূন্যবাদ বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে গৃহীত হয় (কল্যাণী, ১৯৫০ : ৩৭৫)। এই শূন্যতাই মধ্যমা প্রতিপাদ্য (দিলীপ, ২০০৬ : ৪০)। আকাশের প্রতীক হচ্ছে ডিমের আকৃতির। এই ৫টি উপকরণের মধ্যে বৃত্ত এবং ডিম্ব রেখাঙ্কনের জন্য একটি বিবেচনার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তাই চিন, জাপান, ভারতীয় শিল্পে যে কোন বস্তুর গঠন নির্মাণের ক্ষেত্রে মৌলিক আকৃতি হিসেবে বৃত্ত বা ডিম্বকেই আমরা পাই।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে 'ষড়ঙ্গ'

আমাদের এ উপমহাদেশের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরাতন। বিভিন্ন সভ্যতা ও যুগের পথপরিক্রমায় আনুমানিক ৩২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হয়। এই সম্রাজ্যের নাম গুপ্ত সাম্রাজ্য। সময়ের সাথে সাথে তারা উত্তর ও মধ্য ভারতের সর্বত্র এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায় এবং ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ সময় বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সংগীত, সাহিত্য, দর্শনসহ নানা ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এই যুগের শিল্পকলাই ভারতের ধ্রুপদী শিল্পকলা নামে পরিচিত (রফিকুল, ১৯৯৩ : ৪৬)। ধ্রুপদী শব্দটির অর্থ হল উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয়। গুপ্তযুগে শিল্পসৃষ্টিতে যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় অর্থাৎ যা উচ্চ অঙ্গ বা শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা শিল্পশাস্ত্রসম্মত ধ্যান অনুসারে শিল্প বা চিত্র রূপায়ণের রীতি। এই বিধিনিষেধ বা নিয়ম-নীতিই হলো 'ষড়ঙ্গ' অর্থাৎ ষড় অঙ্গ। মূলত এর মধ্যেই রয়েছে ছয়টি অঙ্গ বা বিধিনিষেধ, উচ্চ অঙ্গ বা শাস্ত্রীয়। 'ষড়ঙ্গ' ভারতীয় শিল্পদর্শন, বিষয়বস্তু, আঙ্গিক নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'ষড়ঙ্গ' ভারতীয় শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্প সমালোচকদের মতে, ভারতীয় শিল্পের বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'ষড়ঙ্গ' এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক ঋষিগণ

বলেছেন : "শিল্পশাস্ত্র সমূহের দ্বারায় যজমান নিজের আত্মাকে ছন্দোময় করিয়া যথার্থ যে সংস্কৃতি তাই লাভ করেন এবং প্রাণের সহিত বাক্যকে, চক্ষুর সহিত মনকে, শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিলিত করেন" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১১)। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের মর্মোদ্‌ঘাটনে আমাদের বুঝে নিতে হবে এই চিত্র-শিল্পের বৈশিষ্ট্যটুকু তার ব্যাকরণ, বিন্যাস, রচনাশৈলী। তা না হলে এই বিশ্বনন্দিত শিল্পসামগ্রীর পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়। তৎকালীন প্রচলিত শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাৎসায়ন[৩]-এর বিধানকে রূপকারেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলতেন। বাৎসায়ন রচিত *কামসূত্রের* প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টিকায় যশোধর পণ্ডিত যে শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন, সেটি নিম্নরূপ :

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।।

তবে এই শ্লোকটি কবে থেকে প্রচলিত সে সম্পর্কে যশোধর পণ্ডিত তার রচনায় কোনো তথ্য উল্লেখ করেননি, অনুরূপভাবে বাৎসায়ন রচিত *কামসূত্রেও* 'ষড়ঙ্গ' সম্পর্কিত কোনো তথ্যনির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে বাৎসায়ন যেহেতু তার রচনায় ভারতীয় শিল্পের গুণগত মান বোঝাতে ষড়ঙ্গের উল্লেখ করেছেন, সেহেতু এ কথাটি অনুমান করা যায় যে, *কামসূত্র* রচনার বহুকাল পূর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পীদের কাছে ষড়ঙ্গ সুবিদিত ছিল (হাসান, ২০২০ : ৬১)। ভারতীয় শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ এই ছয়টি অঙ্গ নিয়ে তৈরি হয়েছে ষড়ঙ্গ। যথা :

রূপভেদ

দৃশ্যমান বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান এর অর্থ হলো প্রকৃতির বিশ্লেষণ, গড়ন এবং গঠন সম্পর্কে জ্ঞান, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্য প্রভৃতির পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান। রূপভেদ সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

> এক বলিলেন বহু হইব, এমন করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে। একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪২ : ১২২)

মনুষ্য সৃষ্টি শিল্পকে বুঝতে যদি সাধনার দরকার হয়, তবে সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টিরচনার ভিতরের ও বাইরের রহস্য বুঝে চলার জন্যে শিল্পী-মানুষকে কতখানিই না সাধনা করতে হয় (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১৫)। এই পঞ্চময় জগৎ থেকে শিল্পী একটি বা কয়েকটি বিষয় অবলম্বনে তার আলেখ্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। সেই বিশেষ বিষয়বস্তুর যে বাহ্যিক রূপ, সে সম্বন্ধে চিত্রকরের সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। একই সাথে বিষয়টির আত্মিক ও অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে : "দৃষ্টি দিয়ে যে বুঝে নিলে সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ও তার রহস্য সেই হল রূপকার বা রূপশিল্পী; তেমনি কথাশিল্পী সুরশিল্পী বাক্‌শক্তি ও শ্রবনশক্তির সাধনায় নিপুণতা লাভ করে সৃষ্টির বিচিত্র সুরে সুর মেলাবার রহস্য অবগত হল" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১৫)। অর্থাৎ শিল্প-নিদর্শনটি দেখে দর্শক যেন সহজেই বুঝতে পারে শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে। চিত্র বা শিল্পটির বিষয় নর বা নারী হতে পারে আবার হতে পারে অধিক বয়সী অথবা কোন দেশের কোন শ্রেণির মানুষ, প্রকৃতি, বস্তু প্রভৃতি। হরিণ আঁকলে তাকে অনুসঙ্গতশৃঙ্গ মেষ বলে যদি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন দর্শকদল ভুল করে বসে, তবে বুঝতে হবে শিল্পীর রূপভেদ সম্বন্ধে ধারণা পর্যাপ্ত নয়। রূপ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন :

> নিয়তির নিয়ম হল বিধাতার নিয়ম, আর নিয়তির নিয়ম থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র নিয়ম হল আর্টের নিয়ম। কিন্তু একেবারে যে নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করলে সে আর্ট রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ

> নিরপেক্ষ আর্ট–হয়তো আছে হয়তো নেই। দুই সৃষ্টির নিয়মকে মানিয়ে যে আর্ট তাই নিয়েই রূপদক্ষের কারবার। (অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৫ : ২৫০-২৫১)

প্রমাণ বা পরিপ্রেক্ষিত

রূপের মান, পরিমাণ আকার নিয়ে রচিত হয়েছে। প্রমাণ চিত্রিত বিষয়ের সামগ্রিক অংশ। বিষয়টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ, স্পষ্টতা, অনুমান, গড়ন, গুণ ও তার রূপায়ণ হচ্ছে প্রমাণ। প্রমাণ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন : "প্রমাণানি–বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রমবিহীন জ্ঞানলাভ করা; বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান পরিমাণ, এককথায় বস্তুর হাড়হদ্দ" (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৪৩)। প্রমাণ হচ্ছে বস্তুরূপ সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রমহীন জ্ঞান। এই প্রমাণ অংকশাস্ত্রের গজ, ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদির পরিমাপ নয়, বরং এটি হচ্ছে শান্ত এবং অনন্তকে মেপে ও বুঝে দেখার মাধ্যমে অন্তকরণ, যা এক আশ্চর্য মাপকাঠি। প্রমা আমাদের প্রমাতৃচৈতন্য, যা অন্তর বাহির দু'টিকেই পরিমিত করছে (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৪৩)। প্রকৃতপক্ষে রূপের মান, পরিমাণ, আকার নিয়ে প্রমাণ রচিত হয়েছে। চিত্রিত বিষয়ের সামগ্রিক ও অংশ, প্রত্যংশের মাপের স্পষ্টতা, চিত্রসিদ্ধ অনুমান, গড়ন, পরিপ্রেক্ষিত ও তার রূপায়ণই হচ্ছে প্রমাণবোধ। অর্থাৎ প্রমা একদিকে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয় সকল, আর অন্য দিকে অন্তর্বাহ্য দুই বস্তুরূপ; এতদুভয়ের মধ্যে প্রমাতৃচৈতন্য হচ্ছে যেন মানদণ্ড বা মেরুদণ্ড (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৪৬)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আলোচনায় প্রমাণ-এর চমৎকার উদাহরণ রয়েছে : "কাছের বন সবুজ, দূরের বন নীল রূপ; কাছের গাছটি বড়, দূরের গাছটি ছোট। মানুষের পার্শ্বে কুকুরটি ছোট কিন্তু খরগোশের পার্শ্বে সে মস্তবড় এটাই হলো প্রমাণ" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৪১ : ৩৫০)। প্রমাণ বা প্রমা দ্বারা যে শুধু বস্তুর দূরত্ব বা নৈকট্য বুঝায় তা নয়, বরং প্রমা দ্বারা আমরা বস্তুর দূরত্ব এবং নৈকট্য নিরূপণ করতে সমর্থ হই এবং বস্তুটি কতখানি নান্দনিক হবে তাও নির্দেশ করে (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৭০)। এ সম্পর্কে অননীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

> প্রমাকে সর্বদা জাগ্রত রাখাই হইতেছে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় সাধনা। মাকড়সার মতো চারি দিকে প্রমাজাল বিস্তার করিয়া নিজে মাঝখানটি বসিয়া আছি, আর বস্তুগুলি নিকটস্থ হইয়া জালে পড়িবামাত্র তাহার হাড়হদ্দের সঠিক খবর আমার কাছে নিমেষের মধ্যে পৌঁছিতেছে। (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৪৬)

শিল্পে বিশেষ করে দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য বা দূরপ্রাচ্য সর্বত্রই পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী রীতির শিল্প সৃষ্টিতে এর যথাযথ প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। (হাসান, ২০২০ : ৬২)

ভাব

চিত্র রচনায় নিগুঢ় গভীর রহস্যের অন্তরঙ্গ তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলাই ভাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় : "রূপভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ। রূপের সঙ্গে ভাব সংযোজন করতে হয়" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪২ : ১২৬)। এখানে ভাব শুধু মানুষের ভাবকে বুঝায় না। গাছ-পালা, জীব-জন্তু, প্রকৃতি প্রভৃতি দৃশ্যমান বিষয়ের ভাবকেও ভাব বুঝায়। আকারে বা দেহে অনুভূতির প্রকাশ, প্রভাব, বিস্তার, প্রকৃতি ও মেজাজ সম্পর্কে ধারণা। ভাব বলতে আকৃতির ভাব-ভঙ্গি, স্বভাব, মনোভাব, ব্যঙ্গ ইত্যাদি বোঝায়। নির্বিকার চিত্রে ভাবই প্রথম তার রসবোধের মাধ্যমে বিক্রিয়াদান করে। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ* গ্রন্থ থেকে জানা যায় : "শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকলের বিকার-বিধায়ক হইতেছেন ভাব; বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তি হইতেছেন ভাব।

নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া। নির্বিকার চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করেন" (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৪৮)। চোখ দ্বারা যে ভাবকে আমরা দেখি তা ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ পায়। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গি হচ্ছে হাতের মুদ্রা। হাত ও আঙ্গুলের সংযুক্তিতে মুদ্রার মাধ্যমে এমন সুনিপুণভাব প্রকাশ করা যায়। মনের ভাব প্রকাশের কৌশল হিসেবে মানুষ পঞ্চম ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করে থাকে। ভাব-এর সঙ্গে ব্যঞ্জনার সম্পর্ক রয়েছে। ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত ভাব হলেও প্রকৃতপক্ষে এর পেছনের নিগুঢ় সত্যের উপলব্ধি কেবল মন দ্বারাই করা সম্ভব। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "চোখে আমরা ভাবকে দেখি ও দেখাই ভঙ্গি দিয়া—ত্রিভঙ্গ সমভঙ্গ অতিভঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত এবং অগণিত শাস্ত্রছাড়া সৃষ্টিছাড়া ভঙ্গি দিয়া। কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগূঢ় ভাবটি আমরা কেবল মন দিয়া অনুভব করতে পারি" (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৪৯)। চোখের মধ্যে যে রূপ ভেসে ওঠে তার ভঙ্গিতে রসের সঞ্চালনের মাধ্যমে আড়ালের সত্য আস্বাদন করতে পারাটাই ব্যঞ্জনার মূল লক্ষ্য। মানব-সভ্যতার ইতিহাস এই কথাই বলে। ভাবলোক, রূপলোক, রসলোক—এই ত্রিলোকের অধিকার পেতে বিমুখ এমন মানুষ কোথায় আছে! (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১৩)

লাবণ্য (লাবণ্যযোজন)

লাবণ্য অর্থ লাবণ্য সঞ্চার, সৌন্দর্যের বিকাশ, বিস্তার বা প্রকাশ। রূপের ওজন যেমন প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তার লাবণ্য। শিল্পীর মনেই থাকে লাবণ্যের উৎস। লবণ থেকেই লাবণ্যের উৎপত্তি। মনের মাধুরী বা ভীত, চকিত, মুগ্ধ, বিস্মিত হৃদয়ের স্পর্শে লাবণ্যের সৃষ্টি হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> চিত্রকে আমাদের ষড়ঙ্গকার যে সজীব বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ ষড়ঙ্গেই বিদ্যমান—চিত্রের ছয় অংশ নয়, ছয় দিকও নয়, ছয় অঙ্গ। অঙ্গের সহিত সকলের একটি অকাট্য ও অবিরোধ সম্বন্ধ ঘটাইয়া ষড়ঙ্গটিকে এমন একটা পরিমিত গতি ও ভঙ্গী দেওয়া হইয়াছে যে ষড়ঙ্গটি একটা ছন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন্তরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে না। তা ছাড়া ষড়ঙ্গকার 'যোজনম্' এই শব্দটি ষড়ঙ্গের ঠিক হৃদয়ের মাঝখানটিতে বসাইয়াছেন; ষড়ঙ্গের মস্তিষ্কে ভেদাভেদ জ্ঞান, দুই পায়ের গতি স্থিতি মাঝে, যোগানন্দের হৃদয় গ্রন্থটি দিয়া দুইকে এক করা হইয়াছে। (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ১১)

লাবণ্য হচ্ছে রূপের সর্বাঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ ভাবের ওজন তেমন তাহার লাবণ্য" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪২ : ১২৬)। ভাব এবং ভঙ্গিতে লাবণ্য প্রশান্তির ছোঁয়া এনে দিয়ে চিত্রের শোভাবর্ধনের মাধ্যমে চিত্রকে করে তোলে শীতল, মনোহর ও পরিশীলিত। লবণ ছাড়া যেমন তরকারি স্বাদহীন লাগে তেমনি লাবণ্য ছাড়া শিল্পরূপ অনুসন্ধান বিস্বাদ লাগে। যে কোন শিল্পীর পক্ষে মুক্তার আকারের ধারণা সহজেই করা যায়। কিন্তু তার ঢলঢলে সর্বাঙ্গে তরলিত আভায় যে রূপ, সেটি চিত্রকর ফুটিয়ে তুলতে পারলেই লাবণ্যযোজনা হবে। ঐ আভাটুকু না থাকলেও মুক্তার সৌন্দর্যের কোন ক্ষতি হতো না কিন্তু তার অন্তরের ধূসর চঞ্চল বর্ণটুকু, যা মানুষকে গভীর কান্তি চেতনায় নিয়ে যায়—সেটাই রূপের জীবনময় আনন্দ বা লাবণ্য। (অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৫ : ২৭৯)

সাদৃশ্য

দুটি ভিন্ন জিনিসের রূপ বা আকারের পরোক্ষ বা মনোগত মিল। সাদৃশ্য বলতে স্বরূপ প্রতিচ্ছবি ব্যতীত অন্য রূপের সাথে তুলনা বা উপমা। এক রূপের সাথে অন্যান্য রূপের, এক গতি প্রকৃতির সাথে অন্য গতি প্রকৃতির সংযোগ সাধন। সেই উপায়ে রস ও রহস্যের সৃজন

শিল্পশাস্ত্রে আকারগত ও ভাবগত সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। "সাদৃশ্যের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে রূপের প্রতিরূপটি করিয়া, সোলার সাপ গড়িয়া, লোককে ভয় দেখানো নয়, ঠকানো নয়; কিন্তু কোনো-এক রূপের ভাব অন্য-কোনো রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া।" (অবনীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৫৫)

শিল্পী প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু থেকে আকার নিয়ে মানবদেহে সাদৃশ্যকে চিত্রপটে রূপায়ণ করে তোলেন। দৃশ্যের সাথে তুলনায় সাদৃশ্য তৈরি হয়। সাধারণত দুই ধরনের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এক. অধর্ম সাদৃশ্য : অনুকৃতি বা রূপের অনুকরণ। দুই. উত্তম সাদৃশ্য : ভাবের অনুকরণ। চিত্রের রূপের ভেতর দিয়ে ভাবের সঞ্চালনই সাদৃশ্য। একের ভাব অন্যে উদ্রেক করাই সাদৃশ্য। "কাজেই দেখব, রূপ-রচনার বেলায় সাদৃশ্য উপমা ইত্যাদি কখনই বাদ দেওয়া চলে না। উত্তমের জন্য উত্তম উপমা অধমের জন্য অধম উপমা বড়র জন্য বড় উপমা ছোটর জন্য ছোট—এই হচ্ছে নিয়ম" (অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৫ : ২৮৯)। মূলত সাদৃশ্য হচ্ছে সতর্কতার সাথে রূপের প্রতিরূপটি প্রকাশ করা এবং এক রূপের ব্যঞ্জনা অন্য রূপ দ্বারা ব্যাখ্যা করার নামই সাদৃশ্য।

বর্ণিকাভঙ্গ

উপকরণের সঙ্গত ব্যবহার ও বিন্যাসকে বর্ণিকাভঙ্গ বলা হয়। বর্ণ বিভাজন ও প্রয়োগ কৌশলের সহযোগে বর্ণিকাতেই একটি চিত্রের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। "রঙে আর রূপে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রূপ যেখানে রং সেখানে, রং যেখানে রূপ সেখানে, এই হল স্বভাবের নিয়ম" (অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৫ : ২৯৫)। নানান রকমের বর্ণের সংমিশ্রণে বর্ণবর্তিকার টানটোনের ভঙ্গিই বর্ণিকাভঙ্গ। শিল্পীর হাত ও তুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনাই বর্ণিকাভঙ্গের কাজ। উপকরণের যথার্থ ও সঙ্গত ব্যবহার বিন্যাসই বর্ণপ্রয়োগ। চিত্রপটে রঙসহ তুলির যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলাই বর্ণিকাভঙ্গ। আর এভাবেই শিল্পীর দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে বিশ্ব প্রকৃতির বিরাট রহস্যের বিচিত্র সৌন্দর্যের মর্ম উদ্ঘাটিত হয়। এখানে একজন শিল্পীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই দেখার ফলে পায় শিল্পরচনার পরিপূর্ণতা। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১৭)

প্রাচ্য শিল্পকলা নির্দিষ্ট কিছু দর্শন, বিষয়বস্তু, আঙ্গিক নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য-শিল্পকলায় পরম্পরা চিত্ররীতির অনুবর্তন, রেখার প্রাধান্য, দ্বিমাত্রিকতা, সরলীকরণ, বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ, প্রতীকের ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি, আধ্যাত্মিকতা, অলংকরণধর্মিতা, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর, ধর্মীয় প্রভাব প্রভৃতি বিষয়কে বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়াও এ শিল্পে ভারতীয় ও চীনা ষড়ঙ্গের গুণাবলি বজায় থাকে। পৃথিবীর পূর্ব-দেশীয় বিশেষত ভারত উপমহাদেশ, পারস্য এবং চিন ও জাপানি ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এসব গুণবৈশিষ্ট্যের একটা ঐক্য লক্ষণীয়। উল্লিখিত চিত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই পাশ্চাত্য চিত্রকলা থেকে প্রাচ্য-চিত্রকলা স্বতন্ত্র। এই শিল্প মূলত ধর্মীয় ভাবধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, এই শাস্ত্রে দেবদেবী, গন্ধর্ব, মানুষ প্রভৃতির প্রতিমা বা গড়ন নির্মাণে নিয়ম-নীতি আছে। শিল্পীগণ এই শিল্পশাস্ত্র অবলম্বনে প্রতিমা অথবা মূর্তি বা গড়ন রূপায়ণ করেছেন। এ কারণেই অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> এখন দেখছি ভাবুক ও শিল্পী সেই সাধনার বলে শক্তিমান যে সাধনা প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যুক্ত করে। এই যে নতুন, দর্শন-শ্রবণ-কথনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হল মানুষের আত্মগত ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত রসাত্মরচনা: কবিতা, ছবি, গান, সেই সমস্তকেই বলা চলে দেব-শিল্প অনুসারে রচিত শিল্প-রচনা। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১৯)

ভারতীয় শিল্পের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এই শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অজন্তার চিত্রকলা যে আদর্শে রূপায়িত, কালিদাসের কাব্যতেও সেই আদর্শ পাওয়া যায় এবং কালিদাসের কাব্য পাঠ করলে অজন্তার প্রাচীর চিত্র সম্পর্কে অনেকটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় (মণীন্দ্রভূষণ, ২০১৪ : ৮৩-৮৪)। এই শিল্পকলার মধ্যে বৌদ্ধ প্রতীকবাদিতা লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প মূলত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সমন্বিত প্রতীকবাদিতা নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেকোনো বস্তুর আকৃতির মৌলিক উপাদান এই প্রতীকবাদিতার রীতি অনুসৃত। এই প্রতীকবাদিতাই প্রাচ্যশিল্প বিনির্মাণে বিস্তার লাভ করেছে।

এ ছাড়াও প্রাচ্যশিল্পে ব্যবহৃত ভঙ্গি এবং মুদ্রা এই রীতির শিল্পকে চিরন্তন ও শ্বাশত করে রেখেছে। সব কিছুর সমন্বয়ে প্রাচ্য শিল্পেই যেন সেই ব্যঞ্জনার প্রকাশ পাওয়া যায়। হাতের আঙ্গুলের মুদ্রা যেন কথা বলে। টানা টানা ভ্রু, আধ-আধ উন্মীলিত চোখ, চিকন কোমর, উঁচু বক্ষ, পুরু নিতম্ব, সুবিন্যস্ত কেশরাজী, সুকোমল দেহাবয়ব, মায়াবী চাহনী প্রভৃতি প্রাচ্য শিল্প ও সৌন্দর্যের এক আদর্শ উপমা।

বস্তুত প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শন গ্রিসের বস্তুবাদী দর্শনের চেয়ে প্রাচীন হলেও এর ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ মনে করেন, পঞ্চভূতের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি এবং এর মধ্যেই সবকিছু বিলীন হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেই ভারতীয় শিল্প সৃষ্টিতে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি বা শিল্পদর্শনের উদ্ভব হয়। এর মধ্যে 'ষড়ঙ্গ' উল্লেখযোগ্য। ষড়ঙ্গ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের মর্মোদ্ঘাটনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্প সমালোচকদের মতে, ভারতীয় শিল্পের বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'ষড়ঙ্গ'-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে দেব-দেবী, গন্ধর্ব, মানুষ প্রভৃতির প্রতিমা বা গড়ন নির্মাণে নিয়ম-নীতি আছে। ভারতীয় শিল্প মূলত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সমন্বিত প্রতীকবাদিতা নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেকোনো বস্তুর আকৃতির মৌলিক উপাদান এই প্রতীকবাদিতার রীতি অনুসৃত। এই প্রতীকবাদিতাই ভারতীয় শিল্প সৃষ্টিতে বিস্তার লাভ করেছে। বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রকলা। অতীতকাল থেকেই লোকজ ও দরবারি ঘরানায় ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পকলার বিস্তার ঘটেছে। দরবারি হোক আর লোকজ হোক উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য এসব শিল্পে খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব অজন্তা, পাল, মোগল, কালিঘাট প্রভৃতি ঘরানার চিত্র ও শিল্পকলার রীতি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পরীতির বিষয়, আঙ্গিক, মাধ্যম ও করণকৌশলে পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্যে ধ্রুপদী শিল্প নির্মাণে কোনো নিয়ম-নীতি বা উপাদানের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় নয়। আবার চৈনিক শিল্পের ছয়টি সুনীতি থাকলেও একজন শিল্পীর পক্ষে এক জীবনে এই সুনীতি শেখা সম্ভবপর নয়। শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশেই শাস্ত্র মেনে শিল্প বিনির্মাণে অত্যাবশ্যকীয়তা বা বাধ্য-বাধকতা রয়েছে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত আসা যায় যে, জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেই ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের সাথে সাথে শিল্পদর্শনের উদ্ভব হয়।

টীকা

১. *কঠ উপনিষদ* (কঠোপনিষদ / কঠোপনিষত্) বা কঠক হল অন্যতম মুখ্য উপনিষদ্। আদি শঙ্কর এই উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারক-কঠ শাখার অন্তর্গত এবং বৈদিক সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে সূত্রসাহিত্যের যুগে রচিত। এটিতে বৌদ্ধ চিন্তাধারার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত এটি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পরে রচিত। *কঠ উপনিষদ্* দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং অধ্যায়গুলো আবার তিনটি করে "বল্লী" বা উপপর্বে বিভক্ত। প্রতিটি

বল্লীতে ১৫ থেকে ২৯টি করে শ্লোক আছে। এই উপনিষদের কয়েকটি পংক্তি ভগবদ্গীতা-র সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আধুনিক গবেষকদের মতে, এই উপনিষদে দ্বৈতবাদী দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়।

২. গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অজিত কেশকম্বলীর নাম বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি সবসময় মস্তক মুণ্ডিত করে থাকতেন এবং কেশ দিয়ে তৈরিকৃত পোশাক পরিধান করতেন। এজন্য তাঁর নাম হয় অজিত কেশকম্বল। পরবর্তীতে তিনি অজিত কেশকম্বলী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

৩. বাৎসায়ন : মল্লনাগ বাৎস্যায়ন ছিলেন একজন ভারতীয় দার্শনিক। ধারণা করা হয় তিনি গুপ্তযুগে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে ভারতে বর্তমান ছিলেন। তবে পণ্ডিত মহলে বাৎসায়নের জন্ম গ্রহণ নিয়ে মতানৈক্য আছে। তিনি *কামসূত্র* নামে পুস্তকটি রচনা করেন।

সহায়কপঞ্জি

অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৯৯৪)। *উপনিষদ*। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪১)। *বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

(১৯৯৪)। *শিল্পায়ন*। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(২০০৫)। *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

(২০১৪)। *ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ*। বর্ণায়ন, ঢাকা।

কল্যাণী মল্লিক (১৯৫০)। *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস : দর্শন ও সাধনপ্রণালী*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (২০০১)। *মহাভারত* (দ্বিতীয় খণ্ড)। তুলি-কলম, কলকাতা।

গালিব আহসান খান (১৯৯০)। *বিজ্ঞান, পদ্ধতি ও প্রগতি*। বিধি প্রকাশনী, ঢাকা।

দিলীপকুমার মোহান্ত (২০০৬)। *মাধ্যমিক দর্শনের রূপরেখা ও নাগার্জুনের সবৃত্তিবিগ্রহব্যাবর্তনী*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (২০১৪)। *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মো. আনিসুজ্জামান (২০১৯)। *'প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা'*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চৈত্র ১৩৪২)। *বিচিত্র প্রবন্ধ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

রফিকুল আলম (১৯৯৩)। *উপমহাদেশের শিল্পকলা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাধনকমল চৌধুরী (২০০২)। *বিশুদ্ধ দীর্ঘনিকায়*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

হাসান আশিক (২০২০)। 'ভারতীয় শিল্পের প্রমা জ্ঞান'। *চারুপত্র*, প্রথম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

Anthony Kenny (2012). *A New History of Western Philosophy*. Clarendon Press, Oxford, London.

মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* : জীবনোপলব্ধির স্বরূপ

মাখন চন্দ্র রায়*

[সারসংক্ষেপ : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জনপদের প্রাণস্পন্দনকে উপজীব্য করে সাহিত্যে আধুনিকতা রূপায়ণে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর গল্পকার সত্তা অনুপেক্ষণীয়। যুগ-যুগান্তর বাহিত বাঙালির প্রাণময়তাকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ছোটগল্পের অবয়বে রূপদান করেছেন তিনি। দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ লেখক মাটিমাখা সাধারণ মানুষকেই আবাহন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। কোনো কোনো গল্পে নগর জীবনের প্রতিভাস নির্মাণেও তাঁর শিল্প-কুশলতার পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর লেখার প্রাখর্য, ভাষার সুসমঞ্জস ব্যবহার এবং বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমাজ ও জীবনের বাস্তবিক উপস্থাপনা তাঁকে স্বকীয়তায় ভাস্বর করে তুলেছে। মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) গল্পগ্রন্থে বিধৃত জীবনানুভবের স্বরূপ অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।]

বাংলাদেশের সাহিত্যে ষাটের দশক অধিক সংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত লেখকের আগমনে হয়ে উঠেছিল বহুমাত্রিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রভূমি। মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) এই সময়ের লেখকদের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রম শিল্প-ব্যক্তিত্ব। এক দশকের অপরিসর সাহিত্য জীবনে আটটি উপন্যাস, একটি গল্পগ্রন্থ, একটি কিশোর উপন্যাসসহ বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মাহমুদুল হকের শিল্পভুবন। শিল্পমানে ঋদ্ধ স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসল গড়ে নিয়েছেন তিনি। দোষে-গুণে ভরা রক্ত-মাংসের মানুষকে সাহিত্যের কেন্দ্রে রেখে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সবকিছুকেই অবলীলায় স্পর্শ করে গেছেন লেখক। চেনা-অচেনা কিছু চরিত্রের বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তবকে রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জীবনকে তিনি দেখেছেন অপার সম্ভাবনার আধার হিসেবে। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি সাহিত্যে প্রচল সমাজকে অঙ্গীভূত করেছেন। শৈশবে হারানো জন্মভূমির স্মৃতি, স্বদেশের পরিজনের সঙ্গে অতিবাহিত সময়ের সুখ-দুঃখ তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার। দেশ-বিভাগের পূর্ববর্তী ও অব্যবহিত সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্রও উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। বর্তমানের মাঝে তিনি পেছনে ফেলে আসা প্রকৃতি-পরিবেশ ও স্বজনদের খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেক্ষণবিন্দুর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের সঠিক চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) গল্পকার মাহমুদুল হকের সাফল্যের চূড়াস্পর্শী গল্পগ্রন্থ। যাপিত জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও চিরচেনা কিছু চরিত্রের মেলবন্ধনে ঋদ্ধ মোট এগারোটি ছোটগল্প এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অসাধারণ বয়নকৌশল ও ভাষার হৃদয়গ্রাহী বুননে তাঁর গল্প পাঠককে এক মুগ্ধতার জগতে নিয়ে যায়। *প্রতিদিন একটি রুমাল* গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই ভিন্ন সুর ও স্বরের সমন্বয়ে ঋদ্ধ। টুকরো টুকরো স্মৃতি, ঘটনাংশ আর প্রাণময়তায় সমৃদ্ধ গল্পগুলো অত্যন্ত সজীব ও সঞ্জীবনী ক্ষমতাপুষ্ট।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের নানা বাস্তবতার গল্প রচনা করেছেন মাহমুদুল হক। অসামান্য ভাষামাধুর্য, চরিত্রচিত্রণ আর নির্মাণ-কুশলতায় মানবপ্রবৃত্তির সঙ্গে গভীর নৈকট্য অর্জনের সামর্থ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম কুশলী কণ্ঠস্বর। ঔপন্যাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত মাহমুদুল হক গল্প লিখেছেন কিন্তু প্রকাশের ব্যাপারে মনোযোগী হননি। প্রায় না-লেখার সময়ে এসে প্রকাশ করেছেন *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) আর *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৯)—যার কলেবর ধারণ করেছে পূর্বোক্ত গ্রন্থের এগারোটির সঙ্গে নতুন তিনটি মিলিয়ে মোট চৌদ্দটি গল্প। পরবর্তীকালে প্রকাশিত *মাহমুদুল হকের অগ্রন্থিত গল্প* (২০১০) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিয়াল্লিশটি গল্প। অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থিতের চেয়ে অগ্রন্থিত গল্প তিনগুণ বেশি। "মাহমুদুল হকের ঔপন্যাসিক স্বভাব যতটা বিকশিত ও নিজের কাছে স্বচ্ছ ছিল, ততটা ছিল না গল্পকার হিসেবে" (সিরাজ, ২০১৪ : ৭৯)। তাঁর আত্মস্বীকৃত দুর্বলতাজনিত অনীহা অর্থাৎ সৃষ্টিশীল অতৃপ্তির ফলেই হয়তো গল্পগুলো তিনি গ্রন্থনায় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সাবলীল বর্ণনা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, ধীর-স্থির মানবিক জিজ্ঞাসায় ঋদ্ধ তাঁর *প্রতিদিন একটি রুমাল* গ্রন্থের গল্পগুলো। অত্যন্ত সুকৌশলে তিনি মানুষ ও সমাজ, প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব, সত্তা ও প্রবৃত্তি নিয়ে আপাত নিস্পৃহ অথচ তীক্ষ্নভেদী ভঙ্গিতে সাহিত্যে খেলা করেছেন।

মাহমুদুল হকের আধুনিক শিল্পচৈতন্যের স্পর্শে তাঁর ছোটগল্পের রূপনির্মাণ ও পরিবেশনায় আধুনিকতার স্পন্দন স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। গ্রামীণ সাধারণ জীবনের প্রতি সহজাতভাবে আকৃষ্ট গল্পকারের সাহিত্যে সাধারণ মানুষেরাই আঞ্চলিকতার স্পর্শমণ্ডিত হয়ে অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপিত হবার অবকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে আত্মস্থ করে বিষয়ানুযায়ী নির্মিত চরিত্রের কণ্ঠে তিনি সেই ভাষার উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। আটপৌরে ভাষার কুশলী ব্যবহার তাঁর ছোটগল্পের স্ফূর্তি ও শিল্পমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছে। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে বয়নে ও চিন্তনে জীবনের অদেখা ভুবনের পরিচায়ক মাহমুদুল হক ছোটগল্পের জগতেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর *প্রতিদিন একটি রুমাল* গল্পগ্রন্থে পরাভূত জীবন, বিপন্ন সময় ও বিচূর্ণ স্বপ্নের আটপৌরে জীবনের টানাপোড়েনের চিত্র পাওয়া যায়। যাপিত জীবনের নানা সংগ্রাম-সংঘর্ষ এমনকি মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিরুদ্ধ যন্ত্রণা ও স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এই গল্পগ্রন্থে ভিন্ন আঙ্গিকে চিত্রিত হয়েছে। মাহমুদুল হকের গল্পসমূহে স্বপ্নচারী প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মানুষেরা নস্টালজিক জগতের বাসিন্দা। সংকটময় সময়ের চাপে প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা গল্পের কেন্দ্রে এসে হাজির হয়। দেশ-বিভাগের ফলে শেকড়বিচ্যুত এই অনিকেতন মানুষেরা অন্তরে এক পরাভবকামী বেদনা বহন করে চলে। মাহমুদুল হকের গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই তাই নিভৃতচারী, অল্প আঘাতেই কাতর হয়ে তারা বর্তমান থেকে অতীতে পলায়ন করতে চায়। শেকড়-সন্ধানী এই চরিত্রগুলো ভয়ানকভাবে বেদনামগ্ন। এছাড়াও মধ্যবিত্তের বিধ্বস্ত জীবনের চালচিত্র এ গ্রন্থে নানাভাবে উঠে এসেছে। অস্থির সময়ে স্বার্থপরের মতো অপমানিত মানুষের নিরুপায় আপসকামিতায় নিমগ্ন সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত মানসও বিম্বিত হয়েছে তাঁর গল্পভাষ্যে। টিকে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনে সামাজিক বিশ্বাস, আবহমান নীতিবোধ, মানবীয় মূল্যচেতনাকে বিসর্জন দিয়েছে মানুষ। মাহমুদুল হকের গল্পে দুর্বহ সময়ে মানবীয় নৈরাজ্যের এইসব দুঃসহ অভিজ্ঞতা বাণীরূপ লাভ করেছে।

মাহমুদুল হক তাঁর 'হৈরব ও ভৈরব' গল্পে ইছামতী পাড়ের এক বাদ্যকার পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনিকে গল্পরূপ দিয়েছেন। হৈরব ও তার পুত্র ভৈরবের ব্যক্তিজীবন সূত্রে অনাবৃত হয়েছে তাদের যাপিত জীবনের গ্লানিকর অভিজ্ঞতার চিত্র। পিতা-পুত্রের কাহিনির মধ্যে অনিবার্যভাবেই লেগেছে সময় সমাজ রাজনীতির তীব্র অভিঘাত। দেশ-বিভাগ, সামন্ত অর্থনীতির ভাঙন ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাম্প্রদায়িক অনাচারে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তাদের গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা। প্রতিদিন হাজারো তুচ্ছ অপমান ও কদর্য টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভৈরবের লাঞ্ছিত জীবন কেটে যায়। "মন অন্নময়, অন্ন নাই তো মনই নাই"—এই অন্নের ভাবনা দুই বাপ-বেটা, হৈরবের স্ত্রী যোগমায়া, যোগমায়ার ভাষায় হৈরবের 'ভাতার খাকি বোন' দয়ার

মধ্যেও সংক্রমিত। গনিমিয়ার ঋণের জালে বন্দি হৈরব সংসার জীবনেও কোণঠাসা। ননদ-ভ্রাতৃবধূর তুমুল ঝগড়া হৈরবের মনের দুর্ভাবনাকে তীব্র করে তোলে। বাস্তবতার জটিল আবর্ত হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় হৈরব হয়ে ওঠে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত এক বিষণ্ন মানুষ। কলহে ক্লান্ত যোগমায়া যখন পা লম্বা করে কাঁদতে বসে হৈরব তখন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে অতীতের স্মৃতি হাতড়ায় :

> ভৈরব নিজের কাছে কাঁদবে বলে পা বিছিয়ে বসে। কত কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সিরাজদিখাঁর সেই পাতক্ষীরের কথা, জীবে স্বাদ লেগে আছে এখনও। মনে পড়ে রামপালের কলামুলোর কথা, গাদিঘাটের কুমড়ো, আড়িয়াল বিলের কই মাছ, কত কিছু। আতরপাড়ার সেই দই, আহারে, সব গেল কোথায়। গোটা গ্রাম জুড়ে ছিল কদমের বন, বর্ষার নদী ধীর মন্থর গতিতে কেঁপে উঠে শেষে কদমের বনে গিয়ে ইচ্ছে করে পথ হারিয়ে 'এআমারকিহলগো' ভান ধরে ছেলেমানুষিতে মেতে উঠত। এখন গ্রাম কী গ্রাম উজাড়, দেশলায়ের কারখানা গিলে ফেলেছে সবকিছু। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৩৫)

অতীতে হৈরব মেলায়-উৎসবে-পার্বণে ঢাক বাজিয়ে আনন্দ পেয়েছে ও উপার্জন করেছে। সময়ের অনিবার্যতায় একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যাওয়ায় এখন আর ঢাকের সেই পসার নেই। মুসলিম রমজানের সঙ্গে তার কন্যা ভানু ঘর বাঁধায় পরিবারের সবাই ভুলে গিয়েছে তাকে। বাদ্যকার হৈরবের কোমল হৃদয়ে তার কন্যাস্মৃতি তোলপাড় করে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে গ্রামজীবনে ভাঙন আসে। সংস্কৃতির আবহমান রূপটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। হৈরবের স্মৃতিলোকে চকিতে দেখা দেয় অতীতের সামষ্টিক প্রাণপ্রবাহ আর নাড়িছেড়া মেয়ে ভানুর কল্পকথা। বড় ছেলে ভরত ভারতে গিয়ে প্লাস্টিক ফুলের মালিগিরি করে দিন চালালেও ঢাকী বাপকে সে অস্বীকার করতে চায়। পূজার সময় কলকাতার ঢাক বাজাতে গেলে একদিন ছেলে ভরত তাকে নির্দয়ভাবে তিরস্কার করে। পুত্রের এই লাঞ্ছনায় তীব্র উদ্বাস্তুবোধ নিয়ে হৈরব মনের অজান্তেই আস্তিক্য চেতনায় পৌঁছে যায়। বৈরি সময় ও মানুষের রূঢ় চাপে তার মধ্যে তৈরি হয় গভীর নিরস্তিত্বের বোধ। নব্য পুঁজি গ্রামের সংহতি নষ্ট করেছে, নদী তছনছ করেছে বসতভিটা। নিয়ত ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে নিরুপায় নিরাশ্রয় হৈরব বিকল্প আশ্রয়ের সন্ধানে স্মৃতিলোকে নিমগ্ন হয়।

গল্পকার মাহমুদুল হক আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার আলোকে গল্পের নায়ক ভৈরবের সামনে উপস্থিত করেন স্মৃতিআশ্রয়ী এক বিকল্প জীবনপট। হৈরবের জীবনের লড়াই প্রান্ত থেকে এক সময় কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়। ব্যক্তি হৈরব সংঘবদ্ধ হবার ব্রত জানে না বলে গনিমিয়ার লালসা হতে বোন দয়া ও পৈতৃক ভিটা রক্ষার জন্য অনুনয় করে। নিয়তিকে হৈরব যেমন অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি পারেনি তার পুত্র ভৈরবও। কলুবাড়ির পুকুরপাড়ে জ্যোৎস্নালোকিত জঙ্গলে গানিমিয়াকে ঢাকের বাজনা শোনাতে গিয়ে প্রতিশোধকামী হয়ে ওঠে ভৈরব। গনিমিয়ার চামড়ায় দশখুশি বাজাতে চায় সে। কিন্তু বাজনা শেষে ভৈবর লক্ষ করে :

> গনিমিয়ার পিঠ নয়, পরিশ্রান্ত ভৈরব এক সময় অবাক বিস্ময়ে দেখে এতক্ষণে তার নিজের ঢাকের গায়েই সর্বশক্তি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে; চামড়ার দেয়াল আর ছানি ফেঁসে গেছে, চুরচুর হয়ে ছিটকে পড়েছে টনটনে আমকাঠি, বেঘোরে নিজের ঢাকটাকেই চুরমার করেছে এতক্ষণ। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৪১)

এই নিস্ফল প্রতিশোধস্পৃহার মধ্যেই নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বাভাবিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। মনের ক্ষোভকে চাইলেই বাস্তবে রূপ দেয়া যায় না—বিধায় 'হৈবব ও ভৈরব' গল্পটি কয়কীর্তন গ্রামের সামূহিক বাস্তবতার বয়ান হয়ে ওঠে। মাহমুদুল হক আঞ্চলিক ভাষার আবহে রূপময় করে তুলেছেন আর্থ-সামাজিক অনুশাসন ও দীর্ঘ বঞ্চনার বিপরীতে লাঞ্ছনা ও শোষণের বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত স্বপ্নসঞ্চারী জীবনের অবিনশ্বর আলোর স্পন্দন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি*

নদীর নাম (১৯৫৬) অথবা সমরেশ বসুর *গঙ্গার* (১৯৫৭) মতো মাহমুদুল হক নিপীড়িত জীবনের অন্তর্গূঢ় বৈচিত্র্যকে অপরিসীম মাহাত্ম্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। পরম্পরাগত পেশা, হাজার বছরের সংস্কৃতি আর চর্চিত জীবনাচার থেকে নির্মম বাস্তবতায় নির্বাসিত হয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ববাসনা, দ্রোহ ও দৃঢ়তা উচ্চকিত হয়েছে চলিষ্ণু কালস্রোতে।

নাগরিক পটভূমিতে রচিত গল্পগুলোতে মাহমুদুল হক আপসহীনভাবে জীবনের কানাগলি অন্বেষণ করেছেন। শহুরে মানুষের হীনতার নির্দয় অবয়ব তার গল্পের ছায়াহীন ভূখণ্ডে মানুষের অকপট দুঃখ হয়ে সহজ মহিমায় উন্মোচিত হয়েছে। "কোথাও এড়িয়ে যাওয়া নেই ঘুরিয়ে কথা বলা নেই, কোমল সহনীয় করে উপভোগ্য জীবনের মায়ারূপ সৃষ্টির কোনো ব্যর্থ চেষ্টা নেই" (চঞ্চল, ২০১৯ : ৭৮)। 'জোনাকি', 'অচল সিকি', 'সপুরা ও পরাগল', 'অচিনপুর' প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্তের সংকট-গ্লানি-ক্ষয়িষ্ণুতা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি সুগভীর অনুরাগ উপনীত হয় মানবিক স্তরে। 'জোনাকি' গল্পে আবুল হোসেন সন্তান কর্তৃক নির্মমভাবে অপমানিত হয়েও মেলে ধরেন পিতৃস্নেহের কাতর করতল। আবুল হোসেন এখানে গড়পড়তা মধ্যবিত্তের ব্যর্থ জীবনের আদর্শবাদী ম্রিয়মান প্রতিনিধি। একাত্তরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সেজ ছেলের কষ্ট বুকের ভেতর পোড়ালেও ছোট ছেলে নাগা এবং কন্যার উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ তিনি। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তথা পুরো সংসারের উপর নিয়ন্ত্রণহীন এমন মানুষের আশ্রয় হয়ে ওঠে স্মৃতি ও প্রকৃতি। এজন্যই দুদিনের কথা বলে দশদিন গ্রামে কাটিয়ে আসতে হয় তাকে শান্তির আকাঙ্ক্ষায়। মানবিক সম্পর্ক হারিয়ে ফেলার এই ভয়াবহ সংকট নাটকীয়ভাবে উদ্ভাসিত হয় পুত্র কন্যার কক্সবাজার থেকে ফেরার পর কৈফিয়ত না দেয়া, পুত্রের পক্ষ নেয়া স্ত্রী ও পুত্রের হাতে আবুল হোসেনের প্রহৃত হওয়ার মাধ্যমে। সন্তানের হাতে প্রহৃত হয়ে আবুল হোসেন ছন্নছাড়া উৎকেন্দ্রিক মানুষে পরিণত হয় :

> ইচ্ছে হয়, ভালো করে মাথা ভিজাতে। ভরা বালতির ভেতরে মাথা গুঁজে দিতে। অবসন্নতা ক্রমশ কাবু করে ফেলে তাঁকে। অবসন্নতা, মনোবেদনা, স্থবিরতা এদের আর এখন কোনো সংকোচ কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। বয়সের কাছে নিদারুণভাবে তিরস্কৃত আবুল হোসেন, বয়স তাঁকে ধিক্কায় দেয়। গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে গ্লানির গরল, অদ্ভুত এক গ্লানি। শৈশবে বিমাতার সংসারে নির্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন আবুল হোসেন, মনে পড়ে সেইসব। মনে পড়ে গ্রাম, এক একটি দীর্ঘদিন, গ্রামের জলবায়ু, মেঠোপথ, বিস্তীর্ণ শস্যখেত, মাটির গন্ধ, হুহু বাতাস, প্রহৃত হলেও সেখানে এসব ছিল। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৪৫)

বিত্তের দাপটে বিক্রীত মানুষের আত্মা পচে গেলে সে নিপতিত হয় বাস্তবতার অতল গহ্বরে। প্রহৃত পিতাকে কন্যা এসে হাত ধরে স্নিগ্ধ স্বরে খাবার খেতে ডাকলে তাকে যেতে হয়। জীবন হয়ে ওঠে এমনই জোনাকির ডাকের মতো—বাতাসে গ্লানিজনিত আর্তির মাঝে ক্রোধে অপমানে ছিন্নভিন্ন হয়ে বেরিয়ে যেতে চায় সকল বন্ধন থেকে। ভেতর নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আবুল হোসেনের অভিমানী মনে ঘুরে ফিরে আসে উন্মুল বেদনা। জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার ভার তাকে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ করে দেয়। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে বাস্তুত্যাগী গল্পকারের নিজের অভিমানী সত্তাই যেন উদ্ভাসিত হয় আবুল হোসেনের মধ্যে। মৃত্যুবোধের এক গভীর বিষণ্ণতা শেকড়ের কান্না হয়ে তাকে উৎকেন্দ্রিক গৃহচ্যুত করে তোলে। ভারতীয় চিরাচরিত মূল্যবোধের গোড়ার কুঠারাঘাত করে নাগা ধসিয়ে দেয় পিতাপুত্রের সম্পর্কের নিবিড় সূত্রটি, আর পরিস্থিতির কাছে পরাভূত পিতা উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে নিজেই পান করেন বিনাশী সময়ের তীব্র হলাহল। আবুল হোসেনের এই নিদারুণ আত্মসমর্পণের প্রেক্ষাপটে জীবনের বেসুরো এক চিত্রকে অনায়াসে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন গল্পকার।

মাহমুদুল হক তাঁর অধিকাংশ গল্পে মানুষকে বহুমাত্রিক সম্ভাবনাসহ উপস্থাপন করেছেন। 'অচল সিকি' গল্পে নবদম্পতি এনামুল-জেবুন্নেসা এক নির্জন বনভূমিতে বেড়াতে যায়। গল্পের শুরুতে শালবন বিহারের গেটে ঢুকেই দারোয়ানকে পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে আর এই বিরানভূমিতে

একাকি বসবাসের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে মেয়েটি তার মমতাময়ী হৃদয়ের পরিচয় পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। বয়ান ও বয়নে একটু একটু করে ভাজ খুলে বেরিয়ে আসে জেবুন্নেসার প্রেমাকুল হৃদয়, এনামুলের কবিত্ব, স্ত্রীর স্কুল শিক্ষকতার অর্থে নির্ভরতা—সবকিছু। তাদের কথাবার্তা ও খুনসুটিতে গল্প এগিয়ে যেতে থাকে। শালবন বিহারের জনমানবহীন রাস্তায় হাটতে হাটতে তারা জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেয় এক অশীতিপর বৃদ্ধের চায়ের দোকানে, নির্জন এই দোকানে চা-পানি পান, বৃদ্ধের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কাহিনি শুনে সজল হওয়া—সবকিছুই মানবিক আবেদনে পূর্ণ। গল্প আরেকটু এগুলে জানতে পারি এনামুল-জেবুন্নেসা দম্পতি নিঃসন্তান। কিন্তু তখনও গল্পের আসল চমক বাকী রেখেছেন গল্পকার। গল্পের একদম শেষে এসে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয় জেবুন্নেসার আসল চেহারা। নিস্তব্ধ নির্মল প্রকৃতি ভেদ করে প্রকটিত হয়ে ওঠে জেবুন্নেসার ভেতরকার অন্ধকার। পাঠক এক বিমূঢ় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যখন সে বলে—"খুব তো ভয় দেখিয়েছিল যে ওই আনিঘষা সিকিটা চালাতে পারব না, বুড়ো কিন্তু টেরই পায়নি! [...] সেই অচল সিকিটার সৎকার করে এলাম" (মাহমুদুল, ২০২১ : ৫৫)। গল্পের শুরুতে দাড়োয়ানকে অকারণে পাঁচ টাকা দেয়া জেবুন্নেসা অসহায় বৃদ্ধকে তার ন্যায্য আট আনা ঠকিয়ে দেয়। 'শিয়াল রাজার বাড়ি' দেখতে গিয়ে এই দম্পতি নিজেরাই শৃগালপ্রতিম হয়ে ওঠে। মেকি মানবিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জেবুন্নেসার কদর্য রূপ বেরিয়ে আসে। মায়াময় ও সহানুভূতিপূর্ণ মানুষগুলোর ভিন্নতর রূপ প্রত্যক্ষ করে পাঠক বিস্মিত হয়ে যায়। মাহমুদুল হক 'অচল সিকি' গল্পের মাধ্যমে যেন জানিয়ে দেন, মানুষ তাহলে এরকমই! বাইরে থেকে তাকে যেমন দেখা যায় সে আসলে হুবহু সেরকম নয়। তাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অবকাশ আছে; তাকে বোঝার জন্য আলাদা অবলোকন প্রয়োজন।

'বুলু ও চড়ুই' গল্পে আইয়ুবি সময় থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতায় বিপর্যস্ত একটি পরিবারের করুণগাথা বিধৃত হয়েছে। স্বল্পায়তন এই গল্পে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রচ্ছদপটে ইতিহাসের কিছু নির্মম সত্য স্থান পেয়েছে। স্বৈরশাসক আইয়ুবের সময়পর্বে সর্বাত্মক নিপীড়নের অংশ হিসেবে বুলুর পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বুলুর ভাই অনুর কারণে তাদের বাবাকে চাকরি খোয়াতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা বুলুকে তুলে নিয়ে যায়। এদের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে অপমানিত বুলু মৃত্যুর পথ বেছে নেয়নি বরং স্বপ্নময় স্বদেশের মানুষের মহানুভবতার মধ্যে মুক্তির স্বাদ অনুসন্ধান করেছে। নীলিমা ইব্রাহিমের *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১৯৯৪), শাহীন আখতারের *তালাশ* (২০০৪) প্রভৃতি উপন্যাসে বীরাঙ্গনাদের দুর্দশার চিত্র প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে। এই গল্পে মাহমুদুল হক বীরাঙ্গনাদের বিড়ম্বিত চিরপরিচিত জীবনকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। বুলুর ভাই অনু একাত্তরের যুদ্ধে চলে গেলে তার বাবা এই অপরাধে পাক আর্মিদের হাতে বন্দি ও নির্যাতনের শিকার হয়। কয়েকবার বাড়ি পাল্টিয়েও শেষ রক্ষা হয় না তাদের। ধর্ষিতা অবিবাহিতা বুলু মর্মান্তিক নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে মুক্ত স্বদেশের স্বপ্ন দেখে খড়কুটোর বাসাচ্যুত চড়ুই ছানার প্রতীকে :

> 'বাসা থেকে বাচ্চাটি পড়ে গিয়েছিল, কী জানি কী করে। যতবার তুলে দেই ততবারই ওরা ঠুকরে ঠুকরে ওকে নিচে ফেলে দিচ্ছে, অবাক কাণ্ড না?'
> বুলু বললে, 'ওরা তো তোদের মতো মানুষ নয়!'
> 'তার মানে? তোর কথার কোনো মাথামুণ্ডু বুঝি না–'
> 'মানুষ বড় ভালো', বুলু বললে, তার চোখ তখন ভেজা ভেজা। বললে, 'মানুষ বড় সুন্দর!' (মাহমুদুল, ২০২১ : ৫৯)

পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা নিপীড়িত বুলু খুঁজে ফেরে স্নিগ্ধ কোমল মানবীয় স্পর্শ। তাই বাসাচ্যুত চড়ুই ছানার মতো বুলু নিজেকে পরিজনছিন্ন উপেক্ষিত মনে করে না। অনুর মতো ছেলেদের বুকে দেশপ্রেমের আবেগ আছে বলেই যুদ্ধোত্তর স্বদেশে নির্যাতিত বুলু বেঁচে থাকার ভরসা

পায়। পরিমিত সংলাপে ও গভীর নৈঃশব্দ্যের আবহে গল্পকার একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে মানুষের অনন্য অবদান ও আত্মবিসর্জনের কথা উপস্থাপন করেছেন। সমস্ত কলুষতা ও বেদনাময় স্মৃতির অন্ধকার থেকে মানুষ মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে মানবিক চৈতন্যের অনিঃশেষ আলোক-উৎসে।

জীবন সায়াহ্নে এক বৃদ্ধের জীবনের পাপ-পুণ্যের খতিয়ান 'বুড়ো ওবাদের জমা-খরচ' একটি অদিম বধ্যভূমির গল্প। সুবচনী নামের প্রাচীন একটি গ্রামে সংঘটিত নরমেধ যজ্ঞের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে এই আখ্যানে। বৃদ্ধ ওবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত এ গল্পে রূপক-আঙ্গিকের অনুসন্ধানও করা যেতে পারে। ব্রিটিশ আমল থেকে চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত সুবচনী গ্রামের মানুষদের জড়ো করে হত্যা করা হয়। গ্রামের এই মানুষদের হত্যাকাণ্ড যেন বাংলাদেশের রক্তাক্ত ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুবচনী গ্রামটিই যেন হয়ে ওঠে একাত্তরের বাংলাদেশ, অসংখ্য বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়েছিল নিরীহ বাঙালিকে। নারী-পুরুষ-শিশুর আর্ত চিৎকারে কেঁপে উঠেছিল একাত্তরের আকাশ। সুবচনী গ্রামের লাঠি-সড়কি সজ্জিত বেপরোয়া যুবকেরা হয়ে ওঠে হিংস্র পাকবাহিনীর প্রতিচ্ছবি। খুনে দুর্বৃত্তরা সুবচনী গ্রামকে অভিশপ্ত জনপদ মনে করেছিল, যেমনটি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা মনে করেছিল বাংলাকে। এভাবে এক আদি জনপদের অনুষঙ্গে উদ্ভাসিত হয়েছে মৃত্যুতাড়িত একাত্তরের রক্তাক্ত ছবি।

ডাকাত পাড়ার ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর ওবাদ তিনটি শিশুকে দাফনের ব্যবস্থা করে। আর এই নিষ্পাপ শিশুদের সমাহিত করার পূণ্য নিয়ে সে পাড়ি জমাতে চায় ওপারে। ওবাদের মতো একজন অন্যায়কারীও শেষ পর্যন্ত কিছুটা পূণ্য অর্জনের সুযোগ পায়। হতাশার মাঝেও কিছুটা আশার বাণীর সম্ভাবনা রেখে দেন লেখক—এখানেই মাহমুদুল হকের নিজস্বতা। যাপিত-জীবনের কালো অভিজ্ঞতা ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত অসহায়ত্বের অন্তর্স্রোতে ব্যক্তি হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে মানবিক অনুভব। পিতা-মাতার চৌর্যবৃত্তির অপরাধে তাই খুন হয়ে যাওয়া শিশুর গলিত লাশ কবরস্থ করতে গিয়ে এক অপার্থিব আচ্ছন্ন গলায় বুড়ো ওবাদ বলে :

> সোনারা, তোমাগো বাপ-মায়ে মাটি পায় নাই, তোমরা পাইলা। দুনিয়াতে তোমাগোর কুনো গুনা নাই, তোমাগোর মনে কুনো দাগ লাগে নাই, আল্লায় তোমাগোর কথা শুনব, আল্লার য্যান আমারে বেস্ত দেয়, সোনারা তোমরা কয়ো— (মাহমুদুল, ২০২১ : ৬৫)

গলিত মৃতদেহের নিকট এই প্রত্যাশার আপাত স্বার্থপরতা অত্যন্ত সরল হৃদয়ের এক বৃদ্ধের পাপময় জীবনের পরও স্বর্গপ্রাপ্তি যার আজন্মকালের স্বপ্ন। এসব সাধারণ আর্তির বাইরে এ কাহিনিতে যে মানবিকতার উৎসারণ—সেই অভীষ্টই মাহমুদুল হকের গল্পের কেন্দ্রস্থ আলোকবিন্দু।

শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদের চিরপরিচিত অসহায়ত্বের বৃত্তান্ত 'একজন জামশেদ' গল্পটি। আরশাদ সাহেবের আশ্রিত ছোট ভাই বেকার জামশেদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার চারপাশের দৃশ্যাবলি বিবৃত হয়েছে। এইসব দৃশ্যে মিশে আছে নৈতিক স্খলন ও যৌনবিকার, টিকে থাকার অসাধু উপায় সম্বলিত আধুনিক জীবনের কুৎসিত আবর্ত। চাকরির জন্য চেষ্টা ও ব্যর্থতা, বড়ো ভাইয়ের খোটা জামশেদকে উৎসাহী করে জীবনটাকে পরিবার ভাই-ভাবি, ভাবির মামাতো বোন তুহিনা ও প্রেমিকা ঝুনুর প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে। সেখানে প্রেম-অপ্রেমের সমন্বয়ে গোঁজামিল দিয়ে চলে মধ্যবিত্তের সংকটময় জীবন। বড় ভাই তার মেদবহুল স্ত্রীকে লুকিয়ে কাজের মেয়ে রোকেয়ার মাকে চেপে ধরে রান্না ঘরে। একটি চাকরি হয় না বলে কীটের মতো নিঃশব্দে জীবন ধারণ করে জামশেদ। বেকারত্বের জন্য নিজে দায়ী না হলেও সমাজের চোখে সে অগস্তকের মতো। জামশেদের মনোজগতে তোলপাড় হলেও সমাজের কাছে তা মূল্যহীন। ভাবীর মামাতো বোন তুহিনার দেহকে এড়িয়ে চলার অবদমিত প্রতিক্রিয়ায় ভুগে জামশেদ নিজেকে ধিক্কার দেয়। উপরিভদ্রতার ধার না ধেরে শেষ পর্যন্ত সে বান্ধবি টুনুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য রোকেয়ার মায়ের কোমর হতে টাকা বের করে নেয়। বড় ভাইয়ের

সঙ্গে দেহারতির বিনিময়ে টাকা পেয়েছিল রোকেয়ার মা। ফলে সমূহিক স্খলনের পরিবেশে জামশেদ নিজেও ডুব দেয় গহীন অন্ধকারে। উৎফুল্ল মনে টুনুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে তার মনোজগতে আনন্দের ধারা বয়ে যায় :

> সে এখন ফুল বাগানের সিঁথি বরাবর হাঁটছে, ফ্লক্সহলিহক ভালো আছে, সবকিছু ভালো আছে, চড়ুইদের মন ভালো আছে, গার্ডেনিয়া ভেনাস্টা কী চমৎকার জাল বুনে রেখেছে জাফরিকাটা মাচানে, চিকন সুতোয় বোনা শীতের গায়ে ঝিলমিল করছে সিল্ক রোদ। সবকিছু স্পটলেস, ফ্ললেস, চমৎকার, চমৎকার এবং চমৎকার, হ্যালো গোলাপজাম হ্যালো পাউডারপাফ, হ্যালো– (মাহমুদুল, ২০২১ : ৭১)

জামশেদের নিষ্ফল আক্রোশ এভাবে চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে জটিল মনস্তত্ত্বের বিকল্প আবহের আশ্রয় নেয়। প্রেম ও প্রেমিকা দর্শনের মূলে রচিত হয় বিশ টাকার চমৎকার কূটাভাস। জামশেদের নাগরিক প্রেমের আনন্দধারায় ভেসে যায় রোকেয়ার মায়ের সঙ্গে তার কদর্য আচরণের স্মৃতি।

'সপুরা ও পরাগল' গল্পটি সমাজের বীভৎসতার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার উপর গড়ে উঠেছে। জীবনের এক ধরনের অমরতার ভান আছে—ওষ্ঠাগত প্রাণেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। অস্তিত্ব বাসনার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রিয়ভারাতুর আবেগের তীক্ষ্মতায় সঞ্জীবিত এই গল্পের প্রতিটি চরিত্র। ক্ষতবিক্ষত ব্যধিগ্রস্ত, অসুস্থ, ঘৃণ্য জীবনে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা—তবু অস্তিত্বায়নের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সপুরা, ময়মুনা, পরাগলের মানবিক অনুভূতিশূন্য হৃদয়লোকে জাগ্রত। মালগনি মিয়ার ভিক্ষুক বানানোর কারখানায় অঙ্গহানি করে ভিক্ষুকদের পঙ্গু করা হয়। এইসব পঙ্গু বিকারগ্রস্ত মানুষেরাই তার ব্যবসায়ের অবলম্বন। পরাগলের কুড়ালের কোপে সপুরার পাও ছিন্ন হয়েছিল এই কারখানায়। অঢেল স্বাস্থ্যের সঙ্গে এই ছিল পাখানাই তার জীবিকার অবলম্বন। গল্পকার সপুরাদের জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করে জীবন ক্ষুধার অপর এক চিত্র তুলে আনতে চেয়েছেন। প্রতি রাতে ভিক্ষা শেষে পরাগল কাঁধে ঝুলিয়ে সপুরাকে তার ডেরায় পৌঁছে দিলেও মনে মনে তার লালসা সপুরার দেহের প্রতি। যে পরাগল মালিক মালগনির আদেশে সপুরার দু'পা কেটেছে, সে-ই সুযোগ বুঝে সপুরার বুকে পিঠে হাত বুলায়; রক্তমাংসের আহ্বান জানায়। হৃদয়হীন শহরের অলিগলিতে জন্ম নেয়া দানবীয় নিষ্ঠুরতার এই গল্পভাষ্যে বিবমিষার উদ্রেক করে। জীবনের ভয়াবহ বীভৎসতা হয়ে ওঠে অন্ধকারের সমার্থক :

> এইবার অন্ধকার গুমরে উঠছে। চিমনির ধোঁয়ার মতো হলহল করে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। রংচটা দেয়ালের গায়ে পিঠ রেখে আকাশের দিকে তাকাল সপুরা, এখন আর তার কোনো বোধশক্তি নেই, ক্ষুধা নেই, দুঃখ নেই, নৈরাশ্য নেই, শুধু বসে থাকা, কিছু না ভাবা, কিছু না দেখা, শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা—
>
> এইভাবে মরাকাঠের গুঁড়ির মতো সে বসে থাকে। যে চাপা ক্রোধ মাঝে মাঝে ভেতরে ভেতরে তাকে ছোবল মারে এখন আর তার কোনো অস্তিত্ব নেই, এমন অবস্থায় তার কোনো ব্যথা থাকে না, খেদ থাকে না, সে বেওয়ারিশ হয়ে যায়, তসরুফ করে ফেলে কেউ তাকে। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৭৪)

সপুরার পচনশীল কর্তিত পা হয়ে ওঠে মানবীয় পচনের সমার্থক। সপুরার ওপর যেমন পরাগলের কুদৃষ্টি তেমনি হতশ্রী নোংরা ভয়ঙ্কর পেত্মীর মতো মায়মুনাকে ভোগ করে মজা পায় মালগনি। এভাবে নিপীড়নে নিষ্পেষণে মালগনি আর পরাগল শ্রীহীন অসহায় মায়মুনা সপুরাদের বিধিলিপি নির্ধারণ করে দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাগৈতিহাসিক* গল্পের মতো এ গল্পেও অপাঙ্‌ক্তের জীবনের শেকড় সন্ধানে লেখক অবগাহন করেন মানবপ্রবৃত্তির আদিতম অন্ধকার প্রদেশে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পটভূমিতে এক প্রথাবিরোধী জীবনবোধের গল্প 'ছেঁড়া তার'। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ দেখা হওয়া দুই বন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোমন্থন এই গল্পের উপজীব্য। মকবুলের শৈশবের রুগ্নস্বাস্থ্য ও খিটখিটে মেজাজ এবং নজরুলের শারীরিক সুস্থতা ও সাহসিকতার বিষয়ে দুই বন্ধুর পারস্পরিক আলাপচারিতায় জানা যায়। দেশমাতৃকার প্রতি নজরুলের নিবেদন এবং একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের স্মৃতিচারণও বাদ যায় না :

> ঠিক অমনি করে আরো একদিন কেঁদে ফেলেছিলাম, একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ, রেডিওতে আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি শুনে, মনে হয়েছিলো তোমার সেই দেশমাতৃকার মুখ এমন করুণ এমন দুঃখিনীর যে বুক হাহাকার করে। সেদিনও তোমার কথা মনে হয়েছিল— (মাহমুদুল, ২০২১ : ৮১)

আশৈশব প্রতিবাদী নজরুল পালাতে জানে না কোনো অবস্থাতেই। বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে লালবাগের গুন্ডাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তার পা খোড়া হয়ে গিয়েছিল, তবু অন্যদের মতো সে পালিয়ে যায়নি। অন্যায়ের সাথে আপস না করে সাহসী নজরুল ঔদ্ধত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান নজরুলকে বিবর্ণ করে দেয়। আনন্দ আর গর্বে ভরা স্বাধীনতার স্মৃতিগুলো তখন অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও মুক্তিকামী মানুষের আপসমূলক সহাবস্থান সংবেদনশীল লেখককে ব্যথিত করেছিল। শিক্ষাজীবন ও রাজনীতি একই বিন্দু থেকে শুরু করলেও মকবুল ও নজরুলের চলার পথ আজ ভিন্ন। আপসহীন নজরুল জীবনে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি কিছুই পায়নি, বরং প্রতিবাদী স্বভাবের জন্য অনেক কিছু হারিয়েছে। অন্যদিকে নজরুল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও জীবনের আদর্শে অনেকটাই আপসকামী। অন্তঃসারশূন্য সাজগোজের শহরে প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অবহেলা অনুভব করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নজরুল। একারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপনে মন্ত্রণালয় বানান ভুল দেখে রাস্তার পাশের ইট সজোরে ছুঁড়ে বিজ্ঞাপনটি ভেঙে দিতে এতটুকু ইতস্তত করেন না সে। নজরুলের এই শক্ত শিরদাঁড়া ও সাহসী মনোভাব বাঙালির পৌরুষময় অহংকারের পরিচায়ক।

'হলধর নিকারীর একদিন' গল্পটি গ্রামীণ শক্তিবর্গের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার ছন্দময় আখ্যান। কাহিনি অন্তর্স্রোতে গল্পকার নিকারী শ্রেণির দৈনন্দিন জীবনের নানা সংগ্রাম, ব্যক্তি জীবনের চিরন্তন প্রেমাকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রে সহিংস রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। আবহমান গ্রাম জীবনের সামন্ত কাঠামোর পরতে পরতে জন্ম নেয়া ছোট-বড় শক্তিবর্গের সংঘাত ও টানাপড়েনের অমীমাংসিত রহস্য চিত্রিত হয়েছে এই গল্পের ক্যানভাসে। চৈতন্যদাস ও তার পুত্র হলধর নিকারীর জীবন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে পূর্ণ। জেলেদের জন্য আনা সুতোর বান্ডিল দাদন মুনশি গ্রাস করে এবং গোপনে নদীপথে সেগুলো বহন করতে হয় চৈতন্যদাসকে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও জাল দিয়ে জেলেদের বিপদে তাদের সাহায্য করে মুনশি তাদের সব সুতা লুণ্ঠন করতে চায়। দাদনের প্রশ্নে বিপ্রতীপ শক্তির উত্থানেরও আভাস পাওয়া যায় :

> হুঁশ কইরা দেহিছ হলধর, জাউল্যাগ লয়া অহনে পলিটিক্স শুরু হইছে, লাই দিয়া যেমুন কাঁধে উঠাইতাছে ফয়-ফকিরগুলিরে, এগুলিরে দরদ কয় না, গদি মজমুত করনের লাইগা কতো খেইল দেহাইব মিয়াছাবেরা, ভক্করচক্কর বুঝি না মনে করছ? অহনে আমাগো কি হইবো, নিকারীগুলি আসমান থিকা পড়ছিল? হ্যাগো প্যাট নাই? ফালাইন্যা ভাবতাছেনি আমাগোরে? ক্যান, নাও নিয়া জাল দিয়া ট্যাকাউকা দিয়া বাঁচায়া রাহি নাই হুয়োরের পুতেগো, তহন আছিল কই মিয়াছাবেরা, অহনে খাউজাইয়া উঠতাছে, আমাগোরে ভাতে মারণের রাস্তা দেহাইতাছে বেজন্মাগুলিনরে। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৮৫)

নবোত্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবে হলধর নিকারীর ব্যক্তিজীবনেও ভাঙন দেখা দেয়। তার বিগত যৌবনা স্ত্রী মেনকার সঙ্গে খুড়তুতো ভাই কেশবের বিবাহ পূর্ববর্তী ঘনিষ্ঠতা হলধরে মনোজগতে সন্দেহের বীজ বুনে দেয়। সেই কেশব এখন ঘাটের সর্দারি বাগিয়ে নিতে উদগ্রীব। তাছাড়া একাত্তরে সিরাজদিখাঁর আর্মি-ক্যাম্পে তিনদিন থেকে মেনকার পালিয়ে আসার স্মৃতি হলধরের জীবনে ক্ষতচিহ্নের মতো হয়ে আছে। চারপাশের এই বৈরি পরিস্থিতিতে টালমাটাল হলধর ভিন্ন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শ্রেণিশত্রু খতমের নামে গলাকাটা রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে। ভগির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নকশাল দলের কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় হলধরের। মুখে শ্রেণিশত্রু খতমের শ্লোগান দিলেও তারা নিজেরাই জড়িত হয় খুন-ডাকাতি-রাহাজানিসহ ভয়ানক অন্তর্কলহে। নীতিহীন আদর্শচ্যুত এসব লোকদের অর্থের লোভ দেখিয়ে হলধর নিজের পক্ষে টেনে আনে। দাদন মুনশি আর কেশবের সামনে জন্ম নেয় নতুন উঠতি ধনিক হলধর। একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে নব্য ধনিক শ্রেণি সৃষ্টির একটি অলিখিত ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে হলধরের উত্থানের মধ্য দিয়ে। সামাজিক-রাজনৈতিক নৈরাজ্যের সুযোগ নিয়ে নব্য পুঁজির মালিকেরা রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক নেতৃত্বের স্থানও দখল করতে উদ্যত হয়।

মাহমুদুল হক তাঁর 'অচিনপুর' গল্পে মানুষ ও মানবসম্পর্কের এক নিখুঁত আখ্যান নির্মাণ করেছেন। অচিনপুরের অচেনা মানুষের এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। প্রতিক্ষণে চেনা মানুষের মাঝে জন্ম নেয় অচেনা মানুষ। মানব-চরিত্রের বিবর্তমান একান্ত অনুভূতিগুলোকে পাঠকের সামনে অকৃত্রিমভাবে তুলে ধরেছেন সংবেদনশীল গল্পকার। 'অচিনপুর' গল্পে প্রধান চরিত্র মিনুর অসুস্থতায় সুখের সংসার অচমকা নতুন রূপ লাভ করে। ভালোবাসার স্বামীটি হয়ে যায় এক অচেনা পুরুষ। কিছু দিন যেতে না যেতে নতুন নারী আর নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নতুন স্ত্রীর বাহানা পূরণে ব্যতিব্যস্ত স্বামী অসুস্থ স্ত্রীর খোঁজ নেয়ার সময় পায় না। ঘরের চার দেয়ালে বন্দি পক্ষাঘাতগ্রস্ত মিনুর পৃথিবী। সক্ষম থাকা অবস্থায়ও কখনও প্রকৃতি, সবুজ, কদমফুল, বকুল, গন্ধরাজ দেখা হয়নি তার সাংসারিক ব্যস্ততায়। একমাত্র সন্তানটি ডাকাতি মামলার আসামি হয়ে জেলে। ইট-কাঠের পরিবেশে যান্ত্রিক মানুষগুলোর কাছে মিনুর কোনো কিছু চাওয়া অবশিষ্ট নেই। বদ্ধ ঘরে অবারিত প্রকৃতি তাকে ধরা দেয় স্মৃতি বাহিত হয়ে :

> অথচ সোনালি মাছ সবুজ গঙ্গাফড়িং কদমফুল ন্যাকড়ার পুতুল সারা জীবনভর স্বপ্নের ভিতর একা একা খেলা করে ফেরে। সেই জীবনটার জন্যে আমার মাঝে মাঝে কান্না পায় টুপু, পাখির একটি রঙিন পালক আঁটা কাগজের তুচ্ছ মুকুটে তখন রাজরাজেশ্বরী মনে হয় নিজেকে। রং-বেরঙের ভাঙা কাচের চুড়ির শিকলের জন্যেও আমার কষ্ট হয়। ঘুঘুডাকা দুপুর, নিস্তব্ধ ফাঁকা মাঠ, গরুর পাল, হুহু বাতাস, বাঁধানো শান ঘাট, ঝুরিওলা অশত্থ, এক একটা দিন—
>
> এইসব কান্নার মতো, দীর্ঘশ্বাসের মতো। এ যেন এক অচিনপুরের দুর্গে নিদারুণ বন্দিদশায় দিনের পর দিন গলা চিরে ক্রমাগত চিৎকারের পর চিৎকার করে যাচ্ছি, পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার তা ফিরে ফিরে আসছে। (মাহমুদুল, ২০২১ : ১০২)

'অচিনপুর' গল্প জুড়ে রয়েছে বর্তমান থেকে অতীতের স্মৃতিতে পালানোর চেষ্টা। শিক্ষিত বেকার ভাগ্নে গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত চিঠি পাঠায় টাকা পাঠানোর জন্য। মামীর বেদনার কিছুটা অংশীদার হয় এই অসহায় টুপু। দুদিক থেকে দুজন অসহায় মানুষ নিজেদের বর্তমান দিয়ে আক্ষেপের পরিবর্তে অতিবাহিত অতীতের স্মৃতির মাঝে স্বস্তির সন্ধান করে। গল্পের সমাপ্তিতে মিনু অবশ্য নিজের অক্ষমতা উপেক্ষা করে মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অস্থির বাস্তবতার পরিচয়ে ঋদ্ধ এক অনবদ্য গল্প 'প্রতিদিন একটি রুমাল'। প্রতিটি মানুষের মাঝে বাস করা অপরিজ্ঞাত মানুষটি প্রতিদিন নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করে। আলোচ্যমান গল্পে আলতাফ ও সবুজ কলেজ জীবনের দুই বন্ধুর দেখা হয়

দীর্ঘদিন পর। দুই বন্ধুর আড্ডার আলাপনে পাঠক জেনে যায় তাদের অতীত জীবনের অনেক অজানা কথা। কলেজ জীবনে দারুণ স্মার্ট, তুখোড় বক্তা ও নামী খেলোয়াড় সবুজ এখন ইছাপুরা নামক গ্রামের এক অখ্যাত কলেজে অল্প বেতনের শিক্ষক। স্ত্রী-সন্তানকে ঢাকায় রেখে নিজে একা চাকরিস্থলে বসবাস করে। বেতনের সামান্য টাকায় স্ত্রী রেখার 'অসাধারণ সাংসারিক নৈপুণ্যে' তার সংসার চলে। সম্ভাবনাহীন একঘেয়ে অনুজ্জ্বল জীবনে সবুজ বড় কোনো চিন্তা করতে ভয় পায়। জীবনে তার জমে উঠেছে শত অসন্তোষ, আর ব্যর্থতার গ্লানিবোধ। অন্যদিকে তার বন্ধু আলতাফের কাছে জীবন মানেই মজা-আনন্দ-স্ফূর্তি। সময়ের বিবর্তনে দুই বন্ধু দুই মেরুর মানুষরূপে গড়ে উঠেছে। অতিবাহিত জীবন আর কাঙ্ক্ষিত জীবনের মাঝে সবুজের দূরত্ব থাকলেও আলতাফ আদায় করে নেবার কানুন আয়ত্ত করেছে। আলতাফের কাছে সময়টি অনুকূল। প্রতিদিনই সে বিশুদ্ধ বণিকের মতো নারীদেহ বা প্রেম খরিদ করে। তার কাছে নারী মানেই স্থূল মাংসপিণ্ড; যৌন উপভোগ ছাড়া নারীর অন্য কোনো মূল্য নেই। আলতাফের ভাষ্যে :

> আমি শালার বিশুদ্ধ বণিক, টাকা-পয়সা দিয়ে প্রেম কিনি, দৌলত দিয়ে মব্বোতের সওদাগরি করি, ময়ূরপঙ্খী ভাসাই, আমার কাছে কি না প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে আসে! কতটুকু জানিস তোরা মেয়েদের? ক'টা মেয়ে দেখেছিস তোরা? কজনের সঙ্গে মিশেছিস? অভিজ্ঞতা বলতে তো একমাত্র ঐ বিয়ে করা বউ, যা কি না আগাপাস্তলা একটা জোড়াতালি আর গোঁজামিলের ব্যাপার, শুধু সেইটুকুই! (মাহমুদুল, ২০২১ : ১০৯)

আলতাফের মতো তেজোদীপ্ত যুবকের আচার-আচরণের যে ভাবটি প্রকাশ পায়, তাতে লেখক সূক্ষ্মভাবে তৎকালীন সময়ের যুবকদের মানসিক বিপর্যয়ের বিষয়টি ব্যক্ত করেন। প্রাইভেট কারে সবুজকে নিয়ে পথে পথে মেয়ে মানুষ খুঁজে বেড়ায় আলতাফ। সবুজের মতো অন্য বন্ধুদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথার মধ্যে বেরিয়ে আসে তার পুরুষালি যৌনস্পৃহা। কদর্যভাবে মেয়েদের পেছনে ছোটা ক্ষুব্ধ আলতাফ একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলতে ব্যর্থ হয়ে রিক্সাসহ চাপা দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। ক্ষমতার দাপট আর আত্ম- অধিকারের উন্মত্ততায় চারপাশের সবকিছু ভেঙে পড়ে। আলতাফের লাগামহীন লাম্পট্যে বিধ্বস্ত এই সময়ের সবকিছুই যেন চলে গেছে নষ্টদের অধিকারে। 'প্রতিদিন একটি রুমাল' হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আলতাফ যেন নিজের গন্তব্যও হারিয়ে ফেলে। স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে গিয়ে পঙ্কিল অন্ধকারে নিমজ্জমান বিভ্রান্ত আলতাফ হয়ে ওঠে গন্তব্যহীন লক্ষ্যবর্জিত যুবশক্তির মূর্তিমান প্রতিনিধি।

পরিবর্তমান সময় ও সমাজ, আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, চারিদিকে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জ ব্যক্তির জীবনপ্রণালি ও শিল্পজগতকে প্রভাবিত করে। সংবেদনশীল শিল্পীহৃদয়ে সময়ের অভিঘাতের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। মাহমুদুল হকের গল্পের বিষয় নির্বাচন, কাহিনি গ্রন্থনা, ভাষা বিন্যাস—প্রতিটি পর্বে সময় ও সমাজ সংলগ্নতার অন্তরালে নিহিত ছিল মানবিক নির্বেদ ও জীবনের প্রতি অন্তর্লীন প্রেমানুভব। *প্রতিদিন একটি রুমাল* গ্রন্থের প্রতিটি আখ্যান, ঘটনাপরম্পরা ও চরিত্রায়ণ সময় ও স্থানলগ্ন। এসব গল্পে পারিবারিক সুখ-দুঃখ, সমাজের ক্লেদ, নিম্ন ও মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব-সঙ্কট, একই সঙ্গে জীবনের প্রতি অতলান্তিক মমতা প্রকাশ লাভ করেছে। জীবনের সকল ক্লান্তি ক্ষোভ-নৈরাশ্য-শূন্যতার বিপরীতে মানুষের অপরাজেয় মানবিক চৈতন্যের জাগরণ তাঁর শিল্পভাবনার অনিষ্ট। "তবে তা বিপ্লবী ঘোষণার মতো উচ্চকণ্ঠ নয়, জীবনের মতো করুণ, নিসর্গের মতো সবুজ আর আলো-আঁধারের মতো নিবিড়, স্বাভাবিক ও স্বপ্নসঞ্চারী" (মোস্তফা এনাম, ২০২১ : ১১৯)। প্রতিটি গল্পে দুঃখ, বঞ্চনা ও কঠিন নিপীড়নের অন্তর্স্রোতে জীবনের অপার সম্ভাবনা সুচিহ্নিত। ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসার বিবিধ পরিপ্রেক্ষিত ও মানব-সম্পর্কের বিচিত্র পরিসর রূপান্তরে লেখক পরিভ্রমণ করেছেন ব্যক্তির অন্তর্লোক, পারিবারিক ঘটনাস্রোত ও ইন্দ্রিয়বাসনার বিচিত্র পথে। মানুষের বহুমাত্রিক সুখ-দুঃখের

কথকতা, নিষ্পেষিত জীবনের রসায়ন, মনোলোকের ধূসরতা কখনো কথনভঙ্গির অন্তর্বয়নে, চেতনাপ্রবাহ রীতির অনুশাসনে, কখনো লেখকের স্বয়ংক্রিয় চিত্ররূপময়তায় শিল্পীত হয়েছে। মাহমুদুল হকের ছোটগল্প তাঁর ক্রমোত্তীর্ণ শিল্পচেতনার অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা ও আধুনিকতা সঞ্চারী স্বাতন্ত্র্যে ঋদ্ধ। তাঁর গল্পে অন্বিত ভাষা নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেনি, বরং কাহিনির মধ্যে সঞ্চারিত করেছে লক্ষ্যভেদী ও নান্দনিক অভিপ্রায়। আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতাকে তিনি নবরূপে উপস্থাপন করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অভিলাষে প্রতিটি লেখাতেই তিনি নতুনভাবে হাজির হয়েছেন পাঠক সমীপে। তাঁর গদ্য নির্ভার, নির্মেদ ও কাব্যগন্ধী। সহজ ভাষার সাবলীল উচ্চারণে মাহমুদুল হক সমাজের নিত্যতাকেই উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাহিত্যে।

মাহমুদুল হক বাংলা কথাসাহিত্যে বিরলপ্রজ ও ব্যতিক্রমী শিল্প-প্রতিভা। মানব জীবনের জটিলতাকে তিনি বহুতল স্পর্শী শৈল্পিক দক্ষতায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ রূপকল্প বর্ণনায় অন্তর্লীন জিজ্ঞাসার দিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁর সৃষ্টির বিভাময় জীবন ও সত্তার টুকরো ছায়া-প্রতিচ্ছায়া তাঁর মানবসম্বন্ধ সিঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত। বিষয় ও প্রকরণগত দক্ষতা, আধুনিক শিল্প ও দর্শনের সবিশেষ ধারণা, মানব-অস্তিত্বের স্বরূপ ও মানবিক আশ্রয় সন্ধানের বোধ তাঁর কথাসাহিত্যে সুগভীর প্রজ্ঞাময়তায় সংহত। একের পর এক গল্প লিখে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব শিল্পভুবন ও চিত্রকল্পময় সাহিত্যভাষা। সাহিত্যে আধুনিকতার রূপায়ণ ও কাহিনির সঙ্গে অনুপম গদ্যের সমন্বয় মাহমুদুল হকের কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রান্ত। যাবতীয় ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার মধ্যে জীবনকে অঙ্গীকার করেও বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্যের অন্তর্বয়নে তাঁর চরিত্ররা আধুনিক। অসম্ভব গতিশীল ও জাদুময় সংলাপ সৃজন, চরিত্রের মনোজাগতিকতা পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে নানা উপাচার সংযোজন ও নন্দন-ভাবনার বিভিন্ন প্রকৌশল প্রয়োগ তাঁর সৃষ্টিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। মাহমুদুল হকের ছোটগল্পসমূহ সেই অনিবার্য সংযম ও পরিমিতিবোধের যথার্থ নান্দনিক প্রজ্ঞার পরিচয়ে মহিমান্বিত।

সহায়কপঞ্জি

আবু হেনা মোস্তফা এনাম (২০২১)। *মাহমুদুল হক : সৃষ্টি ও শিল্প*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

চঞ্চল কুমার বোস (২০১৯)। *মাহমুদুল হকের কথাসাহিত্য : বিষকুম্ভে জীবন*। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মাহমুদুল হক (২০২১)। *মাহমুদুল হক রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিরাজ সালেকীন (২০১৪)। 'আক্ষেপ ও আদরের গল্প'। *গল্পকথা*, (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার) বর্ষ-৪, সংখ্যা-৫, রাজশাহী।

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে রূপোপজীবিনী

মীর হুমায়ূন কবীর*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা ছোটগল্পে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) এক অনন্য কথাশিল্পী। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), মহামারি-মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬) এবং দেশভাগের (১৯৪৭) পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে যে রূপ-রূপান্তর সাধিত হয়, সমরেশ বসুর গল্পে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কালপর্বে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে, ভেঙে পড়ে পরিবার-সমাজের চিরায়ত বন্ধন; ক্ষমতাবানদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সাধারণ জনজীবন। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে নরনারীর প্রেম ও দাম্পত্যজীবন। অভাব-অনটনের কাছে মূল্যবোধ হারিয়ে কিংবা উন্নত জীবনের মোহে অনেক নারী বেছে নেয় নিষিদ্ধ-পল্লির অন্ধকার-জীবন। বেঁচে থাকবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় তারা জলাঞ্জলি দেয় দীর্ঘদিনের লালিত ধর্ম, সংস্কার ও মানবিক ঔচিত্যবোধ। এসব রূপোপজীবিনীর দুঃসহ মর্মবেদনা সমরেশ বসুর গল্পে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সমরেশ বসুর ছোটগল্পে চিত্রিত রূপোপজীবিনীদের জীবনসংকটের নানা প্রসঙ্গ পর্যালোচনার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।]

আবহমানকাল থেকে সমাজ-পরিসরে রূপোপজীবিনীদের অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষের পুরাণ, মহাকাব্য এবং লোকসাহিত্যেও তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতে রূপোপজীবিনীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। সেসময় তারা ছিল রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত; তাদের সার্বিক দেখভালের জন্য প্রশাসকরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন একজন গণিকাধ্যক্ষ। রূপোপজীবিনী এবং গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নানা আইনও প্রচলিত ছিল, নির্ধারিত ছিল তাদের বেতন ও কর্মকাঠামো।[১]

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে রূপোপজীবিনীদের সমাজ-স্বাধীনতা থাকলেও পরবর্তীকালে "ধর্ম ও লোকাচারের হাত ধরে প্রায় সকল সমাজে গণিকাদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, একবার গণিকাবৃত্তি করলে কোনো নারী চিরতরে সামাজিক মর্যাদা হারায় এবং সমাজের চোখে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব বলে গণ্য হতে থাকে" (মনিরুল, ২০২০ : ১৬৭)। *চর্যাপদের* বর্ণনায় তাই দেহোপজীবিনী সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে মূল্যহীন দেখা যায়। কামনার সময় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে তারা ডোম, চণ্ডালদের মতোই অস্পৃশ্য ছিল। ১০-সংখ্যক চর্যায় বলা হয়েছে : "নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ।/ ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ ॥" (হাই ও পাশা, ১৪১৪ : ৮৫)

মধ্যযুগে নবাব-বাদশাদের হারেমে রূপোপজীবিনীরা অনেকটা দাসীর মতো বিবেচিত হতো; কেউ-কেউ বাইজিরূপে নাচ-গান পরিবেশন করতো। তবে "রাজাদের বিলাস-ব্যসনের জন্যেই শুধু নয়, সৈন্যদের স্বাভাবিক শরীরী বাসনা মেটানোর জন্যেও বারনারীর প্রয়োজন পড়তো" (মাসুদ, ২০১৩ : ৪৭)। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ সৈন্যরা অতিমাত্রায় পতিতা-সংসর্গ স্থাপন করে। এর ফলে তারা মারাত্মক স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে পড়ে। সৈনিকদের সুরক্ষার

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়োজনে তখন দেহ-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং প্রবর্তিত হয় 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' (১৮৬৪)। এ আইনের পর "সেনা-ছাউনিগুলোতে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তৈরি হল আলাদা বেশ্যালয়" (মৌ, ২০১৯ : ৬)। এতৎসত্ত্বেও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে পাশ হয় 'কন্টাজিয়াস ডিজিসেস অ্যাক্ট' (১৮৬৮)। এই আইনের ফলে রূপোপজীবিনীদের নাম নথিভুক্ত করা হয় এবং তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। তাদের শরীরে রোগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে অন্তত ছয় মাস হাসপাতালে বন্দি রাখা হয়। এভাবে "সরকার তার সৈন্যদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির বিষয়টি যেমন ইতিবাচকভাবে দেখেছে, তেমনি নৈতিক হলেও নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করতে তারা পারেনি। তারা নিয়ন্ত্রণের নামে যৌন ব্যবসার বাজার প্রসারকে সংকুচিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।" (কবীর, ২০১৩ : ১৯)

উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ 'বাবু-সংস্কৃতি'র নামে উপপত্নী পালন করে। এদের ধারণা "বারাঙ্গনা বা রক্ষিতা না থাকলে বাবু হওয়া যায় না" (বিলকিস, ২০১৩ : ১৫৬)। এজন্য ঘরে স্ত্রী থাকলেও তারা বাগানবাড়িতে পতিতাসঙ্গ উপভোগ করতো। তৎকালীন পত্র-পত্রিকা এবং আত্মচরিতে এ-প্রসঙ্গে নানা বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[২] 'বাবু' শ্রেণির অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) *নববাবু বিলাস* (১৮২৬) শীর্ষক ব্যঙ্গরচনা, মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০) এবং দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) নাটকে। মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) *এর উপায় কি?* (১৮৭৫) প্রহসনেও একই সংকট প্রদর্শিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলায় কিছু রূপোপজীবিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, যারা সঙ্গীত, নৃত্য এবং অভিনয়ে পারদর্শী ছিল।[৩] এই পরিপ্রেক্ষিতে "মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রস্তাব দেন, নাটকে স্ত্রী চরিত্রগুলিতে পুরুষরা অভিনয় না করে, অভিনয় করুক বারাঙ্গনরা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয় কুমার মজুমদার, বটুবাবু, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিদাস দাস, প্রিয়নাথ বসু প্রভৃতি সে সময়ের বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বরা এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবশ্য এতে আপত্তি জানিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার কমিটি থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে মধুসূদনের নাটক *শর্মিষ্ঠা* অভিনীত হল বারাঙ্গনাদের নিয়ে।" (মণি ও স্বাতী, ২০২০ : ২৫)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৭) ভয়াবহতা বৈশ্বিকভাবে মানুষকে বিপন্ন করে তোলে। ভারতবর্ষ সংঘাতের বাইরে থাকলেও, ব্রিটিশ উপনিবেশ-শাসিত এ অঞ্চলে যুদ্ধের নানা পরোক্ষ প্রভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধকালে এবং তৎপরবর্তী সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দুর্মূল্য এবং কর্মসংস্থানের অভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। এসময় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়ে অনেক নারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেহবিক্রয় করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-১৯৪৫) মিত্রবাহিনীর একাংশ মনোরঞ্জনের জন্য বেছে নেয় এদেশীয় নারীদের :

> চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা সর্বত্র – যেখানে ব্রিটিশ আর্মি – সেখানেই ত্রাস। লোকের চোখে তারা মূর্তিমান বিভীষিকা। যে অত্যাচার তারা লোকের উপর করেছে! সে সময় ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকা থেকে এমন এক জাতের সৈন্য আমদানি করেছিল – যারা একেবারে বর্বর। ধরুন কুমিল্লায় – গোটা শহরে পাঁচ সাত ঘরের বেশি মেয়ে নেই। সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে। মেয়ের খোঁজে ওই আফ্রিকান সৈন্যরা গোটা শহর চষে বেড়াচ্ছে। তারা শুধু একটা কথা জানে – বিবি! বিবি আর বিবি! (অমলেন্দু, ২০০৬ : ১৯)

এ-সুযোগে স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণি সেনাক্যাম্পে নারী সরবরাহ শুরু করে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৩৫০) এ-সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে। মড়কতাড়িত গ্রামবাংলার গৃহলক্ষ্মীদের প্রলুব্ধ করে নারীপাচারকারীরা তাদের বিক্রয় করে কলকাতার পতিতা-পল্লিতে। দেশভাগের পর এসব

ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে এবং গণিকাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধিরূপে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্বাস্তু নারীরা তখন সামান্য প্রলোভনে পাচারকারীদের করায়ত্তে আসে এবং নিষিদ্ধ-পল্লিতে দিনযাপন করে। সমরেশ বসুর ছোটগল্পের রূপোপজীবিনী চরিত্রগুলো এসময়েরই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার শিকার।

দুই

বাংলা ছোটগল্পে রূপোপজীবিনীদের নিয়ে প্রথম গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। 'বিচারক' গল্পে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাছে পরাজিত এক নারীর পতিতা হয়ে ওঠার কাহিনি পরিবেশন করেছেন। বারবনিতারা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে স্থান পেয়েছে শরৎ-সাহিত্যে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'আঁধারে আলো' গল্পে বিজলী নামের এক রূপোপজীবিনীর আত্মসম্মানবোধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও গল্পের তুলনায় তাঁর উপন্যাসে এই অন্ধকার-জীবন নানামাত্রিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *শ্রীকান্ত* (১৯১৭) উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী, *দেবদাসের* (১৯১৭) চন্দ্রমুখী, *শুভদা* (১৯১৮) উপন্যাসের কাত্যায়নী প্রমুখ চরিত্র স্মরণীয়।

শরৎচন্দ্রের পর রূপোপজীবিনীদের গ্লানিময় জীবন বর্ণিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে', 'মহানগর' প্রভৃতি গল্পে। দেহোপজীবিনী নারীর প্রেম-ভালোবাসার গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৪-১৯৮৮) 'বিষাক্ত প্রেম'; তাঁর 'আজ কাল পরশুর গল্প'তে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষ-উত্তরকালে এক বারবধূর সামাজিক বিড়ম্বনার চিত্র। রূপোপজীবিনীর অভিশপ্ত জীবনলিপি প্রদর্শিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০) 'পরশুরামের কুঠার' গল্পেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজব্যবস্থায় রূপোপজীবিনীর দুঃখ-দুর্গতি বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) 'শুভক্ষণ', 'একজিবিশন', 'উর্বশী', 'কুয়াশা', তিমিরাভিসার' প্রভৃতি গল্পে। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রূপোপজীবিনীদের প্রতি সমব্যথী হলেও পারিবারিক জীবনাবর্তে ফিরিয়ে আনেননি। মন্বন্তরকালে গণিকাদের জীবনসংগ্রাম এবং করুণ পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) 'রসাভাস', 'পুনশ্চ', 'রত্নাবাঈ', 'বিদ্যুৎলতা', 'শুভার্থী', 'জামাই', 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' প্রভৃতি গল্পে। পরবর্তীকালে সমরেশ বসুও দুর্ভিক্ষ-দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রূপোপজীবিনীদের মনস্তত্ত্ব, দারিদ্র্য-যন্ত্রণা এবং অন্দরমহলের শূন্যতা অনুপুঙ্খভাবে রূপায়ণ করেছেন। তাঁর এ শ্রেণির গল্পের মধ্যে 'অবক্ষয়', 'শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ', 'দেওয়াল লিপি', 'প্রাণ-পিপাসা', 'বিষের ঝাড়', 'পঞ্চায়েত', মেঘলা ভাঙা রোদ', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'আলোর বৃত্তে' প্রভৃতি অন্যতম। এই পঙ্কিল জীবনের খণ্ডিত চিত্র রয়েছে তাঁর 'মরশুমের একদিন', 'মানুষ রতন', 'আর একটি মানুষ', 'উৎপাত', 'পাহাড়ী ঢল' প্রভৃতি গল্পেও।

তিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রূপোপজীবিনীর দুটি ভিন্নরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'অবক্ষয়' গল্পে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদয়াল পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনিটি বিবৃত হয়েছে। হরিদয়াল রেলওয়ে বিভাগের একজন কেরানি; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তার দপ্তর ছিল সেনা-নিয়ন্ত্রিত। সেনাবাহিনীর গাড়ি এবং সামরিক সরঞ্জামাদির ওয়াগনগুলোর হিসাবরক্ষণ এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ-স্থাপন ছিল তার কাজ। এই রেলওয়ে ইয়ার্ডে প্রতিদিন বহুজাতিক ফৌজের যাতায়াত ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং অস্ট্রেলিয়ান। মাঝেমধ্যে সেখানে তাদের কয়েকদিন অবস্থান করতে হতো। তবে তারা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে চাইতো না; দ্রুত ছাড় পেতে হরিদয়ালকে তারা নানা উৎকোচ প্রদান করতো। যেমন : মদের বোতল, সিগারেট, লাইটার, মাছ, সিগারেট, ফলমূল ইত্যাদি। বিরতি-লগ্নে কেউ-কেউ নারীমাংসের জন্য ছটফট করতো। হরিদয়ালকে তারা পতিতা

সরবরাহের জন্য চাপ সৃষ্টি করতো। কিন্তু সে ওদের অন্যায় আবদার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতো।

এ গল্পে শোভা নামের এক মেয়েকে হরিদয়াল পছন্দ করে। তার অফিসের সীমানা-প্রাচীরের ওপারেই মেয়েটির বাড়ি। শোভার বাবা পেশায় স্কুলশিক্ষক, যুদ্ধের বাজারে শিক্ষকতা করে তাঁর পরিবার-নির্বাহ ছিল দুঃসাধ্য। তাছাড়া তাঁর ছেলেমেয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাই হরিদয়াল-শোভার প্রেমের সম্পর্কে পারিবারিক বাধা ছিল না। আর তখন এ-কথা প্রচলিত ছিল যে, "রেলের লোকেরাই একমাত্র যুদ্ধের সময় তিন বেলা ভাত খেতে পেত" (সমরেশ, ২০১৪ : ২১৫)। হরিদয়ালও শোভাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতো। পিতা দরিদ্র হলেও শোভা ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। একদিন তাকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে দেখে কয়েকজন সৈনিক লালসাপ্রবণ হয়ে ওঠে। কামুক সেনাদল শোভার বাড়ির দিকে অগ্রসর হলে হরিদয়াল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ম্যাক নামের এক সৈনিক তার দিকে রিভালবার তাক করে। প্রেমিকাকে রক্ষা করতে হরিদয়াল অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। স্টেশনের এক পতিতাকে সে হিংস্র সৈনিকদের কাছে তুলে দেয়, যদিও ইতঃপূর্বে সে এদের কেবল অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই মূল্যায়ন করেছে। দীর্ঘক্ষণ পৈশাচিক নির্যাতনের পর মেয়েটির ওপর বর্ষিত হয় 'নোট বৃষ্টি'। ততক্ষণে ওর দাঁড়ানোর শক্তি অবশিষ্ট নেই। তারপরও মোটা অঙ্কের টাকা দেখে সে নিজেকে সামলে নেয়। তার সহ্যশক্তির উৎস সন্ধানে হরিদয়ালের মনে হয়, "শত হলেও বেশ্যা তো" (সমরেশ, ২০১৪ : ২১৮)! হরিদয়াল মেয়েটির হাত ধরে তাকে শরশয্যা থেকে উঠতে সহায়তা করে। মেয়েটির প্রতি সে একরকম কৃতজ্ঞ, কেননা ওর জায়গায় থাকতে পারতো তারই প্রেমিকা শোভা।

হরিদয়ালের কাছে ঘটনাটি শুনে শোভা শিহরিত হয়। অবশ্য তার চোখেমুখে ছিল প্রেমিকের প্রতি পরম নির্ভরতার ছাপ। কিছুদিন পর শোভার স্বভাব-চরিত্রে ঘটে আমূল পরিবর্তন। দরিদ্র জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে দামি শাড়ি, গয়না আর টাকার জন্য লালায়িত হয়। ঐশ্বর্য এবং উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় সে হয়ে পড়ে নির্লজ্জ। শহরের লম্পট ধনিক শ্রেণি ক্রমশ হয়ে ওঠে তার বন্ধুপ্রতিম। তার সুখ-সমাদর দেখে প্রতিবেশী মেয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়। আরও বিস্ময়কর যে, শিক্ষিত পিতামাতা তাদের উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েকে শাসন নয়, বরং প্রশ্রয় দেয়। এ বিষয়টি হরিদয়ালের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। স্টেশনের পতিতারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে নিজেদের বিলিয়ে দেয়। কিন্তু সংসারে অভাব-অনটন থাকলেও শোভার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন জটিল নয়। হরিদয়াল বুঝতে পারে শোভার চারিত্রিক স্খলন কেবল অর্থের জন্য নয়। যুদ্ধোত্তর সমাজব্যবস্থায় সার্বিক অবক্ষয়ের প্রভাবে সে রূপোপজীবিনী হয়ে উঠেছে। গল্পকথককে হরিদয়াল বলেছে—

> কিন্তু জানবেন, আসল জায়গায় পচন ধরেছে। উঁচু থেকে নিচুতলা পর্যন্ত লোভ, লালসা আর বাসনা, কোটি কোটি আত্মাকে ফুটো করে দিয়েছে। সমস্ত মানুষের বৈষয়িক উন্নতি করতে চান, করুন। কিন্তু দোহাই, আপনারা নাকি মানবাত্মার কারিগর, আত্মাগুলোকে মেরামত করুন, শুদ্ধ করুন। নইলে গোটা পৃথিবীটা সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেও আত্মার দারিদ্র্য ঘোচাতে পারবেন না। (সমরেশ, ২০১৪ : ২১৯-২২০)

অবক্ষয়ের বিষবাষ্প থেকে হরিদয়ালও শেষপর্যন্ত পরিত্রাণ পায়নি। রেলের কেরানি হিসেবে তার বেতন ছিল সাকুল্যে দেড়শো টাকা। স্বল্প বেতন এবং সততার মূল্যায়ন না পেয়ে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে অপকর্মে। গল্পে চাকরির পাশাপাশি তাকে দালালি করতে দেখা যায়। রেলের ওয়াগন ভেঙে যারা মালপত্র কেনাবেচা করে, তাদের মধ্যে সে মধ্যস্থতা করে। এ কাজে তার মাসিক উপার্জন দেড় থেকে দুই হাজার টাকা। 'অবক্ষয়' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ

থাকলেও তা কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। বরং বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়দীর্ণ সমাজব্যবস্থার কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের গল্প শুনিয়েছেন সমরেশ বসু।

শোভার মতোই আত্মকেন্দ্রিক নারীচরিত্র 'শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ' গল্পের সন্ধ্যা। পরিবারে আহার-আশ্রয়ের বন্দোবস্ত থাকলেও সে নারীধর্ম রক্ষা করতে পারেনি। যদিও একইরকম পারিবারিক কাঠামোতে বেড়ে ওঠা আরেকটি মেয়ে শুভ্রা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বিসর্জন দেয়নি। এ গল্পে শুভ্রার পিতা চটকলের কেরানি। স্বল্প বেতনে তার সংসার-পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সহকর্মীরা যখন অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বাড়তি উপার্জনে ব্যস্ত, তখনও তিনি পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাননি। তার উন্নতির একমাত্র সোপান বাৎসরিক দশ টাকার ইনক্রিমেন্ট। অর্থকষ্টে কলেজের সম্ভাবনাময়ী ছাত্রী শুভ্রা কোনোরকম বি.এ. পাশ করলেও তার ভাই দুটি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে। অনিশ্চিত জীবনপরিবেশে তারা কুসঙ্গে সময় অতিবাহিত করে। পরিবারের দুরবস্থার জন্য শুভ্রা পিতাকে নয়, দায়ী করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। তার বিশ্লেষণ ছিল এরকম :

> বাবাকে সে-জন্য কখনোই দোষ দিতে পারি না। দোষ যদি দিতেই হয়, তবে দোষের বদলে অভিশাপই দেব এই বর্তমান সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। ধিক্কার দেব আমাদের সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে। এইসব ব্যবস্থাই গরিবকে আরো গরিব করেছে, বড়লোকদের ভাণ্ডার আরো বেশি ভরে তুলেছে। আমাদের এ দেশটা স্বাধীন হবার আগে কেমন ছিল, জানি না। কারণ আমার জন্ম স্বাধীনতার পরে। জন্মের পর আস্তে আস্তে যতই জ্ঞান বাড়তে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম, দেশের গোটা ব্যবস্থা আর পরিকল্পনার মধ্যে কোটি কোটি মানুষের অসহায় অপমান ছাড়া আর কিছু নেই। (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৮৯)

সাংসারিক অস্বচ্ছলতার দরুন শুভ্রা কয়েকটি টিউশনি করে। এছাড়া চাকরির বাজারে নিজেকে উপযোগী করতে সে টাইপরাইটিং, শর্টহ্যান্ড এবং টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখতে শুরু করে। এত যোগ্যতা সত্ত্বেও সে চাকরিলাভে ব্যর্থ হয়। এদিকে তার বাবা মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করেন। কন্যার রূপের ওপর তার ভরসা থাকলেও পাত্রপক্ষের দৃষ্টি কেবল অর্থের ওপর। চাকুরিজীবী অবিবাহিত ছেলেদের মনস্তত্ত্বেরও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। শুভ্রা লক্ষ করেছে, "এইসব মধ্যবিত্ত তরুণরা বড় বড় কথা বলে, অফিসে পাড়ায় বিপ্লব করে, কিন্তু পণের টাকা, কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতে পারে না।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯০)

একদিন ট্রেনের কামরায় সন্ধ্যা নামের এক মেয়ের সঙ্গে শুভ্রার আলাপ হয়। মেয়েটি বেশভূষায় যথেষ্ট আধুনিক। সন্ধ্যা নিজেকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। সহযাত্রিনীরা তাকে এড়িয়ে চললেও সে আমলে নেয় না। শুভ্রার মনে হয়েছে মেয়েটি যেন "সর্বদাই জ্বলছে, ফুঁসছে" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯২)। শুভ্রার মতো সন্ধ্যার জীবনযাপনও মসৃণ নয়। তার পরিবার দেশভাগের শিকার। পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে তারা রাতারাতি চলে আসে কলকাতা। এখানে সামান্য জমি দখল করে তার পিতা বসতি স্থাপন করে। আট ছেলেমেয়ের উদরপূর্তির কোনোরকম ব্যবস্থা করলেও তিনি লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। সন্ধ্যা নিজের চেষ্টায় রিফিউজি স্কুলে সামান্য বিদ্যালাভ করে। তার ভাইয়েরা শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে অপরাধজগতে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতির নামে তারা ওয়াগন ভাঙে, দলাদলি-মারামারি করে। ভাইয়ের বন্ধুদের কাছেই সন্ধ্যা নিজগৃহে প্রথম ধর্ষিত হয়। কিছুদিন পর তারা অন্য মেয়েদেরও এ-বাড়িতে আনে এবং অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে। এসময় তাদের বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন হয়; তারা নতুন পোশাক এবং নগদ অর্থ পায়। সন্ধ্যার মা আবার এই টাকা থেকে নিজের অংশ দাবি করে এবং না পেলে অশ্লীল গালাগালি আরম্ভ করে। তার বাবা এসব নিয়ে ক্ষুব্ধ হলেও ছেলেদের দাপটের কাছে তা অর্থহীন হয়ে ওঠে।

উদ্বাস্তু জীবনের নিদারুণ বাস্তবতা এটিই যে, পরিবারের সদস্যদের মৌন সম্মতিতে সন্ধ্যার সতীত্বনাশ ঘটে। কলকাতার নতুন পরিবেশে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজ বোনকে ব্যবহার করে তার ভাইয়েরা। পারিবারিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের ভয়ঙ্কর বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে সন্ধ্যা এবার নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ধকার জগতে। ক্রমশ সে সিগারেট এবং মদ্যপানে আসক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হওয়ার পরিবর্তে সে দেহব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। ষোল বছর বয়সে সন্ধ্যাকে দেখা যায় কলকাতার খালিকুঠি বেশ্যালয়ে। পেশা ঘৃণিত হলেও সে যথেষ্ট রোজগার করে। ছোটো দুই বোনও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অর্থ যে পথেই আসুক, সন্ধ্যা নিষিদ্ধ জীবনকে ভালোবেসে ফেলে। অন্য মেয়েদেরও সে চাকুরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে ফেলে। তার এ পর্যায়ের শিকার শুভ্রা "মেয়েটার চেহারাটি বেশ মিষ্টি, চোখে পড়বার মতো। একবার হাত করতে পারলে কাজ ভালোই দেবে।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৪)

পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যা প্রায় বিকেলে শুভ্রার ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে চলে আসে এবং তাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গল্প করে। শুভ্রাকে সে মাঝেমধ্যে বেলা বউদির বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। সন্ধ্যার ভাষ্যানুযায়ী—বউদির স্বামী বড় ব্যবসায়ী, গাড়িয়াহাটে তার কাপড়ের ব্যবসায় রয়েছে। তবে ভদ্রলোক বাড়িতেই বেশিক্ষণ থাকে। এক বিশ্বস্ত কর্মচারী তার প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করে। সন্ধ্যার ক্রমাগত অনুরোধে শুভ্রাকে একদিন বউদির ফ্ল্যাটে যেতে হয়। তবে শুরুতেই তার মনে সন্দেহ জাগে। ফ্ল্যাটটি যথেষ্ট পরিপাটি, সেখানে কোনো ছেলেমেয়ে নেই; উপরন্তু বেলা বউদি এবং তার কথিত স্বামীকে মদ্যপ মনে হয়। শুভ্রাকে দেখে লোকটি বলেই ফেলে, "বাঃ এ যে দেখছি খাসা। ওকে কোথা থেকে যোগাড় করলে বেলা" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৫)? তিন তলায় সে আরেকজন মদ্যপ যুবককে দেখতে পায়। সন্ধ্যা লোকটিকে বউদির 'দেওর' বলে পরিচয় করিয়ে দিলেও শুভ্রা বিশ্বাস করেনি। এসময় বাড়িতে তিন-চারজন মেয়ের সঙ্গে আরো দুজন পুরুষ প্রবেশ করে। শুভ্রা বুঝতে পারে, সে এক নারকীয় ফাঁদে আটকে পড়েছে। সন্ধ্যার প্রাইভেট ফার্মে চাকরির নগ্নরূপ তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সন্ধ্যার কাছে মুক্তি কামনা করে, সন্ধ্যাও তাকে অভয় দিয়ে বলে, "ভয় পেয়ো না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে জোর করে কিছু করবে না।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৬)

বিদায়কালে বউদি শুভ্রাকে পঞ্চাশ টাকা উপহার দেয়। তবে এই পাপের অর্থ গ্রহণ করতে সে অস্বীকৃতি জানায়। বউদি এরূপ প্রত্যাখ্যানে হতাশ হয় না। কারণ সে জানে, শুরুতে পালিয়ে গেলেও অভাবের যন্ত্রণায় অনেকেই তার কাছে ফিরে আসে। পরদিন শুভ্রার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই দুঃসময়ে সন্ধ্যা পাশে দাঁড়ালেও শুভ্রা তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে। প্রবলভাবে অপমানিত সন্ধ্যা অশ্রুসিক্ত নয়নে শুভ্রার কাছে জানতে চায় তার প্রাণশক্তির রহস্য। ব্যক্তিগত ক্রোধ সংবরণ করে শুভ্রা উত্তর দেয়, "আমার কাছে জীবনের চেহারাটা অন্য রকম। সুখ আমিও চাই, কিন্তু তার জন্য নিজের সব বিসর্জন দিতে পারব না" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৭)। এরপর থেকে সন্ধ্যারও বউদির বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করে না।

শুভ্রা এবং সন্ধ্যার পারিবারিক কাঠামো প্রায় অভিন্ন, কিন্তু দুজনের মনস্তত্ত্বের ব্যবধান বিস্তর। একজন দারিদ্র্যকে জয় করলেও অন্যজন দারিদ্র্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে বোঝা যায়, শুভ্রা উত্তরাধিকারসূত্রে তার ব্যক্তিচরিত্রে এই চৈত্তিক-দৃঢ়তা অর্জন করেছে। তার বাবা যেমন শত অভাব-অনটনেও কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত হননি, ঠিক তেমনি শুভ্রা অর্থের কাছে তার নারীসম্ভ্রম বিসর্জন দেয়নি। এছাড়া তার উচ্চশিক্ষা এবং শুভচিন্তা চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে শুভ্রার সতীত্বরক্ষার সংগ্রাম প্রশংসনীয় হলেও সন্ধ্যার অধঃপতন অস্বাভাবিক নয়। তাই গল্পশেষে

সন্ধ্যার মনে প্রশ্ন জাগে : "জানি না, ঈশ্বর বলে সত্যি কেউ আছেন কী না? থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, আমাকে কি শুভ্রার মতো শক্তি দিতে পার না?" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৭)

মূলত এ গল্পে সন্ধ্যা কুপথে পরিচালিত হলেও নেতিবাচক চরিত্র নয়। শুভ্রাকে বিপদে ফেলবার উদ্দেশ্য তার ছিল না। সে কেবল নিজের মানদণ্ডে অন্যকে বিচার করতে চেয়েছে। গল্পশেষে শুভ্রার সুচেতনা সন্ধ্যাকে উদ্বোধিত করেছে। তবে সন্ধ্যা সুস্থজীবনে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেও গল্পে এ জীবনের রূপায়ণ নেই।

সমরেশ বসু অসহায় নারীদের রূপোপজীবিনী হয়ে ওঠার কারণগুলো যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন তাদের দুঃখ-দুর্দশার বৃত্তান্ত। নিষিদ্ধ-পল্লিতে আটকে পড়া মেয়েদের অন্তর্যন্ত্রণা এবং তাদের প্রতি সমাজের অসম্মানের চিত্র তাঁর কয়েকটি গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। 'দেওয়াল লিপি' গল্পের প্লট গড়ে উঠেছে মফস্বলের পতিতা পল্লির সামনে লেখা একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে, যেখানে বলা হয়েছে, "যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৩৮)। বিষয়টি থানার নতুন পুলিশ অফিসারের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন। এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে তিনি এ ধরনের নোংরা দেওয়ালচিত্রণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং তৎক্ষণাৎ একজন কনস্টেবলকে দিয়ে দেওয়াল পরিষ্কার করান। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তিনি স্থানীয় দোকানিদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর মধ্যে কয়েকজন সমাজকর্মী তার সঙ্গে দেখা করেন। তারা অফিসারের নিকট একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করেন, যার উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ :

> আমাদের শহরের ব্যাপার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এই শহরের স্বাধীন নাগরিকরাই, এই দেশে প্রথম দাবি করিতেছি, এই পাপ-ব্যবসার বিলোপ সাধন করিয়া, দেহ-ব্যবসায়ী নারীগণকে সমাজের মঙ্গলময় কাজে লাগানো হউক।
>
> যদি বিলোপ সাধন এখুনি সম্ভব না হয়, তবে ঠাকুরগলির ব্যবসা এই শহর হইতে অন্যত্র উঠাইয়া লওয়া হউক। অন্যথায়, শহরের বুকে, দেওয়ালের কলঙ্ক দূর হইবে না। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৪১)

এদের সুপরামর্শ অফিসারের মনঃপুত হয়নি। তিনি পাপ-বাক্যের অপসারণ চাইলেও পাপের মূল-উৎপাটন করতে চান না। উনত্রিশবার দেওয়াল লিপি পরিষ্কার করে ক্লান্ত অফিসার বদলি হয়ে গেলেও জানা যায়নি দেওয়াল-লেখকের নাম-পরিচয়। তবে পতিতালয়ে আগত লম্পটদের 'শুয়োর'রূপ যে অবান্তর নয়, তা সেখানকার মেয়েরা জানে, "আহা, কী মরণ গো! এত দাপাদাপি কিসের। যারা এই গলিতে ঢোকে, তারা তাছাড়া আবার কী।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৪২)

'দেওয়াল লিপি' গল্পে দেহব্যবসায়ের নেপথ্যের কুশীলবদের শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যাদের ইশারায় পুলিশ অফিসার দেওয়াল লিপি অপসারণে উদ্যোগী হন। "যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা।"—এরূপ বাক্যপ্রয়োগে অফিসারের প্রবল আপত্তি থাকলেও, যারা এই গলিতে নিত্য যাতায়াত করে তাদের ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ। এমনকি পতিতাপল্লি অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা এখানকার অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও তার কোনো তৎপরতা নেই। এই পুলিশ অফিসার মূলত শহরকে পরিচ্ছন্ন নয়, বরং দেহব্যবসায়কে নিষ্কণ্টক রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছেন। হয়তো রূপোপজীবিনীদের কষ্টার্জিত অর্থের তিনিও একজন গোপন অংশীদার।

'প্রাণ-পিপাসা' গল্পে পরিদৃষ্ট হয়, রূপোপজীবিনীদের কর্মপদ্ধতি চটকল শ্রমিকদের মতোই। তাদের আবাস-আসবাব সবই মালিকের, তারা শুধু 'খাটতে' আসে। সারারাত লাঞ্ছনাভোগের পর তারা যে অর্থ পায় তা অতিনগণ্য। উপরন্তু তাদের শরীরে বাসা বাঁধে প্রাণঘাতী অসুখ, যা

চিকিৎসার সামর্থ্য তাদের নেই। মূলত গণিকাবৃত্তিও এক প্রকার বাণিজ্য এবং এ বাণিজ্যে "বিনিয়োগের তুলনায় লাভ অনেক বেশি। এ বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা থাকায় গোপনে এক বিশাল অপরাধচক্র নিয়োজিত হয় অসহায় নারীদের শোষণ করে মুনাফা লাভের নেশায়। দাসপ্রথা বহুকাল আগে বিলুপ্ত হলেও এই শোষণের চক্র পৃথিবীব্যাপী এক নব্য দাসপ্রথা চালু রেখেছে।" (মনিরুল, ২০২০ : ১৬৮)

'প্রাণ-পিপাসা' গল্পের কথক একজন ভবঘুরে; কয়েকদিন নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে সে নৈহাটিতে এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং রাস্তার ধারে এক নারীর আহ্বানে সে তার ঘরে আশ্রয় নেয়। যদিও ঘরের পরিবেশ স্বস্তিদায়ক নয়—"ঘরের মেঝেও টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ভিজে গেছে। তক্তপোশের বিছানাটা ভেজেনি। ঘরের মধ্যে আছে দু-চারটে সামান্য জিনিস, থালা গেলাস কলসি" (সমরেশ, ২০১৪ : ১৯৫)। কিছুক্ষণ পর গল্পকথক মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করে এবং মেয়েটিও তাকে রাতের অন্য অতিথির ন্যায় বিবেচনা করে। এসময় গল্পকথক মেয়েটিকে তার আর্থিক দুরবস্থা জানিয়ে দেয়, "মিছে ডেকেছ, এদিকে পকেট কানা" (সমরেশ, ২০১৪ : ১৯৬)। রোজগারের উপায় হারিয়ে মেয়েটি বিপন্নবোধ করে। গল্পকথক তার ব্যবসায়িক ক্ষতি চায়নি, তাই সে দ্রুত স্থানত্যাগে উদ্যত হয়। অন্যদিকে রূপোপজীবিনী হলেও মেয়েটি অমানবিক নয়। দুর্যোগঘন রাতে সে অতিথিকে আশ্রয়চ্যুত করেনি, বরং তার সাধ্যানুযায়ী 'ভাত-চচ্চড়ি' দিয়ে আপ্যায়ন করেছে। বৃষ্টিভেজা রাতে পাশাপাশি শুয়ে যন্ত্রণাকাতর মেয়েটির কাছ থেকে গল্পকথক জানতে পারে ওর চরম অসুস্থতার কথা :

> বললাম, তা বলই না কেন রোগটা।
> যা হয় এ লাইনে থাকলে – সে বলল।
> লাইনে থাকলে? সর্বনাশ! ভীষণ সিটিয়ে গেলাম। ভয়ে ঘৃণায় জিজ্ঞেস করলাম, এর উপরও সন্ধ্যারাত্র–
> নিশ্চয়ই।
> পাঁচজন – সে বলল।
> ইস্! কী সাংঘাতিক! বললাম, চিকিচ্ছে করাও না কেন?
> পয়সা পাব কোথায়?
> কেন? নিজের রোজগার?
> সে তো মনিবের পয়সা।
> মনিব? এটা কি চাকরি নাকি?
> নয়তো কী? মনিবের ব্যবসা. ঘরদোর জায়গা জিনিস। আমরা আসি খাটতে। (সমরেশ, ২০১৪ : ১৯৯-২০০)

এই হচ্ছে রূপোপজীবিনীদের প্রকৃত জীবনচিত্র। নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসে তারা জটিল যৌনরোগে আক্রান্ত হয় এবং একরকম বিনা চিকিৎসায় অকালমৃত্যুর শিকার হয়। সমরেশ বসু তাদের অন্দরমহলের বাস্তব চেহারা নির্মোহভাবে গল্পে উন্মোচন করেছেন। রূপোপজীবিনীর শারীরিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি কল্পনাপ্রবণ নন : "সমস্ত মুখটি লাঞ্ছনায় ভরা, আকাশমুখো নাক, মোটা ঠোঁট।" (সমরেশ, ২০১৪ : ২০০)

'বিষের ঝাড়' গল্পেও রূপোপজীবিনীদের স্বাস্থ্যসংকটের কথা উচ্চারিত হয়েছে। অতিরিক্ত যৌনসঙ্গমের দরুন তারা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এ গল্পে পতিতা-পল্লিতে চিকিৎসা করে হারাধন নামের এক হাতুড়ে ডাক্তার। হারাধন জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইতঃপূর্বে নানা পেশায় অকৃতকার্য হয়ে সে রূপোপজীবিনীদের ডাক্তার হয়। এজন্য চলতিপথে সে কৌতুকের স্বীকার হয়; তথাপি ক্ষুধার্ত স্ত্রী-সন্তানদের মুখায়বব ভেবে সে চক্ষুলজ্জা উপেক্ষা করে। প্রথমদিকে

অজানা পল্লির প্রতি হারাধনেরও কৌতূহল ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সে হয়ে ওঠে এদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার। নির্যাতিতা মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে সে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। একদিন পুতুল নামের এক মেয়ের শরীরে ইনজেকশন প্রয়োগকালে সে সতর্ক করে : "একটু দেখে শুনে মানুষ ঘরে তুলতে পারিসনে, অ্যাঁ" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৬)। এতদিন এই পল্লিতে বিচরণ করলেও হারাধন যে সত্যটি উপলব্ধি করেনি, পুতুল তা শুনিয়ে দেয় : "তা কি হয় বাউনবাবা? খদ্দের কানা হোক, খোঁড়া হোক, সে যে ভরসা।" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৬)

নিজ পেশার প্রতি দায়িত্বসচেতন হলেও এর উপযুক্ত প্রতিদান নেই। এদিন পুতুল ডাক্তারের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করতে পারে না। নিষিদ্ধ-পল্লির আরেক মেয়ে চণ্ডীরও একইদশা। হারাধন যখন তার ঘরে উপস্থিত হয়, তখনও মেয়েটি বিবস্ত্রা। এক খরিদ্দার কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরত্যাগ করেছে। চিকিৎসার প্রাক্কালে হারাধন মেয়েটিকে পোশাক পরিধান করতে বলে। চণ্ডীও ডাক্তারের পারিশ্রমিক প্রদানে অপারগ, এর পরিবর্তে সে এক সের চাল এগিয়ে দেয়। চালের গন্ধে হারাধন বিমোহিত হয়ে পড়ে, নিমিষেই এক মুঠো চাল নিয়ে সে চিবুতে থাকে। কিন্তু যখন জানতে পারে চণ্ডীর চালের ভাণ্ডার শূন্য, তখন সে এ দক্ষিণার পুরোটা গ্রহণ করতে পারে না। মেয়েটিকে চালের অর্ধেকটা ফেরত দিয়ে সে যথারীতি সাবধান করে : "দু-একটা রাত একটু কামাই দে, কামাই দে" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৮)। প্রত্যুত্তরে চণ্ডীও পুতুলের মতো তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে : "এ জীবনে আর কামাই দেওয়া হবে না। এক রাত্রিও থামাতে পারা যাবে না। এ শরীরের বিশ্রাম নেই। পারলে কি নিজের মুখের ভাত কেউ তুলে দেয়!" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৮)

হারাধনের পরবর্তী রোগী সরলা। ওর চেহারা অনেকটা ডাক্তারের সেজো মেয়ের মতো। তাই মেয়েটিকে সে বিশেষ স্নেহ করে। সঙ্গীদের মতো সরলারও চিকিৎসার সামর্থ্য নেই। তাই ডাক্তারের কাছে সে করুণকণ্ঠে অনুকম্পা প্রার্থনা করে। এসময় এক প্রভাবশালী খদ্দের তাকে আহ্বান করে এবং সরলার নিস্পৃহতার পরিপ্রেক্ষিতে সে কিষণ নামের এক গুণ্ডাকে ডাকতে থাকে। "কিষণ এখানকার বেয়াদপ মেয়েদের যম" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৯)। অনন্যোপায় হয়ে সরলা লোকটির হুকুম পালন করে। নিষিদ্ধ-পল্লির মেয়েদের কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। ক্ষুধা এবং ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়ে তারা ক্রমাগত শরীরকে বিষাক্ত করে ফেলে এবং যৌবনশেষে অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। বাইরের আলো ঝলমল পরিবেশের বিপরীতে এটিই হচ্ছে বাস্তবসত্য। সমরেশ বসুর গল্পের এ শ্রেণির চরিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রগুলোর যে বড় পার্থক্য রয়েছে, তাও সূচিত হয়েছে এ গল্পে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> রানী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'ছোঁড়ার মরণ ধরেছে। চন্দ্রমুখীটা কে বাউনবাবা?'
> 'সে এক গল্পের বেবুশ্যে। শরৎ চাটুয্যের নাম শুনেছিস?'
> 'নরসিং চাটুয্যেকে তো চিনি, ও নাম তো জানি না।'
> হারাধন বলল, 'তিনি বেবুশ্যেদের গল্প লিখতেন, খুব নামী লোক ছিলেন রে।' পরমুহূর্তেই মুখটা ঘোঁচ করে বলল, 'তা বলে তিনি তোদের মতো হাভেতেদের কথা লেখেননি; যাদের কথা লিখতেন, তাদের একটা প্রাণ ছিল।' (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৯)

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সমরেশের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। তবে শরৎ-সাহিত্যে বর্ণিত "পতিতা নারীসমাজ প্রেমের মহিমায় কারো চেয়ে তুচ্ছ নয়, নগণ্য নয়। তাদের একনিষ্ঠ প্রেমের সঞ্জীবনী স্রোতে অবগাহন করে তৃপ্ত স্নিগ্ধ হয়েছে পুরুষের হৃদয়" (গোপিকানাথ, ২০১০ : ১২২)। অন্যদিকে সমরেশ বসু কোনো ভাববিলাস নয়, এক-একজন সাধারণ রূপোপজীবিনীর জীবনবিপর্যয়ের গল্প বলেছেন।

সমাজের নিম্নবিত্ত নারীরা অকাল বৈধব্যের শিকার হয়ে প্রভাবশালীদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এদের সঙ্গে যারা ফূর্তি করে তারা আবার নিজেদের কলঙ্কমুক্ত প্রমাণ করতে চায় এবং

নিঃস্ব নারীকে নিয়ে অতিরঞ্জিত বক্তব্য দেয়। সমরেশ বসু 'পঞ্চায়েত' গল্পে এ ধরনের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এ গল্পে শুকালুর বিধবা স্ত্রী কুনতির চারিত্রিক স্খলনের অপরাধে বিচার বসে। শুকালু পার্শ্ববর্তী চটকলের শ্রমিক ছিল। আজন্ম গ্রামীণ পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা ছেলেটি চটকলের হাড়ভাঙা পরিশ্রম সহ্য করতে পারেনি। তাই অল্পদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। এরপর কুনতির শারীরিক সৌন্দর্য তার বিপত্তির কারণ হয়। বস্তির পুরুষদের কাছে সে হয়ে ওঠে 'বেওয়ারিশ আওরৎ'। তার সন্তানরাও মায়ের দুর্বলতা উপলব্ধি করে : "জন্মের পর থেকে ওরা দেখেছে, যারা মায়ের সঙ্গে কথা বলে তারা সকলেই মতলববাজ।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯১)

শুকালুর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি কুনতিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘরে তোলে এবং কিছুদিন পর তাকে চটকলের সর্দারের সঙ্গে আলিঙ্গনে বাধ্য করে। এরপরও কুনতি নানাজনের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে; কিন্তু কেউ তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, এর পরিবর্তে সে পেয়েছে মাতালদের প্রহার আর গর্ভে সন্তান। শুকালুর বন্ধু হীরালাল নানাভাবে সাবধান করলেও কুনতির গত্যন্তর ছিল না। বস্তির অন্য নারীরাও স্বামীর গতিবিধি নিয়ে সর্বদা দুঃশ্চিন্তায় থাকে এবং স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা কুনতির ওপর চড়াও হয়। পঞ্চায়েতে বস্তির নারীদের আস্ফালনই তাই বেশি ছিল :

> ক. কে বলবে ওই বাচ্চা তিনটের মা ওই মাগী। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৮৯)
> খ. রেণ্ডির আবার শরম। জোয়ানী উমরে আমাদেরও গোলমাল হয়েছিল। পঞ্চায়েত হয়েছিল, সাজা দিয়েছিল। তা আমরা কি ওই হারামজাদীর মতো বসেছিলাম। বুক অবধি ঘোমটা ছিল – হ্যাঁ। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯২)
> গ. মাগীকে কবুল খেতে হবে, ওর বাচ্চাগুলোর বাপ কে। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯৭)

এই পঞ্চায়েতের সভাপতি চটকলের হেডসর্দার হড়কু ঠাকুরজী। ব্রাহ্মণ হলেও সে লাম্পট্য এবং অপকর্মে অদ্বিতীয়। মাতাদীন নামের এক ব্যক্তি তাকে দেখে বলে, 'লুচ্চা কাঁহিকা'। ঠাকুরজী সুদি কারবারের সঙ্গে জড়িত, ডোমপাড়ার সন্নিকটে তার নিয়ন্ত্রিত একটি পতিতা-পল্লিও রয়েছে। এ-ব্যাপারে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল এরকম : "ঘরের ময়লা সাফ করে ফেলবার জন্য একটা আঁস্তাকুড় তো চাই। সে তোমার দেওতার রাজত্ব স্বর্গেও খানিক আঁস্তাকুড় আছে। দুনিয়ার নিয়ম এটা" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯৩)। এভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে সে অশিক্ষিত শ্রমিকদের কাছে নিজের অপকর্মের বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা করে। বিচারকালে সে কুনতির অদৃষ্টকে দায়ী করে এবং তাকে বস্তি থেকে বিতাড়িত করার রায় প্রদান করে। একইসঙ্গে কুনতির জরিমানা হিসেবে সে পঞ্চাশ টাকা ধার্য করে। তার এই বিচারিক সিদ্ধান্তের অন্তরালে ছিল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের চক্রান্ত। সে জানে, কুনতির পক্ষে জরিমানা পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই কুনতির হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সে তাকে কুক্ষিগত করবার পরিকল্পনা আঁটে। তার কূটবুদ্ধি বুঝে উঠতে কুনতির বিলম্ব হয় না। অপরিসীম ঘৃণায় জলন্ত হেসে সে ঠাকুরজীকে বলে, "তোমার লাইনে তবে একটা ঘর বন্দোবস্ত করে রেখ" (সমরেশ, ২০১৪ : ৬০১)! গল্পশেষে কুনতিকে হড়কু ঠাকুরজীর কূটজালে আটকে পড়তে হয়নি। এ অপদশা থেকে হীরালাল তাকে উদ্ধার করে এবং নতুন সংসার গড়বার প্রত্যয় প্রকাশ করে। সমরেশ বসু তাঁর গল্পে রূপোপজীবিনীদের প্রতি কেবল সহানুভূতি প্রকাশ করেননি, তাদের সামাজিক অবস্থানও নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।

কুনতির মতোই পঙ্কিল জীবনাবর্ত থেকে আলোকময় জীবনের সন্ধান পেয়েছে 'মেঘলা ভাঙা রোদ' গল্পের ফুলমণি। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটির নির্দিষ্ট আবাস-আশ্রয় নেই। এক ঝড়ের রাতে সে যখন রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়েছিল, তখন তাকে ট্রাকে তুলে ধর্ষণ করে ভন্টা নামের এক কুলি। ড্রাইভার বিশুকেও সে এ-কাজে প্রলুব্ধ করে। বিশু মাঝেমধ্যে 'মেয়েপাড়া'য় গেলেও

ভন্টার মতো উচ্ছৃঙ্খল নয়। কিছুদিন পূর্বে তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। তাই মেয়েটিকে সে নিজ ঘরে নিয়ে আসে। স্ত্রীসঙ্গ-বিবর্জিত বিশু এ রাতে চরম উত্তেজনায় অভাবে অপুষ্ট মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় :

> এটা মেয়েপাড়ার আলোঝলকানো, নগদ-দামে-কেনা বেলেল্লাপনা নয়। নয় মাপা জলের তৃষ্ণা মেটানো। পথ থেকে কুড়িয়ে আনা, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা নয়, ষোল আনা। সবটাই লাভের। পিঁপড়েয় যেটা খাবে সেটা মেয়েটাকেই খাবে। যতখানি খুশি, যা খুশি তাই করে, ফেলে দিলেই হবে। নিরুঙ্কুশ স্বাধীনতা। (সমরেশ, ২০১৪ : ২৮১)

যেখানে চারদিকে লালসার হিংস্র থাবা, সেখানে অনাথ মেয়েটির এটিই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করবার শক্তি বা সাহস তার নেই। তাই এ অত্যাচারকে সে নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। নির্যাতনভোগের বিনিময়ে দু-একবেলা খেতে পেলেই সে সন্তুষ্ট। তাই বিশুকে প্রতিরোধ নয়, নীরবে বরণ করতে সে প্রস্তুত হয়। সকালে বিশু মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় না, ঘরে তালাবন্দি করে কাজে যায়। পরদিন বিশু মেয়েটিকে তার মৃত স্ত্রীর লাল শাড়ি পরিধান করতে বলে। এসময় ওর সুসজ্জিত রূপ দেখে সে আশ্চর্য হয়। এদিন উভয়ের প্রথম কথোপকথন হয় :

> 'স্বামী নেই?'
> – 'না।'
> ...'ফেলে পালিয়েছে বুঝি?'
> – 'হ্যাঁ।'
> – 'কোত্থেকে আসা হয়েছিল?'
> – 'দক্ষিণ থেকে।'
> – 'পেটে খেতে না পেয়ে?'
> – 'হ্যাঁ।'
> – 'ছেলেপুলে নেই?'
> – 'মরে গেছে।'
> – 'আর তুমি কী করছিলে পথে পথে?'
> ...'কী আর করব ! যার যা খুশি তাই করছিল।'
> ... 'মানে? মানে, আমার মতো?'
> – 'হ্যাঁ, একরকমই।' (সমরেশ, ২০১৪ : ২৮৫-২৮৬)

ফুলমণি অবলীলায় তার ওপর অন্য পুরুষদের অকারণ অধিকারের ফিরিস্তি তুলে ধরে। কিন্তু বিশু তা সহজভাবে মানতে পারে না। রাগে, ঘৃণায় সে তাকে চপেটাঘাত করে। সহায়-সম্বলহীন নারীর এ লাঞ্ছনা যে নিত্যদিনের—তা সে বুঝতে চায় না। বস্তুত ফুলমণিকে বিশু মনের অলক্ষ্যে ভালোবেসে ফেলে। তাই প্রতিদিনের মতো ফুলমণিকে সে বিতাড়িত করতে চাইলেও শেষাবধি স্থায়ীভাবে ঘরে রাখার চিন্তা করে। এভাবে গল্পে এক রূপোপজীবিনীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষণীয় যে, এ গল্পে বিশুও ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষ চরিত্র। সে বারবার ভয়ঙ্কর আক্রোশে ফুলমণির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে, কিন্তু অজানা কারণে নিজেকে সংযত রেখেছে। বিশুর মনের সুপ্ত নীতিচেতনা এই মিলনকে সম্ভব করেছে।

সাতচল্লিশের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় চাকরির বাজার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ জীবিকার প্রশ্নে কলকারখানায় যুক্ত হতে থাকে। বিদ্যার্জনের সমুচিত মূল্যায়ন না পেয়ে এরা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অনেকে মদ ও পরনারীতে আসক্ত হয়। চাকরির মাইনে পেয়ে কেউ-কেউ পতিতালয়ে যায়। 'মাসের প্রথম রবিবার' গল্পে এমন প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে। এ গল্পে ভুণ্ডুল দত্ত এবং পেটো গ্র্যাজুয়েট,

তথাপি তারা চটকলে কাজ করে। একজন সেখানকার কেরানি, অন্যজন জুনিয়র সুপারভাইজার। চটকলের সারামাসের ক্লান্তি এবং অন্তরের গ্লানি থেকে মাসের প্রথম রবিবার তারা মুক্তি খোঁজে। এদিন তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা মদ্যপান করে। ছুটির রাতে তাদের মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় বালিপুকুরের বস্তিতে, এটি স্থানীয় 'বেশ্যালয়' – যেখানে "বাজারের মুখ চেনা ফড়িয়া, মাছ বিক্রেতা, কারখানার শ্রমিক আর রিকশাওয়ালারাই প্রধান খরিদ্দার" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩০৮)। বস্তির একপাশে জায়গা করে নিয়েছে হিজড়া সম্প্রদায়। ভুণ্ডুলের সহকর্মী কালীতোষ এই পল্লিতে নিত্য যাতায়াত করে। খুসী নামের এক মেয়ে তার ব্যক্তিগত রক্ষিতা। এখানে হাবি নামের এক প্রতিবন্ধী মেয়ে ভুণ্ডুলের দৃষ্টি কাড়ে। মেয়েটি বোবা, বধির; ওকে দেখে ভুণ্ডুলের মনে প্রশ্ন জাগে, "এরকম একটা মেয়ে এই পেশায় এল কী করে" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১১)। তার কৌতূহলের উত্তর মেলে খুসীর জবানিতে :

> এসেছিল তো একটা পোড়া কাঠ। কোলে আবার কয়েক মাসের ছেলে। ছেলেটা মরে বেঁচেছে। সবিতাদের বাড়িতে বাসনকোসন মাজত। পেটে ভাত পড়তেই দেখা গেল ছুঁড়ির গতরে চেকনাই মারছে। সাত ভূতে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছিল। কী দরকার বাবা? নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে এই ঘরে এনে বসালাম, এখন দিব্যি করে খাচ্ছে। (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৩)

'সাত ভূতে'র ক্রমাগত আক্রমণ থেকে বাঁচাতে খুসী হাবিকে এই পল্লিতে নিয়ে আসে। এখানে কষ্ট আছে, রয়েছে নির্যাতনভোগ; তারপরও মেয়েটি একটি পেশাগত পরিচয় এবং কিছু সঙ্গী পায়। গল্পে ভুণ্ডুলের সঙ্গে হাবির মিলনের যে বর্ণনা রয়েছে তা আদিরসাত্মক; তবে উত্তেজনার অন্তরালে সমরেশ বসু সেখানে উদ্বেগ সঞ্চার করেছেন :

> হাবি ভুণ্ডুলের বুকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে হাসলো। গলা থেকে সেই অদ্ভুত কুঁইকুঁই শব্দ করে ঘাড়-বাঁকিয়ে ত্যারছা চোখে তাকাল। ওর শরীরের একটা পাশ ভুণ্ডুলের শরীরে লেপটানো। ভুণ্ডুল চোখের পাতা টান টান করে তাকাল। হাবির চুলে হাত দিল, 'চুল এত ছোট কেন?' ঠোঁটি ঠোঁটি? অসুখ করেছিল? (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৫)

ভুণ্ডুলের কাছে শেষাবধি শরীর নয়, প্রতিবন্ধী মেয়েটির দুর্দশাই গুরুত্ব পায়। জিজ্ঞাসাবাদে হাবি ইশারায় বুঝিয়ে দেয়—তার মাথার চুল দেশলাইয়ের কাঠিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যজন ছুরি দিয়ে তাকে 'ফালা ফালা' করতে চেয়েছে, গালের কাটা দাগটি সেই চিহ্ন বহন করছে। শুধু তাই নয়, "হাবি প্রায় ওর সারা নিম্নাঙ্গটাই দেখাল। কাটা দাগে ভরা" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৬)। ভুণ্ডুলের মতো শিক্ষিতরাই কেবল হাবির খদ্দের হয়ে আসে না, তার সঙ্গে রাত কাটায় মাতাল সন্ত্রাসীরাও। এরা কেবল শারীরিক তৃষ্ণা মিটিয়ে ক্ষান্ত হয় না, নিজেদের পশুত্বকেও প্রকাশ করে। আনন্দপ্রাপ্তির ন্যূনতম ঘাটতি হলে তারা অমানুষিক আচরণ করে।

'মাসের প্রথম রবিবার' গল্পে হাবি রূপোপজীবিনী হয়েও মমতাময়ী নারীরূপে চিত্রিত হয়েছে। ভুণ্ডুলকে সে শুধু দেহদান নয়, পরিবেশন করে রাতের খাবার। পান্তাভাত, বসন্তকালের নতুন লেবু, সরিষার তেল আর কাঁচা লঙ্কার সাথে সে পাতে দেয় সোনা খড়কে মাছ। রূপোপজীবিনীর ঘরে এটিই হয়তো সবচেয়ে উপাদেয় আয়োজন। হাবি অতিথির মুখে নিজেই অন্ন তুলে দেয়। তখন "চোখে কি ওর স্নেহ; অথচ সংকুচিত জিজ্ঞাসা? ভুণ্ডুলের মুখের ভিতর খাদ্যের স্বাদে লালা উপছে এল, আর চোখ দুটোও যেন জ্বালা করে ঝাপসা হয়ে উঠল" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৭)। সমরেশ বসু এ গল্পে রূপোপজীবিনীদের ক্রীড়াময়ী রূপ কিংবা বেদনাবিধুর জীবনচিত্রণের পাশাপাশি তাদের নারীত্বের চিরন্তন বৈশিষ্টগুলো শিল্পায়িত করেছেন।

সমরেশের 'উৎপাত' গল্পে স্ত্রীর স্বৈরিণী-স্বভাবে তার স্বামী বিষিয়ে উঠলেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতায় মৌন থেকেছে। 'আলোর বৃত্তে' গল্পে পরিলক্ষিত হয় এর ভিন্নরূপ। এখানে স্বামীই অর্থকষ্টে দিশেহারা হয়ে স্ত্রীকে গণিকাবৃত্তিতে বাধ্য করেছে। এ গল্পে কেদার এবং টগর

জাতিতে নমঃশূদ্র। বাল্যকালে তাদের বিয়ে হয় এবং বিয়ের দুবছর পর তারা দাঙ্গা-দেশভাগের শিকার হয়। এরপর বাস্তুচ্যুত হয়ে তারা কলকাতার ফুটপাতের ওপর একটি 'খুপরি'তে আশ্রয় নেয়। এখানে "এক-একটা পুরো পরিবার এক-একটা খোপে। হোগলা গোলপাতা, ছেঁচা বেড়া, টিনের টুকরো, নানান জোড়াতালিতে খুপরিগুলি তৈরি" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৩)। উদ্বাস্তু দশায় কেদার বিভিন্ন কাজের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাজারে পণ্য খালাসের কাজ ব্যতীত তার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। জীবনযুদ্ধে পরাস্ত কেদার পরবর্তীকালে এক অদ্ভুত নেশায় মেতে ওঠে। শহরের নারীলোভী বাবুশ্রেণির কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতে সে স্ত্রীকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করে : "শালার ধিঙ্গি শোল যাবে কোথায়? এমন তাজা চকচকে আরশোলার টোপ" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৫)! এ ব্যাপারে টগর প্রবলভাবে আপত্তি করে। কিন্তু কেদার তার আবেগকে নাড়া দিয়ে সম্মতি আদায় করে—"একবেলা খাই, টগর তোর প্রাণে একটু দয়া-মায়া নেই" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৫)? স্বামীর হৃদয়স্পর্শী অনুনয়ে টগর বিগলিত হয় এবং প্রতি রাতে ঘুমন্ত সন্তানকে ঘরে রেখে তারা শিকার সন্ধানে যায়। নির্ধারিত স্থানে আবির্ভূত হয় কেদারের দুই সহযোগী : রতন এবং বিষ্টু। উৎসুক কাউকে দেখলে তারা টগরকে সংকেত করে :

> সাবধান। শিকার সামনে। আস্তে চল। আরো আস্তে। তাকাও। একটু হাসো। বারে বারে তাকাও। অন্যদিকে তাকাবার অবসর দিও না। আর একটু হাসো। ভয় নেই, চোখ নামিও না। দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে পড়। (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৬)

শিকার ধরতে তাদের বিলম্ব হয় না। টগরের নিকটবর্তী হয়ে কৌতূহলী পথিক হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করে, "নতুন নামা হয়েছে বুঝি? তাকাও। ঘরের বউ বলে মনে হচ্ছে" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৭)। আর তখনই অন্ধকারের অন্তরাল থেকে বিষ্টুরা ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থিত হয়। সম্মানহানি এবং পুলিশের ভয় দেখিয়ে তারা লোকটির কাছ থেকে নগদ অর্থ আদায় করে, যার একটি অংশ পায় কেদার। এসময় উৎকণ্ঠিত টগর দ্রুত স্থানত্যাগ করে এবং ঘরে এসে তীব্র অপরাধ যন্ত্রণায় জর্জরিত থাকে। এরপর কেদারের আশ্বাসবাণীতে (তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।) সে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দ্বিধা-লজ্জা-ভয় কাটিয়ে এক পর্যায়ে টগর নিজেই সজ্জিত হয়ে কেদারকে আহবান করে এবং কেদার অসুস্থ থাকলে পরদিনের খরচ যোগাড়ের চাপে একাই বেরিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে কেদারের মধ্যে দেখা যায় লক্ষণীয় পরিবর্তন। সে সবকিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং কারণে-অকারণে টগরের ওপর ক্রুদ্ধ থাকে। স্বামীর নির্দেশে টগর নিজেকে বিকিয়ে দিলেও সেই স্বামীই তাকে 'অসৎ', 'কুলটা' বলে ভর্ৎসনা করে, "এই করেই তোকে চিনতে পেরেছি। বেশ্যা" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪২০)। শুধু অপমান নয়, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কেদার স্ত্রীকে তীব্রভাবে আঘাত করে এবং তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। গল্পশেষে কেদারের বোধোদয় হলেও তাদের দাম্পত্যসম্পর্কের যে ক্ষতিসাধন হয়, তা অপূরণীয়।

সমরেশ বসু একজন রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবেই সুপরিচিত। তাঁর গল্পে যেমন চল্লিশের দশকের অস্থির দেশকালের চিত্র বিধৃত হয়েছে, তেমনি এই উত্তাল সময়ে দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগের কবলে পড়ে অসহায় নারীদের কুলহারা হবার দৃষ্টান্তও প্রকাশ পেয়েছে। নারীজীবনের এরূপ অবমাননা বাংলা ছোটগল্পে ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হলেও সমরেশের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। তিনি রূপোপজীবিনীদের মর্মস্পর্শী জীবনকথনের সমান্তরালে এ-জীবনগ্রহণের অনিবার্য কারণসমূহ অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর গল্পের রূপোপজীবিনীরা জীবনবঞ্চনার সূত্রগুলো অনুধাবন করতে জেনেছে; তাই পতিতা-পল্লির ভয়াবহ পরিবেশেও তারা শিহরিত হয় না, বরং এটিকে জীবনের নিয়তি হিসেবে স্বীকার করে। সমকালীন গল্পকাররা যেখানে এই অন্ধকার পরিমণ্ডল থেকে রূপোপজীবিনীদের স্বাভাবিক জীবনকল্পনায় দ্বিধান্বিত ছিলেন, সেই পরিস্থিতিতে সমরেশ বসু তাদের সমাজ-সংসারে

প্রত্যাবর্তনেরও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সবমিলেয়ে তিনি রূপোপজীবিনীদের অপরাধী নয়, শোষিত শ্রেণির অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে গল্পে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

টীকা

১. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে : 'পুরুষ আকর্ষণের জৌলুস তথা আকর্ষণের দক্ষতা অনুযায়ী গণিকাদের বেতন নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গণিকাধ্যক্ষ গণিকাদের উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণিতে বিভাজিত করে যথাক্রমে ৩০০০, ২০০০, ও ১০০০ পণ বাৎসরিক বেতন প্রদান করবেন। রাজকীয় সৌকর্য উদ্ভাসিতকরণের প্রয়োজনে রূপ যৌবনের মানদণ্ডে গণিকাদের রাজার ছাতা বহনের কাজে, সোনালিপাত্র বহনের কাজে, বাতাস করার পাখা চালানোর কাজে, বসবার স্থানে পরিসেবার কাজে, পাল্কিতে আরোহণে সহায়তার কাজে এবং রথে আরোহণে সহায়তার কাজসহ অন্যান্য কাজে নিযুক্ত করতে হবে। বয়সজনিত কারণে যে গণিকার সৌভাগ্য অবলুপ্ত হবে তাকে পরবর্তী সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত গণিকার মাতৃরূপে নিযুক্ত করতে হবে। দীর্ঘদিন রাজার মনোরঞ্জন ও রাজসেবা প্রদানের কারণে রাজা তাকে পরিত্যাগ না করে অন্যত্র জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে দিবেন।' (রাজ্জাক, ২০২৩ : ১৫৬)

২ ক. '*সমাচার দর্পণে*র খবর থেকে দেখা যায়, নিকি নামে এক বিখ্যাত বাইজিকে ১৮২০-এর দশকে একজন বাবু কিনেছিলেন তখনকার এক লাখ টাকা দিয়ে। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যায় যে, রক্ষিতাকে পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়ে গর্বও বোধ করতেন বাবুরা।' (গোলাম, ২০১৩ : ২০৯)

খ. উনিশ শতকের প্রথম দিকের লেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) [নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) পিতা] তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন : তৎকালে 'পতিতালয় সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। দাদা, বাবা, ছেলে একসঙ্গে একই পতিতালয়ে যেত এবং তাদের দেখা হয়ে গেলে কোনো অপরাধবোধ হতো না, বা লজ্জা পেতো না। [...] বিদেশে [কর্মক্ষেত্রে] পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল ও মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।' (বিলকিস, ২০১৩ : ১৫৭)

৩ উনিশ শতকের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী একজন রক্ষিতা। তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *আমার কথায়* গণিকাবৃত্তির নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মানদা দেবী নামে আরেকজন বারনারীর পরিচয় পাওয়া যায়, *শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত* নামে তারও একটি গ্রন্থ রয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অমলেন্দু সেনগুপ্ত (২০০৬)। *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*। প্রতিভাস, কলকাতা।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৫)। *কালের পুত্তলিকা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০১০)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গোলাম মুরশিদ (২০১৩)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। অবসর, ঢাকা।

দীপালি নাগ (১৪১২)। *এবং মানুষ : সমরেশ বসুর গল্প*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

বিলকিস রহমান (২০১৩)। *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিলু কবীর (২০১৩)। 'চৌদ্দ আইনে অবিদ্যাশাসন'। *ধমনি* (বেশ্যা সংখ্যা), নীলিমা, কিশোরগঞ্জ।

বুদ্ধদেব বসু (অনূ, ২০০৬)। *কালিদাসের মেঘদূত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মণি নাগ ও স্বাতী ভট্টাচার্য (২০২০)। *দেবদাসী থেকে যৌনকর্মী*। দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

মনিরুল ইসলাম (২০২০)। *নারী-পুরুষ বৈষম্যের উৎস*। সংহতি, ঢাকা।

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক (২০২৩)। *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*। নালন্দা, ঢাকা।

মাসুদ রহমান (২০১৩)। 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পতিতা : একটি বিক্ষিপ্ত অনুসন্ধান'। *ধমনি* (বেশ্যা সংখ্যা), নীলিমা, কিশোরগঞ্জ।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) [১৪১৪]। *চর্যাগীতিকা*। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
মৌ ভট্টাচার্য (সম্পা, ২০১৯)। *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ*। আনন্দ, কলকাতা।
শান্তা সরকার (১৪০৯)। *সমরেশ বসুর ছোটগল্পে সাধারণ মানুষ*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
সমরেশ বসু (২০১৪)। *গল্পসমগ্র – প্রথম খণ্ড* (ড. নিতাই বসু সম্পা.)। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।
(২০১৫)। *গল্পসমগ্র – দ্বিতীয় খণ্ড* (ড. নিতাই বসু সম্পা.)। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।

বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাচিন্তা : ব্রিটিশ পর্ব

মোহাঃ তানভীর হায়দার*

[সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হলে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজেই ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে উভয় সমাজ দুর্দশায় পতিত হলেও হিন্দুরা নানাভাবে নিজেদের পুনর্গঠনের সুযোগ পায় কিন্তু মুসলমানদের তেমন সুযোগ না থাকায় তারা অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে যায়। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও এ অবনমন ছিল শোচনীয়। বিশেষ করে রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালু হলে মুসলমানদের জন্য তার ফল হয় মারাত্মক। অপরদিকে বিধর্মীর ভাষা শিখতে মুসলমানরা কোনোভাবেই সম্মত ছিল না। যে কারণে তাদের পতন হয় ত্বরান্বিত। কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া যে মুসলমানের উন্নতির উপায় নেই এই উপলব্ধি সমাজ-নেতারা বহু বিলম্বে উপলব্ধি করেন। তারপরও তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করলেও আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। আলোচ্যমান প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের এ বিষয়ক চিন্তা-চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে।]

বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাভাবনা সব সময় সরল পথে অগ্রসর হয়নি, অধিকাংশ সময়ই তা জটিল রূপ ধারণ করেছে। যদিও শিক্ষাই উন্নতির সোপান তথাপি বাঙালি মুসলমান এই উন্নতির জন্য আধুনিক বা যুগোপযোগী শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাহীন অসচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। উনিশ শতকে জাতির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল ইংরেজি ভাষাশিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চা, কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাঙালি মুসলমান সমাজে এ শিক্ষাগ্রহণের প্রশ্নে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দেয় (ওয়াকিল, ১৯৯৭ : ৪৭২)। এই দ্বিধা-সংশয় অতিক্রম করে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা তৈরি হতে মুসলমান সমাজের বহু সময় অপচয়িত হয়। এর ফলে সমাজের উন্নয়ন-অগ্রগতি শুধু ব্যাহত হয় তা-ই নয়, বরং সমাজ-গতি বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে। তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করার ফলও হয়েছে বিষময়।

মুসলমান আমলে রাজভাষা হিসেবে ফারসি চালু ছিল। সুতরাং রাজপদ লাভের আশায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ঐ ভাষা শিক্ষা করত। আর সে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আরবি-ফারসির কদর ছিল। পরবর্তীকালে উর্দুর আমদানি হলে এটিও আরবি-ফারসির পাশে স্থান করে নেয়। হিন্দু সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের প্রচলন ছিল। এর পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলার চর্চা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ (ওয়াকিল, ১৯৯৭ : ৪৭২)। ইংরেজদের আগমনের ফলে ইংরেজি ভাষাও জায়গা করে নিল। এ পর্যন্ত ভাষা নিয়ে মুসলমানদের তেমন কোনও সংকটে পড়তে হয়নি। কেননা ফারসি শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় বিভিন্ন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বিপত্তি দেখা গেল ১৮৩৭ সালে রাজভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রবর্তন হলে। কারণ, রাজভাষা পরিবর্তনের ফলে ফারসির জ্ঞান মুসলমানদের কোনও কাজে আসল না। ইংরেজি ভাষা না জানার কারণে রাজপদ হারিয়ে তারা দৈন্যদশায় পতিত হলো।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।

এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করা গেল মুসলমানরা এই পরিবর্তনের জন্য কোনও রূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বরং গোঁড়ামির পরিচয় দিয়ে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখল। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষা করে শনৈঃশনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হলো।

বস্তুত মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপর্যয় শুরু হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষ অধিকারের ফলে। উইলিয়াম হান্টার-এর *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স* গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> আমরা যেমন একদিকে তাদের (মুসলমানদের) পক্ষে অনুপযুক্ত একটা জনশিক্ষাপ্রণালী আমদানি করেছি, তেমনি অন্যদিকে তাদেরই মূলধন আত্মসাৎ করেছি, যা দিয়ে তাদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রণালী চালিত হতো। বাঙলা দেশের প্রত্যেক খান্দানী মুসলমান পরিবার একটি নিজস্ব শিক্ষায়তন পোষণ করতেন। সেখানে তাঁদের নিজেদের এবং প্রতিবেশী দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করতো। বাংলার মুসলমান পরিবারসমূহ যেমন ক্ষয় পেতে লাগলো, এ-সব শিক্ষায়াতনও তেমনই সংখ্যায় কমে যেতে লাগলো এবং তাদের যোগ্যতার মানও পড়ে যেতে লাগলো। (হান্টার, ২০১৬ : ১২১)

হান্টারের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ইংরেজ-শাসনের ফলে অনেক অভিজাত মুসলিম পরিবার দেশত্যাগ করেছিল বা করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে সেখানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় ধ্বস নেমেছিল; কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা অবদান রাখত। আবার মুসলমানের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো নিষ্কর ভূমির আয় হতে। ইংরেজরা লাখেরাজ সম্পত্তি আইন করলে তা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে ইংরেজদের দ্বারা মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।

তাছাড়া শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজরা এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব অনুভব করেনি; বরং কোম্পানির লাভের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এই লাভের মধ্যে তারা দেশবাসীকে শিক্ষিত করে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়ার কোনও অর্থই দেখেনি। অবশ্য তাদের এই উদাসীনতার মধ্যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। তারা দেখেছে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তাদের আমেরিকা হারাতে হয়েছিল, ভারতের ক্ষেত্রে একই ভুল আর করতে চায়নি (আজিজুর, ১৯৮২ : ১৮৬)। তাছাড়া ইংরেজদের গৃহীত ভারতে শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় লাভবান হয়েছে মূলত হিন্দুরা। আজিজুর রহমান মল্লিক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> কোম্পানীর প্রাথমিক প্রচেষ্টায় কোলকাতায় যাদেরকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলো, সেখানে হিন্দুর সংখ্যাই ছিলো। বাংলার পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলের জেলাসমূহে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের কোন সাহায্য ও মনোযোগ পায়নি। দারিদ্র্য মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণে আরো একটি প্রবল অন্তরায় ছিলো। এসব কারণসমূহ ছাড়াও বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নীতি ছিলো বিপথগামী এবং অনেকক্ষেত্রে সৎ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরাই বেশী উপকৃত হয়েছে। (আজিজুর, ১৯৮২ : ২১৩)

শিক্ষাক্ষেত্রে দৈন্যদশার ফলে বাঙালি মুসলমানের কত দূর শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় আনোয়ার হোসেনের 'বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা' (মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন :

> শিক্ষা বিষয়ে আমরা বাঙালি মোছলমান কতদূর অনুন্নত, তাহা কল্পনা করিলেও নৈরাশ্যের অন্ধকার আমাদের মনকে ছাইয়া ফেলে। মোছলমান আজ ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্প প্রভৃতি অর্থকরী ব্যাপারেও সবচেয়ে পিছনে পড়িয়া আছে। উকিল, ডাক্তার, কেরানী ও নকলনবিশের কাজ হিন্দুরই একচেটিয়া। অফিস আদালতে, মহাজনের গদিতে, সওদাগর অফিসে, রেল-

> স্টীমার স্টেশনে আমরা আজ দুই একজন মোছলমান কর্মচারী দেখিতে পাই মাত্র। যেখানে কুলি-মজুর, সেইখানেই মোছলমান দলে দলে দেখা যায়। (দিলওয়ার, ১৯৯৪ : ২)

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় কতখানি পিছিয়ে পড়েছিল তার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন স্বপন বসু। ১৯৪৯ সালে বাংলার কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে উঠবে :

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র
সংস্কৃত কলেজ	১৮৯	--
হিন্দু কলেজ	৫১৬	--
কলকাতা মাদ্রাসা	--	১৫২
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির স্কুল	৪৬৯	--
মেডিক্যাল কলেজ	৫৬	৩
হুগলি কলেজ	৫৯৮	২০৮
হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল	২৫২	৪৮
মেদিনীপুর স্কুল	৩৬	৪
ঢাকা কলেজ	৩০১	২৪
কুমিল্লা স্কুল	১১	১৮
চট্টগ্রাম স্কুল	৭২	১৪
সিলেট স্কুল	৪৫	৩
যশোর স্কুল	৯৬	৪

(স্বপন, ২০০০ : ২০৪)

বাঙালি মুসলমান সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও চরম অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে বিচরণ করছিল। শুধু তাই নয় যে শিক্ষাটুকু তারা প্রয়োজনীয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল তার অনেকখানিই ছিল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অবাস্তব ও পরস্পরবিরোধী। শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা, যুগচাহিদার অনুপোযোগী ঐতিহ্যপ্রীতি তাদের শিক্ষাজীবনকে এক প্রকার আড়ষ্ট অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে ছিল। (হাবিব রহমান, ২০০৩ : ১৭৫-১৭৬)

বাঙালি মুসলমান পুরনো প্রণালিতেই তাদের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এমনকি বিংশ-শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসেও তারা শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়নি। পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষাকে আঁকড়ে থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা আধুনিক জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অথচ হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করার ফলে তাদের মধ্যে রামমোহনের মতো পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানশিক্ষার কেন্দ্র হিন্দু কলেজের (১৮১৭) মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু এর এক শতাব্দী পরে এসেও বাঙালি মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো প্রতিভার আবির্ভাব হয়নি বা হিন্দু কলেজের মতো আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি (সিরাজুল, ২০১৫ : ১৭৬) শুধু আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ না করার কারণে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় উনিশ শতকের সপ্তম দশকে। কিন্তু এ শিক্ষা কেবল তাদের কাছে অর্থোপার্জন ও চাকরি পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য হয়েছিল। শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যের দিকটি মুসলমানদের কাছে এক রকম উপেক্ষিত ছিল। আর সে কারণেই উনিশ শতকে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু–সমাজে প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলেও মুসলমান-সমাজে তার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে হিন্দুদের

তুলনায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তবুও একথা সত্য যে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না করে একান্তই চাকরির উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। (সিরাজুল, ২০১৫ : ১৭৩)

যতদিনে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের আগ্রহ সৃষ্টি হয় ততদিনে তাদের অবনতি হয়েছে সর্বগ্রাসী। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মুসলিম সাহিত্য সমাজের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে মুসলমানদের এই করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন :

> যতদিন পর্য্যন্ত রাজকীয় অফিসসমূহে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তিত না হইয়াছিল অর্থাৎ যতদিন পার্শী ভাষায় সকল কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত ততদিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। হঠাৎ যখন দেখা গেল অফিস আদালতসমূহ হইতে পার্শী হরফ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং ইংরাজী হরফ তাদের স্থান দখল করিয়াছে তখনই বোধ হয় রিক্ত জলাশয়ের মৎস্যের মত মুসলমান মুন্সীর দল মুষড়িয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখন হইতে অনুভূত হইতে থাকিলেও উক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হয়ত আজিও সমগ্র মুসলিম-সমাজ উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ১২২)

আসলে বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষাপ্রণালিটি ছিল একান্তভাবেই ধর্মনির্ভর। তাদের মধ্যে "বৈষয়িক উন্নতি কিংবা জ্ঞানচর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষার মনোভাব প্রায় অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ বা বর্জনের কোন প্রশ্নই ওঠে না" (ওয়াকিল, ১৯৯৭ : ৪৭৩)। তারা যে আরবি-ফারসির চর্চা করত সেটা মূলত ইসলামের ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ আরবি-ফারসিতে রচিত বলেই। তবু এই ফারসির জ্ঞান তাদের জীবিকা অর্জনে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু অফিস-আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালু হলেও মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ দেখায়নি। এর মূল কারণ তাদের অতিমাত্রার ধর্মকাতরতা। ঐ সময় যারা মুসলমান সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সকলেই ছিলেন মাদ্রাসা পড়ুয়া ফলে তাদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি।

বস্তুত বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রথাগত শিক্ষায় যে মুসলমানের প্রয়োজন মিটছে না বরং তা উন্নতি-অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে, এ সত্য মুসলমানদের উপলব্ধিতে ধরা পড়তে বিলম্ব হয়েছে। আবার মুসলমান সমাজে প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা তা চিত্তবিকাশের অন্তরায় এবং জ্ঞানচর্চার পক্ষেও অনুকূল নয়। হিন্দু-মুসলমানের তুলনা করে মুসলমানের অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে আবুল হুসেন বলেছেন :

> [...] নবসৃষ্টি সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আজ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে নানা জ্ঞানে বিভূষিত হয়ে তার অতীতের প্রতি বর্তমান জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। আজ আমরা তাদেরও সমকক্ষ হতে পারছি না কেন? তার কারণ আমাদের সুশিক্ষার অভাব। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি চিত্ত-বিকাশ ও মস্তিষ্ক-সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই শিক্ষা-পদ্ধতি কেমন করে যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারে এই হচ্ছে সমস্যার সমস্যা। (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৪)

মুসলমান সমাজে জ্ঞানের প্রতি প্রকৃত ক্ষুধাবোধের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যে কারণে দেখা যায়, একশত বৎসর পূর্বেই হিন্দুরা সংস্কৃতচর্চাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা একশত বৎসর পরে এসেও সে মানসিকতার পরিচয় তো দেয়ইনি বরং ইংরেজি জ্ঞান যখন আবশ্যক হয়ে উঠল তখনও তারা পুরাতন আরবি শিক্ষার সঙ্গে একটুখানি ইংরেজি জুড়ে দিয়ে পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করল নব-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৮)। আবুল হুসেন মর্মাহত হয়েছেন এই ভেবে যে, "প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয়

নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরেজি জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।" (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৮)

ইংরেজ শাসনামলে ভারতে মুসলমানদের জন্য দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মক্তব-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক পুরনো ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ছিল যুগোপযোগী স্কুল-কলেজকেন্দ্রিক সাধারণ শিক্ষা। শেষোক্তটি ছিল সকল সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। বস্তুত শিক্ষা বলতে বাঙালি মুসলমান সব সময় মাদ্রাসা শিক্ষাকেই বুঝে এসেছে। আর এর পিছনের কারণ তাদের অতিমাত্রার ধর্মপ্রীতি। এই অন্ধ মাদ্রাসাপরায়ণ মনোবৃত্তির কারণে তারা এর ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। বাঙালি মুসলমান মোল্লাদের ফতোয়া তাড়িত হয়ে তারা মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে বের হতে পারেনি। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। এ প্রসঙ্গে খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেছেন :

> স্মরণ আছে একবার কোন Distric board-র meeting-এ প্রস্তাব হয়েছিল যে New Scheme মাদ্রাসার Experiment-এর জন্য সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে Old Scheme মাদ্রাসায় সাহায্য দেওয়া হোক, কারণ New Scheme মাদ্রাসায় পড়া যুবকরা জানাজার নামাজ পড়াতে পারে না! এতে মনে হয় যেন সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায় হয়ে আছে, কেবল আমাদের মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা দয়া করে জানাজা পড়ে কবরস্থ করলেই হয়। আজকাল মাদ্রাসার সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। এক গ্রামে একটা মাদ্রাসা হ'লে অন্য গ্রামের লোকেরা অন্য একটি না খুলতে পারলে তাদের মানের লাঘব হল বলে মনে করে। আমি দেখেছি গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর Distric board-এর Free primary school ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ৯০)

মুসলমানরা শিক্ষা বলতে আসলে কি বুঝে থাকে তার স্বরূপ সম্পর্কে কাজী আনোয়ারুল কাদীর বলেছেন, এখনও একদল অভিভাবক স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিপক্ষে এবং তারা যে আসলে কোন শিক্ষার পক্ষে তা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ প্রথমে তারা ইংরেজি শিক্ষাকে বর্জন করার ফতোয়া দিয়েছিলেন তা 'কাফেরি এলেম' বলে। বস্তুত তারা ধর্মশিক্ষা চান, আর এ ধর্মশিক্ষার জন্য কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল মাদ্রাসা পাস করে পেটের অন্নের সংস্থান হয় না, অগত্যা যে নতুন ধরনের মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে সেখানে পড়ানোর ব্যাপারে তাদের সম্মতি পাওয়া গেল। এখানে যে অল্পবিস্তর ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে বিশেষ বাধা নেই কিন্তু বেশি ইংরেজি শিখলে যে গুনাহ হবে, এ মনোভাব তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। প্রাবন্ধিক সংশয় প্রকাশ করেছেন এই শিক্ষা তাদের জীবনসংগ্রামে কতটুকু সহায়তা করবে এটা ভেবে (আনোয়ারুল, ২০১০ : ৩৯)। তিনি বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাবিষয়ক মনোভাবের পরিচয় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে এসেছেন, "তবে মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে যে আমরা বুদ্ধির মুক্তি চায় না। আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, দর্শন, বিজ্ঞান আর যা-কিছু সব বাদ দিয়ে শিক্ষাটুকু হলেই বস্ বলতে চাই।" (আনোয়ারুল, ২০১০ : ৩৯)

ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মাদ্রাসা পড়ুয়া তৎকালীন সমাজ-নেতারা যুগ যুগ ধরে এ কথাই বলে এসেছে যে ইংরেজদের প্রবর্তিত সাধারণ শিক্ষায় মুসলমানের বিপদ, অতএব ওদিকে যাওয়া যাবে না। তারা বারবার মুসলমানের দৃষ্টি আধুনিক শিক্ষা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ফেরাতে চেষ্টা করেছে। ফলে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেছেন—

> আজও, যখন সাধারণ শিক্ষার রথ চলছে রাজপথ বেয়ে সসমারোহে, মুসলিম পথিকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ কচ্ছে তার অনিবার্য্য গতিচ্ছন্দে, পিছন থেকে এঁরা হেঁকে বলছেন :

> হুশিয়ার ভাই মুসলিম, ও রথ নিয়ে যাবে তোমাদের জাহান্নামে; তোমরা উঠে এসো স্বর্গের সিঁড়িতে, এই সে সিঁড়ি মাদ্রাসার মুক্ত দ্বারে। (আবদুল মান্নান, ১৯৯২ : ২৮)

একসময় এরাই তাদের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোতে সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেছে। সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে অহরহ প্রতিবাদ আর ব্যঙ্গবিদ্রুপের দ্বারা মুসলমানদের এ শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব গঠন করেছে আবার আজ তারাই সাধারণ শিক্ষায় ইসলামী ভাবধারার অভাব দেখে চোখের পানি ফেলছে। (আবদুল মান্নান, ১৯৯২ : ২৮)

বাঙালি মুসলমান ছাত্ররা প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে মক্তব বা মাদ্রাসায় যা পড়ে থাকে তাতে স্পষ্টতই ধারণা করা যায় যে এ শিক্ষা আধুনিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, বাস্তবতাবর্জিত ও কিছুটা কুসংস্কারাচ্ছন্নতাজাত। মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর 'শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

> প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান ছেলেরা পাঠশালা মক্তব যেখানেই পড়ুক সাধারণতঃ দুই এক বৎসর তাহারা কোরান শরীফ পড়িয়াই কাটাইয়া দেয়। তারপর বাংলা এবং উর্দ্দু এক সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করে। কেহ কেহবা সঙ্গে একটু পার্শী বয়েত পড়ে। বাংলা পড়াটা তাদের পক্ষে বাহুল্য এবং বিলাসিতা মাত্র। বলাবাহুল্য আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, কেতাব কোরান ছেলেমেয়েরা আদৌ না বুঝিয়াই পাঠ করে। সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, আরবী-কোরান শরীফ, এমনকি আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু যে কোন কেতাব না বুঝিয়া পড়িলেও পুণ্য হয়। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলাটা বেশ সুশিক্ষার, পরিমার্জ্জিত রুচির এমনকি আভিজাত্যের পরিচায়ক মনে করেন। (মুস্তাফা নূরউল, ২০০৩ : ৯২)

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি বাঙালি মুসলমানের নিদারুণ অবহেলা। উর্দুর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাত এবং মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার দরুণ বাঙালি মুসলমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রেও চরম দুর্দশায় পতিত হয়।

সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য যে প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা, হিন্দু সম্প্রদায় এই বিষয়টি অনুধাবন করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উন্নতির পথে ধাবিত হলো, আর দুর্ভাগা মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফেরাল, ফলে তাদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটলো না বরং ধীরে ধীরে তারা অবনতির পথে এগিয়ে চলল। যদিও ইংরেজি শিক্ষিত কিছু মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আরবি শিক্ষিত মৌলবিদের দ্বারা তা ব্যহত হলো। এর ফল হলো :

> [...] মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ মৌলভি সাহেবগণ তাঁদের পেশা বহাল রাখার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক ঐ বিশ্বাস (credulity) অটল করে রাখতে সহায় হলেন। পক্ষান্তরে ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান আরবি শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। এইরূপে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। উভয় দলের সঙ্গে কোন রফা বা বনিবনাও হলো না; বরং একে অপরের নিন্দা অপবাদ দিয়ে সমাজের জনসাধারণকে বিব্রত করতে লাগলেন। জনসাধারণ মৌলভি সাহেবদেরই প্রভাবে যুগসঞ্চিত কুসংস্কারপীড়িত হয়ে ইংরেজি শিক্ষিতগণকে ঘৃণা করতে লাগল। তারা তাদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' পড়ে থাকল। (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৯-৬০)

ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় লর্ড মেকলে ও তাঁর সহযোগীদের প্রেরণায় ১৮৩৫ সালে। মূলত এরপর থেকেই হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। সময়ের গতিকে হিন্দুরা সহজেই উপলব্ধি করে প্রতীচ্য শিক্ষাকে বিপুল আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। অন্যদিকে রাজ্য হারিয়ে নিজের কালচারকে আঁকড়ে ধরার মানসে মুসলমানরা নূতন

উৎসাহের সঙ্গে আরবি ও ফারসির চর্চায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখে। যে কারণে সমগ্র বাংলা জুড়ে মুসলমানরা শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করেছিল। ফলস্বরূপ তারা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগ দেয়নি। সেই থেকে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বলতে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষাই চলে এসেছে। সেই মাদ্রাসা শিক্ষার জের এখনও মেটেনি। মাদ্রাসা এখনও মুসলমান শিক্ষার এক বড় সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। স্যাডলার কমিশনের মতে, যদি ১৮৫৪ সালের Education dispatch-এর ফলে মাদ্রাসা-শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হতো, তবে মুসলমান শিক্ষার ধারা একেবারে বদলে যেত। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ৯৮)

একদিকে নূতনের আহ্বান অন্যদিকে পুরাতনকেও আঁকড়ে ধরার ঐকান্তিক বাসনা—এ দুয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯১২ সালে প্রবর্তিত হলো 'নিউস্কিম'। যেখানে পুরনো মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সবই থাকলো, পাশাপাশি যুগোপযোগী দুএকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলো। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলও খুব সুখের হলো না। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখেছেন :

> [...] বিশ বছর কিম্বা তারও উর্দ্ধকাল এই ঢাকাই দাওয়া খাইয়ে সমাজকে পরিচর্য্যা কর্ব্বার পর দেখা গেলো ঃ মিশ্রিত পদার্থটী বিশেষ ফলোপদায়ক কিছু হয়নি, বরং ওতে মুসলমানের পঙ্গুতা বেড়েই চলেছে। তাই দেখতে পাই সরকারী দফ্তরখানায়ই ওকে নিয়ে আজও অনেক মাজা-ঘষা অনেক যোগ-বিয়োগ চল্‌ছে। (আবদুল মান্নান, ১৯৯২ : ৩২৫)

শিক্ষার্থীর উপর নিউস্কিমের বিষময় প্রভাব উপলব্ধি করে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। কারণ, এই ব্যবস্থা অনুসারে কোমলমতি বালকদের অন্তত চারটি ভাষা শিক্ষা করতে হয়, যা তার মন ও মস্তিষ্কের উপর ভীষণ অত্যাচার বলে মনে হয়। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাংলা ও ইংরেজি, ধর্মশিক্ষার জন্য উর্দু ও আরবি—এই চারটি ভাষা একত্রে শিক্ষা দিতে গিয়ে তার উপর যে অত্যাচার করা হয় তার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম মহৎ ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। (আবদুল মান্নান, ২০১৩ : ১৩৩)

নিউস্কিম শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহতা আরও অনেক লেখকই উপলব্ধি করেছেন। আবুল হুসেন এর বিষময় দিক তুলে ধরে লিখেছেন—

> [...] উর্দু, বাংলা, আরবির চাপে শৈশবেই শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। গণতি করে দেখা যাক, আমি খুব জোর করেই বিশ্বাস করি, শতকরা অন্তত ষাট জন জুনিয়ারের ছাত্র শেষ শ্রেণীতে উঠবার আগেই শিক্ষার খাতা হতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর যারা উত্তীর্ণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়টি সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়বার জন্য তাদের অনেকেই সংস্থান করতে পারছে না। এই যে বিপুল অপচয় এর জন্য দায়ী কে? (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৬৫)

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্ন সম্ভবত বাঙালি মুসলমানের মনে উত্থাপিত হয়নি, হলে তার শিক্ষা শুধু চাকরি লাভের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হতো না। শুধু চাকরির জন্যই শিক্ষা নয় বরং শিক্ষার অন্য সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতার কথা বলেছেন আবুল হুসেন। তিনি বলেছেন—"আমার মনে হয়, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে–মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবন-যাপনে শক্তিমান ও নানা দৃষ্টিক্ষম ক'রে তোলা" (কাদির, ১৯৭৬ : ১৫১, ১৫২)। পাশাপাশি সেই শিক্ষাকে তিনি নিরর্থক বলেছেন, যে-শিক্ষা মানুষকে এ-সমস্ত দিতে পারছে না। আসলে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষমতা দান করতে পারে যে-শিক্ষা তাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়। (কাদির, ১৯৭৬ : ১৫২)

এ-জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন অনেকেই। মোজাফ্ফর আহমদ এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে চুরে নতুন করে গড়ে তোলার অভিমত দেন। সেই সঙ্গে

মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি কেমন হবে তারও রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তিনি। তাঁর মতে, মাদ্রাসায় মাতৃভাষা অবশ্য পাঠ্যরূপে পঠিত হওয়া উচিত। আর মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যম উর্দু বা পারসি না হয়ে বাংলাই হওয়া উচিত। তবে আরবি শিক্ষার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে গ্রহণের পক্ষে মত দেন। এছাড়া উর্দু, হিন্দি, গুজরাটি, তেলেগু, পশতু ও পারসি প্রভৃতির শিক্ষাদান মাদ্রাসায় করা উচিত। ছাত্ররা ইচ্ছা করলে অন্য একটা ইচ্ছাধীন বিষয় ছেড়ে এর মধ্য থেকে যে কোনও একটিকে পড়তে পারবে। তাছাড়া কোরআন-হাদিস খুব ভালোভাবে মূল হতে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ফেকহার কেবল মূলসূত্রগুলো পড়ালেই চলবে, কারণ আরবি ভাষায় অধিকার জন্মালে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ফেকহার কিতাব পড়ে বুঝে নিতে পারবে। এছাড়াও শ্রেণি বিভাগ অনুযায়ী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, লজিক, আধুনিক বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই পন্থা অবলম্বন করলে মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থায় এক অদ্ভুৎ পরিবর্তন আসবে এবং ছাত্ররা চৌকশ হয়ে বর্তমান জগতের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে বলে লেখক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (রবিউল, ২০১৯ : ২২৮, ২২৯)

এস ওয়াজেদ আলী পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন, এই পর্যায়ের হিন্দু ছাত্রদের সাধারণ পাঠ্যবিষয় ছাড়া শুধু মাতৃভাষা ও ইংরেজি পড়তে হয়। মুসলমান ছাত্রদের এতগুলো বিষয় শিক্ষা করতে গিয়ে সমুদ্রে কূল হারানোর মতো অবস্থা হয়। ফলে কোনও বিষয়ই উত্তমরূপে শিখতে পারে না। জ্ঞান অর্জন তাদের কাছে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তাদের শরীর ভেঙে পড়ে, তাই এরপর যখন তারা হাইস্কুলে যায় তখন হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে টিকতে পারে না। (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৬ : ৪০০)

ইংরেজ সরকারও চায় না মুসলমানরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক। সে জন্য দেখা যায় সরকার একটা জুনিয়র মাদ্রাসায় যে টাকা সাহায্য করেন তার সিকি অংশও একটি এম. ই স্কুলের জন্য করেন না। কারণ, সরকার চায় মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে "মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে পাকা করে তাকে অধিকতর নিরূপায়, দুর্বল, কাপুরুষ ও ভণ্ড করে তুলতে। মুসলমান তো মধ্যযুগের ইসলামী কৃতিত্বের মোহ-মুগ্ধ আছেই, তার সেই জোশের সুযোগ নিয়ে তিনিও তার মতলব হাসিল করছেন।" (হাবিব রহমান, ২০০৭ : ৩২)

মাদ্রাসাশিক্ষা-ব্যবস্থা যে মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর এ উপলব্ধি মুসলমানের হয়েছে অনেক দেরিতে। এর ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করে অনেক চিন্তাবিদই এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন। মমতাজউদ্দীন আহমদও এ শিক্ষার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এ শিক্ষাকে পরিহার করার দিকে মতামত প্রদান করেছেন। কারণ, "[...] মাদ্রাসা-শিক্ষা শিক্ষার Cultural এবং Practical দুইদিকেই অসম্পূর্ণ, ক্ষতিজনক, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য" (মুস্তাফা নূরউল, ২০০৩ : ৯৪)। তাঁর মতে, ওল্ড স্কিমের জায়গায় যে নতুন শিক্ষা-প্রণালি অর্থাৎ নিউস্কিম প্রবর্তিত হয়েছে তাতে পুরাতনের দোষগুণ পূর্ণমাত্রায় আছে। বরং ক্ষতির দিকটাই বেশি কারণ এখানে বাংলা ও ইংরেজি যুক্ত হওয়াতে শিক্ষার্থীদের আগের মতো শাস্ত্রজ্ঞানটাও হচ্ছে না। (মুস্তাফা নূরউল, ২০০৩ : ৯৪)

এখানে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটিও উত্থাপিত হতে পারে। বাস্তবতা হলো, যে সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরুষেরাই পুরোপুরি সচেতন নয় সেখানে নারীশিক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে মুসলমান সমাজের বড় ঘরের মেয়েরা আরবি, উর্দু, ফারসি পড়তে পারত আর নিম্নশ্রেণির মেয়েরা ধর্মীয় কারণে সামান্য আরবি পড়ার সুযোগ পেত। একে কোনোভাবেই যথার্থ শিক্ষা বলা চলে না (হাবিব রহমান, ২০১০ : ১৫)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলমানের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্যের বিষয়টি।

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার সংকটটি ছিল মর্মান্তিক। আসলে সমাজে পুরুষেরা যথেষ্ট শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত না হওয়ায় স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সুব্যবস্থা হয়নি। কাসেমা খাতুন বলেছেন— "আমাদের বাপ, ভাই, মামু, খালু, চাচা প্রভৃতি অর্থাৎ যাদের নিয়া পুরুষ সমাজ গঠিত, সেই পুরুষ সমাজের শিক্ষাহীনতাই যে নারী-জাতির অশিক্ষা দোষের জন্য অনেকাংশে দায়ী তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই" (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৩ : ৪৮)। তিনি ধারণা করেছেন যে, পুরুষেরা যথেষ্ট শিক্ষার আলোক পেলে ঘরের মা, বোন, খালা, জায়া প্রভৃতিকে শুধু ভাতরাঁধুনী অথবা দুনিয়ার যত সব কু-শিক্ষা ও কু-সংস্কারে জড়িয়ে চাকরাণীর মত চিরদিন রেখে দিতে পারতেন না। (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৩ : ৪৮)

নারীজাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একাধিক রচনায় আলোচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন, নারীশিক্ষার গোড়ার বিষয় আলোচনা করতে গেলে সামাজিক অবস্থার কথা উঠে আসে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা পুরুষের প্রতিকূলে চলে যায়। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, "স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে, বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।" (রোকেয়া, ২০১৫ : ২২৬)

রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধে খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সমাজের অর্ধেক অংশকে বিকল রেখে উন্নতি লাভ করা কখনই সম্ভবপর নয়। আর এজন্য বোম্বাই, লাহোর ও আলীগড়ের মুসলমান পুরুষগণ নারীশিক্ষার প্রসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন (রোকেয়া, ২০১৫ : ২০৪)। রোকেয়া তাঁর 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি' প্রবন্ধে আলীগড়ের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্‌র কথা তুলে ধরেছেন। কারণ, আলীগড়ে নারীশিক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা রোকেয়ার উদ্দেশ্য। রোকেয়া বলেন :

> আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্ সাহেব এক সময় তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে! বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দুরপনেয় কলঙ্ক।" (রোকেয়া, ২০১৫ : ২২৬, ২২৭)

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান সমাজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল। কিন্তু তিনি আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। চারিদিকে যেভাবে নারীশিক্ষার প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে তাতে মুসলমান সমাজেও নারীর জাগরণ সময়ের ব্যাপার। প্রথম প্রথম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কিন্তু তাতে নিরাশ না হয়ে রোকেয়া নারীদের জাগরণপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, সব সমাজেই প্রথমে বিরূপতা দেখা দিয়েছে কিন্তু পরে তারা প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাই রোকেয়ার বক্তব্য :

> আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি; বাঙ্গালী মুসলমানগণ অত্যন্ত নারীবিদ্বেষী, ইঁহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি। তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংলন্ডের পুরুষ সমাজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীদের "ব্লুস্টকিং" বলিয়া বিদ্রুপ করেন; শিক্ষিত বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। [...] যাহা হউক, এত হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরেজ ললনা মাথা তুলিয়াছেন; এবং বঙ্গীয়া (ব্রাহ্ম) ভগিনীরাও মাথা তুলিতেছেন; এবার মোসলেম ললনার পালা। (রোকেয়া, ২০১৫ : ২০৫)

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজের মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষেরাও উপলব্ধি করেছিলেন। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা' প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন। মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রচলনকে তিনি দুর্লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন, বাঙালি মুসলমান যদি শিক্ষা ও সভ্যতার সকল দিক দিয়ে উন্নতি করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদের নারীশিক্ষার বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় :

> নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে মুসলমানগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হইয়াও বিজাতীয় কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার দরুন বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই করে নাই। ইহা যে খুবই দুর্লক্ষণ এবং ইহাতে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগমন যে অনেকটা ব্যাহত ও অভিশপ্ত হইয়া রহিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্গালী মুসলমান যদি শিক্ষা ও সভ্যতার সব দিক দিয়া উন্নতি করিতে চান—একটা সুসভ্য জাতি রূপে বাঁচিয়া থাকিতে চান, তবে নারী জাতির উন্নতি ও শিক্ষার প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর প্রদান করিতে হইবে। (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৩ : ১৭৩)

নারীশিক্ষার দুরবস্থার জন্য আবুল ফজল এদেশের পিতাদের অজ্ঞতাকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন, জাতির উন্নতি বলতে শুধু পুরুষের উন্নতি সাব্যস্ত করে এ দেশের পিতা শুধু পুত্র সন্তানকেই লেখাপড়া শিখিয়ে আসছে; তার কন্যাও যে জাতির একজন সদস্য বরং জাতির ভবিষ্যৎ জননী এ চিন্তা সে কোনোদিন করেনি। পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানেরও যে সুশিক্ষার প্রয়োজন আছে একথা এদেশবাসী অনেক দিন হতে ভুলে বসে আছে। তারা কন্যাকে অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ রেখে যেন-তেন প্রকারে নয়-দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ভাত কাপড় দিয়ে পাত্রস্থ করতে পারলেই পিতার দায়িত্ব শেষ হয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৬ : ৩১১)। আলোচ্যমান প্রবন্ধে তাই প্রাবন্ধিক নারীজাগরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং নারীকে শিক্ষিত ও কর্মমুখর হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। আর এসবের জন্য নারীকে অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু নারীর জন্য নয় বরং পুরুষের পূর্ণতার জন্যও নারীর শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। আবুল মজফফর আহমদ মনে করেন, নারী শিক্ষিত না হলে পুরুষ পঙ্গু থেকে যায়। মুসলমান সমাজের অবস্থা হয়েছে তাই। যদিও ধর্মগুরু নর-নারীকে সমানভাবে শিক্ষিত করার আদেশ দিয়ে গেছেন কিন্তু সংকীর্ণচিত্ত মৌলবি-মৌলানাদের প্রভাবে সে আদেশ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তার ফলস্বরূপ মুসলমান সমাজে নারীমাত্রই অশিক্ষিত রয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে অবনতির অভিশাপ নেমে এসেছে। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন যুগে যুগে দেশে দেশে যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তাদের জীবনে মায়েদের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। আধুনিক জগতের বীর্যবান উন্নতশির জাতিসমূহ এমনকি তুরস্ক, মিশর, সিরিয়ার মতো মুসলিম দেশগুলো আজ নারীশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করে স্কুল-কলেজের দ্বার নারীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় ভারতের মুসলমানগণ এ বিষয়ে সাংঘাতিকরূপে পশ্চাৎপদ। ভারতবর্ষের হিন্দুরাও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে তার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছেন। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ৭৫)

বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত যে শিক্ষাপদ্ধতি সেটিও মেধাবিকাশের উপযুক্ত নয় বলে অনেক চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেছেন। সে জন্য শিক্ষা-পদ্ধতিরও সংস্কার চেয়েছেন লেখকরা। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য' (সাম্যবাদী, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কার্তিত ১৩৩১) প্রবন্ধে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে মূল্যহীন তাই পরিত্যাজ্য বিবেচনা করেছেন। কারণ, হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন "বর্তমানে আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি, তাহাতে

কতকগুলি অক্ষম কেরানী বা চাকুরিয়া সৃষ্টি হওয়া ছাড়া অন্য কোন লাভ হইতেছে না। এরূপ মূল্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে হইবে" (মুস্তাফা নূরউল, ১৯৭৭ : ৩৮)।

যে কোনও জাতির আত্মচেতনা ও আত্মমর্যাদা লাভের প্রধান উপায় যুগোপযোগী বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় নিহিত। বাঙালি মুসলমানেরও আত্মচেতনালাভের জন্য প্রয়োজন ছিল আধুনিক তথা ইংরেজি শিক্ষার। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে জন্ম লাভ করেছে অনেক দেরিতে। ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে রাজনৈতিক কারণেই মুসলমানদের পিছনে ফেলে বাংলার আরেক সম্প্রদায় হিন্দুদের প্রাধান্য দিয়েছিল। অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে আয়ের উৎস, জমিদারি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে মুসলমানরা ইংরেজ বিমুখ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া প্রবল আত্মাভিমান তো ছিলই; আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় কুসংস্কার, যার দরুন তারা রাজভাষা ইংরেজি গ্রহণ করাকে ধর্মবিরুদ্ধ মনে করেছিল। তাছাড়া মুসলমানদের অদূরদর্শিতা, অভাব-অনটন, সরকারের উৎসাহের অভাব, বিলাসপ্রিয়তা, শ্রমবিমুখতা প্রভৃতি কারণ তাদের ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিল। তবে উনিশ শতকের শেষে এসে মুসলমানের চৈতন্যোদয় হয়; তারা বুঝতে পারে যুগোপযোগী শিক্ষার মধ্যেই তাদের উন্নতি নিহিত। এসময় সমাজ নেতাদের প্রচেষ্টা, ইংরেজ সরকারের কিছুটা আনুকূল্য এবং বিশেষত পাটের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাঙালি মুসলমানের ভিতর ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান প্রথাগত ব্যবস্থার দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিল। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও রাজনৈতিক অবস্থা এক্ষেত্রে হয়েছিল তার সহায়। তাই উদারমনা, প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা এই বদ্ধ জায়গা থেকে তাদের বের করে আনার ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও খুব বেশি ফল লাভ হয়নি। তবে তাঁদের এই আলোচনার ফলে মুসলমান সমাজের বদ্ধ অবস্থা কাটতে শুরু করে এবং তারা আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে।

সহায়কপঞ্জি

আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯৮২)। *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান* (দিলওয়ার হোসেন অনূ.)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পা., ২০০৩)। *আবুল হুসেন রচনাবলী* ১ম খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল কাদির (সম্পা., ১৯৭৬)। *আবুল হুসেনের রচনাবলী* ১ম খণ্ড। বর্ণমিছিল, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা., ১৯৯২)। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী* ২য় খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৩)। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী* ৩য় খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

উইলিয়াম হান্টার (২০১৬)। *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স* (আবদুল মওদুদ অনূ.)। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ (১৯৯৭)। *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাজী আনোয়ারুল কাদীর (২০১০)। *আমাদের দুঃখ*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

খোন্দকার সিরাজুল হক (২০১৫)। *মুসলিম সাহিত-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

দিলওয়ার হোসেন (সম্পা., ১৯৯৪)। *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলমান সমাজ*। আনোয়ার হোসেন, 'বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা., ১৯৭৭)। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৩)। *শিখাসমগ্র*। মমতাজউদ্দীন আহমদ, 'শিক্ষা-সমস্যা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা., ১৩৩৩)। *সওগাত*। কাসেমা খাতুন, 'নারীর কথা', ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়।

(১৩৩৩)। *সওগাত*। মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী, 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা', ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র।

(১৩৩৬)। *সওগাত*। আবুল ফজল, 'বঙ্গ-মুসলিম নারী-জাগরণ', ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ।

(১৩৩৬)। *সওগাত*। এস ওয়াজেদ আলী, 'অভিভাষণ', ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ।

রবিউল হোসেন (সম্পা., ২০১৯)। *সেরা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা সংগ্রহ*। মোজাফফর হোসেন, 'বঙ্গদেশে মাদারসার শিক্ষা', অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

বেগম রোকেয়া *রোকেয়া রচনাবলী* (২০১৫)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

স্বপন বসু (২০০০)। *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

হাবিব রহমান (সম্পা., ২০০২)। *মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন : সভাপতিদের অভিভাষণ*। আবুল মজফফর আহমদ, 'তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাবিব রহমান (২০০৩)। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাবিব রহমান (সম্পা. ২০০৭)। *নির্বাচিত সংকলন মাসিক জাগরণ পত্রিকা*। আবুল হুসেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ', ঐতিহ্য, ঢাকা।

হাবিব রহমান (২০১০)। *বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস : কতিপয় প্রসঙ্গ*। ধ্রুবপদ, ঢাকা।

অপেক্ষমাণ : সৈয়দ শামসুল হকের নিরীক্ষাধর্মী সামাজিক কাব্যনাটক

জান্নাত আরা সোহেলী*

[সারসংক্ষেপ : *অপেক্ষমাণ* সৈয়দ শামসুল হকের একটি নিরীক্ষামূলক কাব্যনাটক। সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি, দুর্নীতি, নারীর প্রতি বৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাকে তিনি এ নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে নিজের রচনার পাশাপাশি সাহায্য নিয়েছেন বিশ্বখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের নাট্যকর্মের। ভিন্ন ভিন্ন তিনটি নাটকের নির্যাসকে নূতনবিন্যাসে সাজিয়ে তিনি নূতন একটি শিল্পসার্থক নাটক রচনায় সক্ষম হয়েছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হকের নিরীক্ষাপ্রবণ নাট্য-মানস অনুসন্ধানই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।]

এক

সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) নিরীক্ষাধর্মী কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণ* (২০০৯)। 'হেনরিক ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০০৯'-এ মঞ্চায়নের জন্য নাট্যপরিচালক আতাউর রহমানের বিশেষ অনুরোধে নাটকটি তিনি রচনা করেন।[১] নাটকটিতে তিনি স্বরচিত কাব্যনাটক *ঈর্ষা (১৯৯০)* এবং নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক যোহান ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) রচিত নাটক *এ ডলস হাউস (১৮৭৯)* ও *এন এনিমি অব দ্য পিপল (১৮৮২)* নাটকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও চরিত্রের অসাধারণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তবে হেনরিক ইবসেনের বিশ্বখ্যাত নাট্যকর্ম থেকে উৎসরস আহরণ করলেও তিনি তার মধ্যে নবপ্রাণরস সঞ্চার করে নাটকটিকে সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা হিসেবে নির্মাণ করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের এ-ধরনের নিরীক্ষাধর্মী রচনার সাফল্য নিয়ে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মর্তব্য :

> কখনো কখনো মনে হয় একই লেখা দুইবার, তিনবার, চারবার লিখছেন একজন লেখক। সৈয়দ হক সম্পর্কে এই অভিযোগ তোলার কোনো অবকাশ নেই। কারণ একটা লেখার পরে তিনি সেই লেখার বিন্যাসের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাননি। তাঁর নতুন লেখা মানেই নতুন বিন্যাস। (জাকির, ২০১৬ : ৯৩)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষার* প্রৌঢ় চরিত্র, *এ ডলস হাউস*-এর নোরা চরিত্র ও *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার চরিত্রকে একই মঞ্চে উপস্থাপন করে উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সমাজ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যসমাজের মিল-অমিল ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনটি পৃথক সমাজের পৃথক চরিত্রকে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন—জীবনে সত্যের সম্মুখে দাঁড়ানোর মতো মহৎ আর কিছুই নেই; নিজেকে আবিষ্কার করতে হলে মানুষকে নিজের মনের আয়নাতেই নিজেকে চিনে নিতে হয়। শত বছর পূর্বে নাট্যকার ইবসেন আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা ও সত্যের বিজয়ের যে কথা তাঁর নাটকে বলে গেছেন, শতবর্ষ পরে সৈয়দ শামসুল হক তেমনি একটি চরিত্র নির্মাণ করেছেন *ঈর্ষা* নাটকে—যেখানে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ এক প্রৌঢ়চরিত্র চরম একাকিত্বের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকের কোরাসচরিত্র ব্রেকডান্সার দল নাচের তালে তালে নাটকের প্রারম্ভে এ কথাই বলে গেছে দর্শকের উদ্দেশ্যে :

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

> হক আর ইবসেন [...]
> বলবেন—বলেছেন
> একা হয়ে যেতে হয় সত্যের সমুখেই
> শক্তিটা আছে শুধু সত্যেই—সত্যেই (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৩)[২]

মূলত, সৈয়দ শামসুল হক বরাবরই পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের বাস্তববাদী ধারার পথিকৃৎ, নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের অনুরাগী ছিলেন; তাঁর রচনায় এই লেখকের প্রভাব নাটকের ভাবাদর্শ ও রচনারীতি উভয়দিক থেকেই প্রতীয়মান হয়। বিশেষত রচনার ভাবাদর্শগত দিক বিচার করলে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে সৈয়দ শামসুল হকই হেনরিক ইবসেনের নাট্যাদর্শের যথার্থ উত্তরসাধক; কলুষমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত একটি সুসভ্য সমাজ-নির্মাণ ও সুশিক্ষিত-জাতিগঠনই ছিল উভয় লেখকের রচনার মৌল উদ্দেশ্য; তাঁরা উভয়েই সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, অপসংস্কৃতি, ধর্মের নামে অনাচার, রাজনীতির নামে স্বৈরাচার, রাষ্ট্রক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী আচরণে ব্যথিত হয়েছেন এবং সমাজলগ্ন নাট্যরচনার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান সমাজে প্রচল বিশ্বাস ছিল—সমাজ সর্বদা একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজে প্রচল নিয়মনীতি যতই ভ্রান্ত হোক, মানুষের জন্য ক্ষতিকর হোক, তবু সেই ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারও নেই। হেনরিক ইবসেন তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকে প্রচলিত এ-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করেছেন। তিনি অদক্ষ সংঘশক্তির অসারতা দেখিয়ে বলেছেন—দশজন মিলে একটি মিথ্যাকে সত্য বললেই সেটি সত্য হয়ে যায় না; বরং সেটি মিথ্যাই থাকে। আর সমাজে যদি এগারোতম ব্যক্তি একাই সে সত্য প্রকাশ করে তবে সেটি সত্যই। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবসময় কল্যাণ বয়ে আনে না। জনগণকে আগে প্রকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে হয়, ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান থাকতে হয়। মানুষ কেবল আকারে মানুষ হলেই হয় না, তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করে নিতে হয়। হেনরিক ইবসেন তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকে সত্যান্বেষী নির্ভীক ডাক্তার চরিত্রটির জবানিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'জনগণ'-এর মতো জাদুশব্দ দিয়ে আর আমার মগজধোলাই করা যাবে না। না, আর না। একদল প্রাণী মনুষ্য-আকৃতির হলেই জনগণ হয়ে যায় না। জনগণের সঙ্গে সম্মান জড়িত এবং সে সম্মান নিজেদেরই অর্জন করতে হয়। [...] আমি বিপ্লবী। সংখ্যাগরিষ্ঠ সবসময়ই সঠিক—যুগপ্রাচীন এই মিথ্যার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করছি। [...] যিশু যখন ক্রুশে চড়েছিলেন তখনও কি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ভুল ছিল? পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এ কথা বিশ্বাস না-করে সংখ্যাগরিষ্ঠ যখন গ্যালিলিও-কে কুকুরের মতো হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে তখনো কি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ভুল? সঠিক কী সেটা বুঝতেই সংখ্যাগরিষ্ঠের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যায়। নির্ভুল কাজটি যতক্ষণ পর্যন্ত না-করে ততক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সঠিক নয়। (খায়রুল, ২০১৮ : ৮৩-৮৫)[৩]

এন এনিমি অব দ্য পিপল নাটকের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে নরওয়ের ছোট্ট একটা শহরে নবনির্মিত পাবলিকবাথ প্রকল্পের পানি দূষণ নিয়ে। শহরের নাগরিকদের পানিসমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকারি প্রকল্প হিসেবে এটি নগর মেয়রের তত্ত্বাবধায়নে নির্মাণ করা হয়েছে; কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাব, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে পানিপ্রকল্পের সঠিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। এসময়ে সত্যান্বেষী ডাক্তার থমাস স্টকম্যান গবেষণা করে দেখেছেন, পানিদূষণের মূলকারণ প্রকল্পের অদূরে অবস্থিত ট্যানারি কারখানা। তাই অতিদ্রুত বাথপ্রকল্পের স্থান সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন; তা না হলে এটি দীর্ঘমেয়াদে শহরের নাগরিকের স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তারের এই আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে প্রথমে সাংবাদিক, সুশীলসমাজ তাকে সাধুবাদ দিলেও, নগরপিতা পিটার স্টকম্যান যখন স্বীয়স্বার্থে ডাক্তারের

বিরোধিতা করেছেন, তখন তারাও ক্ষমতাকাঠামোর দম্ভে ভীত হয়ে দুর্নীতিবাজ মেয়রকে সম্মিলিতভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এদের কেউই সত্যের জন্য নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে কিংবা মেয়রের রোষানলে পড়তে চাননি। মেয়র তাদের বুঝিয়েছেন—এই পানিপ্রকল্প নগরবাসীর জীবনমানে পরিবর্তন এনেছে, শহরে পর্যটক আসছে, জনগণের উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে ডাক্তারের কথায় পানিপ্রকল্প পুনর্নির্মাণ করতে গেলে নগরবাসীকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। ফলত, সুবিধাবাদী জনগণ তাদের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার কথা চিন্তা না করেই, আপাতপ্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে গা ভাসাতে চাইছে।

কিন্তু ডাক্তার নিজের স্বার্থের কথা না ভেবেই একা শেষপর্যন্ত সত্যের পক্ষে লড়ে গেছেন। ফলস্বরূপ, তার পৌরসভার চাকুরি গেছে, মেয়ে স্কুলের চাকুরি হারিয়েছে, ছেলেরা স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, এমনকি জনগণ উন্মত্ত হয়ে তাকে 'জনতার শত্রু' উপাধি দিয়ে ঘর-বাড়ি ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিয়েছে। এরকম বিরূপ পরিস্থিতিতে তিনি প্রথমে ভেবেছেন প্রিয় শহর পরিত্যাগ করে তিনি অন্যত্র চলে যাবেন; কিন্তু পরক্ষণেই সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেছেন এবং সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন—প্রতিকূল পরিবেশে যে মানুষ সত্যকে অবলম্বন করে একা দাঁড়াতে পারে, পৃথিবীতে তার মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই; এবং সত্যকে অবলম্বন করে একা সংখ্যাগরিষ্ঠ মিথ্যার সঙ্গে লড়াই করে যাওয়াই হওয়া উচিত মানবজীবনের ব্রত। ইবসেনের এমন নাটক লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইবসেন-অনুবাদক খায়রুল আলম সবুজ নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> অর্গানাইজড লিবারেলদের প্রতি ইবসেন আগে থেকেই চটে ছিলেন। *গোস্ট* নাটকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সেই আগুনে যেন ঘি ঢাললো। রাষ্ট্র ধারণাকেও তিনি এক সময় ব্যাক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। [...] গণতন্ত্র অপরিহার্যভাবেই বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং দুঃখজনকভাবে প্রায় সবসময়ই দল রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করাই দলগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সেক্ষেত্রে যে যত মানুষ দলে টানতে পারবে লাভের আশা তার তত বেশি। দেশ ও দশের মঙ্গলচিন্তা তখন অন্তরালে চলে যায়। [...] মানুষের মানসম্মত মূল্য সেখানে গৌণ হয়ে যায়—ভোটাভুটির ক্ষেত্রে সংখ্যাই সবশেষ কথা। এমন পরিস্থিতিতে ইবসেন বলেছেন—The state is the curse of individual! ব্যক্তি সেখানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাসের কথাই তিনি তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল*-এ উপস্থাপন করেছেন। অর্গানাইজড লিবারেলদের প্রতি তার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তথাকথিত লিবারেল সংবাদপত্রের প্রতি বিরক্তি। (খায়রুল, ২০১৮ : ১৩)

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর হেনরিক ইবসেন রচিত নাটকের এ বিষয়টি অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে *অপেক্ষমাণ* নাটকের ঘটনাংশ বিন্যস্ত করেছেন।

অন্যদিকে, ইবসেনের *এ ডলস হাউস* বিশ-শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার প্রর্দশিত নাটক। ১৮৭৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কোপেনহেগেন থেকে প্রকাশিত এ-নাটকটি সারাবিশ্বে সাড়া-জাগানিয়া একটি দর্শকনন্দিত নাটক। নাটকটির বিষয়ও চমকপ্রদ। নাটকটির মূলভাব সম্পর্কে সমালোচক একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন :

> নারীর দাসত্বের ওপরে যে সমাজের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, নারীত্ব, সতীত্ব, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি নীতির শ্লোগান আউড়িয়ে, নারীকে শৃঙ্খলিত করেছে যে সমাজ, সেই সমাজ ইবসেনের মতে কোনোদিনই সত্যিকার মনুষ্যত্ব-লাভের সহায়ক নয়। *A Doll's House*- এর বাণী সত্যিই বিস্ফোরক— [...] নারীকে নিয়ে আর পুতুলখেলা চলবে না। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৬)

বস্তুত, হেনরিক ইবসেন তাঁর *এ ডলস হাউস* নাটকে দেখিয়েছেন—পারিবারিক পরিসরে একজন নারী সাধারণ মানুষের মতো পরিচর্যিত ও বিবেচিত হন না; তার জন্য রয়েছে সমাজ নির্ধারিত পৃথক নিয়ম। এমনকি প্রচলিত ধর্মও নারীকে কেবল সমাজের প্রতি, স্বামীর প্রতি, পরিবারের প্রতি, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা বলে; কিন্তু সমাজ বরাবরই তার নিজের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে; তাকে মানুষরূপেই গণ্য করে না। আলোচ্যমান নাটকে সাধারণভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, প্রধান দুই চরিত্র নোরা এবং হেলমার দাম্পত্য জীবনে বেশ সুখী। হেলমারের নূতন ব্যাংকে চাকুরির সুবাদে অতীতের সমস্ত দৈন্য কাটিয়ে সন্তান, সহকারী, স্ত্রী, বন্ধু পরিজন নিয়ে হেলমার উদযাপন করছে সুখী-সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবন। এমনকি স্বামী হিসেবে হেলমারের স্ত্রী নোরার প্রতি ভালবাসারও কোনও কমতি নেই। কিন্তু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, আপাত সুখী এ-সংসারজীবনে কোথাও যেন একটি লুকায়িত দীর্ঘশ্বাস বিদ্যমান; এবং বলাবাহুল্য সেটি নোরার একজন মানুষ হিসেবে সংসারে বঞ্চিত হবার দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু একজন নারী কেবল কন্যা, স্ত্রী, জননী হতে পৃথিবীতে আসেনি। একজন মানুষ হিসেবে পুরুষের মতোই তার ভূমিকা রয়েছে সমাজে। অথচ সমাজ-সংসারে সে ক্রমাগত অবমূল্যায়িতই থাকে। পিতার সংসারে নোরার জীবন ছিল পুতুলের মতো। দাম্পত্যজীবনেও সে পুতুলের মতোই বিনোদনের অংশীদার। এমনকি সন্তান-সন্ততিও তার কাছে পুতুলতুল্য। তাদের ভালো-মন্দ নির্ধারণে কিংবা সংসারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তার ভূমিকা নেই। ফলে তার হৃদয়ে ক্রমাগত অনুরণিত হয়েছে আক্ষেপ ও বিষাদের সুর। যেকারণে সে সংসার ছাড়ার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখিয়েছে—চাইলে একজন নারীও জীবনের ব্যাপারে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নোরার এ আক্ষেপ *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হক নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেছেন :

> বাবা আমাকে আদর করে পুতলি ডাকতেন।
> আমি যেমন পুতুল খেলা করতাম, তিনিও আমাকে নিয়ে পুতুলই
> খেলতেন।
> তারপর যখন তোমার কাছে থাকতে এলাম— [...]
> তুমি তোমার রুচি তোমার ভালো লাগা তোমার ইচ্ছে নিয়ে বাড়িতে,
> আর আমি তোমার রুচি তোমার ভালো লাগা নিয়ে তোমার
> ইচ্ছের পুতুল। [...]
> আজ পেছন ফিরে দেখে সব—মনে হচ্ছে
> দাসীর জীবন ছিলো আমার। দাসীরই জীবন আমি কাটিয়ে গেছি।
> তোমার সুঁতোর টানে নেচে গেছি শুধু। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১১-৫১২)

তবে *এ ডলস হাউস* নাটকের বিবৃত কাহিনি সৈয়দ শামসুল হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করেছেন। শুরু থেকে মূল কাহিনি না দেখিয়ে নোরা যখন সংসারত্যাগী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, *অপেক্ষমাণ* নাটকে তখন থেকেই নাট্যঘটনা নারী ও পুরুষ নামক চরিত্রের সংলাপ-প্রতিসংলাপের মাধ্যমে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার, নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকে নোরা চরিত্রের দৃঢ়তা পুরোপুরি অক্ষুণ্ন রাখলেও হেলমার ও নোরার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ বদলে দিয়েছেন। যেমন : *এ ডলস হাউস* নাটকে নোরা ক্রগসতাদের হুমকিতে ভীত হয়ে তাকে চাকুরিতে বহাল রাখার জন্য স্বামী হেলমারকে সুপারিশ করেছে; হেলমার সে শুপারিশ রাখেনি দেখে নোরা রুষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু *অপেক্ষমাণ*- নাটকে দেখা গেছে স্ত্রী চরিত্রটি বারবার নিষেধ সত্ত্বেও স্বামী কেবল তার ব্যক্তিস্বার্থে একটি নেতিবাচক চরিত্রকে ব্যাংকে চাকুরি দিয়েছে। এখানে স্ত্রীর অনুরোধ, ভালোবাসা, মর্যাদার থেকে বেশি হয়ে গেছে স্বামীর ব্যক্তিস্বার্থ। আর এই ভালোবাসাহীনতার কষ্ট, সংসারে আত্মমর্যাদাহীন অবস্থানের যন্ত্রণা ভুলতেই স্ত্রী সংসার ছাড়তে চেয়েছে; নিজেকে শিক্ষাদীক্ষায় আত্মিক উন্নয়নে এমন

শিখরে নিতে চেয়েছে, যেখানে পুরুষের অমর্যাদাকর প্রত্যক্ষণ কোনও ভূমিকাই রাখতে পারবে না। *এ ডলস হাউসে* এতদ্‌সংক্রান্ত সংলাপ নিম্নরূপ :

> নোরা। আট বছর ধরে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলাম আমি—কারণ, আমি জানতাম যে অলৌকিক ঘটনা রোজ ঘটে না। তারপরে, এই বিপদটা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। [...] ক্রগসতাদের চিঠিটা যতক্ষণ ওই চিঠি-ফেলার বাক্সের মধ্যে পড়েনি ততক্ষণ আমি একমুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারিনি যে তার শর্তের কাছে তুমি মাথা নোয়াবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি তাকে বলবে : 'আমিই অপরাধী।' সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। [...]
>
> হেলমার। নোরা, তোমার জন্যে দিনরাত আমি খুশী হয়ে কাজ করতে পারি—সহ্য করতে পারি দুঃখ আর দারিদ্র্য। কিন্তু যাকে মানুষ ভালবাসে তার জন্যে সে নিজের সম্মানকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না।
>
> নোরা। লাখো লাখো নারী সে কাজ করছে।
>
> হেলমার। মূর্খ শিশুর মতো কথা বলছো তুমি। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৮৭)[৪]

অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে এ অংশকে নিম্নরূপে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন :

> স্ত্রী। [...] আজ সন্ধ্যায় দেখলাম তুমি দেবতার স্থান থেকে নেমে এলে। [...] যখন দেখলাম তুমি
> আমার কথা রাখলে না।
> তুমি একটা ভণ্ড প্রতারককে—যে আমার বিরুদ্ধে এতকিছু করেছে,
> তাকে তুমি ব্যাংকের চাকরির জন্যে সুপারিশ করলে, চাকরিটা পাইয়ে দিলে!
> সে আমার চেয়ে বড় হয়ে গেলো তোমার কাছে, কারণ আমি
> তো ঘরের নারী!
> আর সে, ব্যাংকে কাজ পেলে তোমার ব্যবসাবাণিজ্যে, ব্যাংক
> থেকে ঋণ টিন পেতে,
> সে তোমার সাহায্যে লাগবে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৭)

তবে *অপেক্ষমাণ* নাটকের মূল সমস্যা কেবলই নোরা তথা নারীর অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এ সমস্যাটি সর্বজনীন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমস্যা। নাট্যকার নাটকটির মাধ্যমে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, আধুনিক বিচ্ছিন্ন মানুষের উচিত—নিজের আমিত্ব ও অস্তিত্বকে প্রশ্ন করা এবং মর্যাদারক্ষার লড়াইয়ে যাবতীয় সামাজিক পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে আত্মাকে মুক্ত করা।

অন্যদিকে, সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষা* নাটকটি রচনা করেছেন প্রচলিত নাট্যধারার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। তিনি এ নাটকে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্যবিভাজনে না গিয়ে একই দৃশ্যে পুরো ঘটনাক্রিয়া সাজিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনও পারিবারিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত কাহিনি প্রদর্শন নয় বরং মানব-মানবীর প্রেমজনিত ঈর্ষার রূপ উদ্ঘাটনই ছিল তাঁর মৌল উদ্দেশ্য। আর এ কারণেই তিনি তিনটি চরিত্রের সাতটি মাত্র সংলাপে পুরো নাট্যঘটনা সাজিয়েছেন।

এই তিনটি নাটকের অন্তঃসার সমীকৃত করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটক। বস্তুত *অপেক্ষমাণ* নাটকের তিনটি চরিত্রই তিনটি আদর্শকে ধারণ করে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে। তিনটি চরিত্রই একাকিত্বকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। প্রৌঢ় চরিত্রটি ছাত্রীর মোহ কাটিয়ে, শরীরী প্রেম ভুলে প্রকৃতির মধ্যে শিল্পের শুদ্ধতা সন্ধানে উন্মুখ। নারী চরিত্রটি সংসারে, সমাজে নারীর আত্মমর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্যদিকে পুরুষ চরিত্রটি সমাজ থেকে মিথ্যের মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে নিপাট সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প।

অপেক্ষমাণ নাটকের প্রধান অবলম্বন প্রচলিত সমাজ। এখানে নাট্যকার যে তিনটি নাটকের সমন্বয়সাধন করেছেন, তাতে ইবসেন রচিত নাটক দুটির মূল বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও মানুষের পশ্চাৎপদ মানসিকতার বিরুদ্ধে ব্যক্তির দ্রোহ। অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হকের নাটক *ঈর্ষা* নারী-পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে হলেও তাতে সমাজচিত্রের উপস্থাপনা রয়েছে। নাট্যকার সেখানে সমাজ ও দেশের বিপন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের মূল্যবোধ বদলে যাওয়ার বাস্তবচিত্র অংকন করেছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হক নারী ও পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে ইবসেন বর্ণিত সময় ও সমাজকে নিজ দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে ঢেলে সাজিয়েছেন। ফলে *অপেক্ষমাণ* হয়ে উঠেছে সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক জীবনচিত্র।

প্রচলিত সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে সমাজের কাছে বলি দেয়। সামাজিক মানুষের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায় সমাজের ভাবনা। লোকে কী বলবে, লোকে কী ভাববে এটিই যেন হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়; তার নিজস্ব পছন্দ, নিজস্ব আনন্দ বা সুখ-সুবিধার সেখানে কোনও মূল্য নেই। নাট্যকার সমাজের এই দিকটি *অপেক্ষমাণ* কাব্যনাটকে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্ত্রী যখন নিজের আত্মমর্যাদার প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে গৃহত্যাগী হতে চাইছে, তখন স্ত্রীকে জীবনভর হারাবার চিন্তা থেকে স্বামীর একমাত্র ভাবনা হয়ে উঠেছে তার স্ত্রীর এহেন কর্মকাণ্ডে লোকে কী ভাববে! ফলে সে স্ত্রীকে যুক্তি দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে নয়, সমাজ-নির্ধারিত কর্তব্যগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। যে সমাজে নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানেই তাকে প্রতিমুহূর্তে মূর্খতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় :

স্বামী। সুস্থতা? বাড়ি ছেড়ে যাওয়া? স্বামী ছেড়ে যাওয়া? বাচ্চাদের
ফেলে যাওয়া?
একবারও ভাবছো না—লোকে কী বলবে?
স্ত্রী। লোকের কথা তুলো না। আমার কথা বলো। [...]
স্বামী। মূর্খ মেয়েমানুষ! নিজের পবিত্র কর্তব্যের কথা ভুলে যাচ্ছো?
[...] স্বামী, সন্তান—তোমার কোনো দায়িত্ব
কর্তব্য কিচ্ছুই কি নেই?
স্ত্রী। পবিত্র—আরো অন্য দায়িত্বও তো থাকতে পারে। [...]
আমার নিজের প্রতি কর্তব্য—দায়িত্ব। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৪)

বস্তুত, স্ত্রীচরিত্রটি জেনে গেছে সমাজে মানুষ হয়ে বাঁচতে গেলে নারীকে প্রথম আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে এবং তা পুরুষের সাহায্য ছাড়াই। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে হেয় করা, ছোট করে রাখাই যেখানে কাজ, সেখানে কেউ-ই চাইবে না একজন নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আর এটা বুঝতে পেরে সে সংসার ছেড়েছে এবং স্বামীর দেয়া কোনও কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি; কেননা সে অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে। যে কারণে স্বামীকর্তৃক প্রতিমাসে অর্থপ্রেরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে বলেছে :

এখন আমাকেই যোগ্য করে তুলতে হবে আমাকে।
আমাকেই নিতে হবে পাঠ।
সে পাঠ দেবার যোগ্যতা তোমার নেই।
আজ আমিই আমাকে পাঠ দেবো। [...]
আমাকে এখন থেকে একাই পথ চলতে হবে— (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৩)

প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ একজন নারীর প্রতি বরাবরই বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে। শৈশব থেকেই নারী বুঝে যায়, প্রচলিত সমাজে পুরুষের সমতুল্য সে কিছুতেই নয়। অথচ নারীরও অধিকার রয়েছে এ সমাজে পূর্ণাঙ্গ মানুষের অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার। আর এ কারণে স্ত্রী চরিত্রটি চেয়েছে সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও বাধা-বন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে। স্বামী চরিত্রটি যখন সমাজ-নির্ধারিত বিধান এবং স্বামী-সন্তানের প্রতি তার দায়িত্বের কথা বলে তাকে গণ্ডিবদ্ধ করতে চেয়েছে, তখনই নারী চরিত্রটি প্রতিবাদ করে বলেছে :

> ওসব বড় বড় কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই।
> আমাকে মানুষের মতো বাঁচতে হবে,
> যেমন তুমিও মানুষের মতোই বাঁচতে চাও।
> আমাকে স্ত্রী নয়, মা নয়, মানুষ হয়ে উঠতে হবে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৪)

ফলত স্ত্রীকে গৃহপরিবেশে অবরুদ্ধ রাখার শেষ উপায় হিসেবে পুরুষ চরিত্রটি তাকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী নারীচরিত্রটি তখন প্রচলিত ধর্মকেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে জানিয়েছে, ধর্ম তো আসলে পুরুষেরই রচনা, পুরুষেরই বর্ণনা; সেখানে নারীর মতামত, অধিকার পুরোপুরি উপেক্ষিত। ফলত নিজ কর্তব্য, নিজধর্ম সে নিজেই এখন বুঝে নিতে চায় :

> ধর্ম তো এই—মোল্লারা যা বলে, পাদ্রীরা যা বোঝায়, যা ব্যাখ্যা করে!
> এবার আমাকে নিজের মতো করে বুঝতে হবে।
> জীবনের পাঠ নিয়ে দেখতে হবে সত্যটা আছে কোথায়।
> আমাকে জানতেই হবে মোল্লারা যা বলে তার কতখানি সত্য,
> আর কতটা মনগড়া।
> বা, ওরা যা বলে তা আমার বেলায় খাটে কিনা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৫)

বিদ্যমান সমাজে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মাপকাঠিও নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করেছে পুরুষ। ফলে সেখানে নারীর স্বার্থ বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। সংসারে তাই নারীর স্বাধীন জীবনমান-আকাঙ্ক্ষা পুরুষের কাছে অনুচিত বলেই বিবেচিত হয়। বস্তুত, যে সমাজের বিধি-বিধান পুরুষ স্বীয় স্বার্থে তৈরি করেছে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কিংবা স্বাধীনচারী মনোবৃত্তি সেখানে অন্যায় ও অবান্তর। কিন্তু নারী আজ কেবল পুরুষের চোখে নয়, বরং নারীর চোখে সমাজকে দেখতে চাইছে :

> নারীর কোনো নিজস্ব মত পথ নেই এ সমাজে।
> একবার নারীর চোখ দিয়ে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো,
> দেখে বোলো—তোমরা যে চোখে দ্যাখো, সে চোখেই কি নারী দ্যাখে—
> কোনটা তার জন্যে ভালো আর কোনটা মন্দ? (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৬)

শিরদাঁড়া রুজু করে দীপ্রভঙ্গিতে তাই সে উচ্চারণ করেছে :

> স্ত্রী। শুনেছি কারো স্ত্রী যখন স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যায়, যেমন আমি যাচ্ছি,
> সমাজ বলে, তখন স্বামী সব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
> সমাজ পড়ে থাক, আজ আমিই তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে যাচ্ছি।
> আমাদের কারো কোনো দায় দায়িত্ব আর নেই কারো প্রতি।
> দুজনেরই এখন পূর্ণ স্বাধীনতা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৮)

তবে *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক দেখিয়েছেন, ইবসেন রচিত নাটকের নোরার যাপিত-জীবন ও সমাজব্যবস্থা এখন আর সেবকম নেই; সময়ের ব্যবধানে মানবভাবনায়ও অনেক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু নারীসম্পর্কিত ভাবনার অনেক কিছুই এখনও বহাল রয়েছে। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী এখনও অসহায়। পুরুষের পক্ষে যে-কাজটি স্বাভাবিক, নারীর জন্য তা এখনও অশোভন ও অকল্পনীয়। আলোচ্যমান নাটকেও দেখা যায়, রাত্রি-নিশীথে জনমানবশূন্য রেলস্টেশনে নারীকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রৌঢ় চরিত্রটি বিস্মিত হয়েছে; তার নিরাপত্তা ভাবিত হয়েছে এবং সম্ভাব্য সামাজিক পীড়ন ও প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সতর্ক করে বলেছে :

> প্রৌঢ়। একা নারী। দিনের বেলাতেই পথে ঘাটে তাকে কত সামলে
> চলতে হয়।
> আর রাতে? পথে প্রান্তরে, শহরে বিরানে—নারীর জন্যে ওঁৎ
> পেতে আছে ভয়।
> আর সেই আপনি কিনা, দিনে নয়, রাতে, নিশুতি রাতে—একা?
> একা বেরিয়ে পড়লেন? একেবারে একা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫২২)

নাটকের প্রারম্ভদৃশ্যেও নারীকে দেখে প্রৌঢ়ের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। প্রৌঢ় চরিত্রটি অবাক চোখে ভেবে নিয়েছে এ হয়তো মানবী নয়; দেহাতি বা অশরীরী কিছু। কেননা আবহমান সামাজিক বিধিব্যবস্থা তার মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে যে, একেলা নারীর পক্ষে রাত্রিনিশীথে বাইরে থাকা অশোভন ও অন্যায়। কিন্তু যখন সে নিশ্চিত হয় যে, এ একজন সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ; তখনই তার মাথায় আসে এ নারী হয়তো সমাজবঞ্চিতা, গৃহহীন, অসহায়! ফলে প্রথমেই সে কৌতূহল ও সমবেদনা নিয়েই নারীটির সঙ্গে আলাপে মগ্ন হয়েছে। এসময়ে নারীকে উদ্দেশ্য করে প্রৌঢ়ের যে উক্তি তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে:

> ভেবেছিলাম দেহাতি কেউ। [...]
> আপনি যে পুরুষ নন, সেটাও চোখে পড়লো।
> একটু অবাক হলাম। ভাবিনি আপনার মতো কেউ
> এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। [...]
> মানে, একা একজন মহিলা,
> অন্ধকারে, নিশুতি রাতে, প্লাটফরমের বাইরে,
> পুরুষ হয়ে কতক্ষণ চোখে দেখা যায় বলুন। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৪)

অপেক্ষমাণ নাটকের নারীচরিত্র সামাজিক এই বিধিব্যবস্থা সম্যক অবগত। তাই তার খেদোক্তি:

> নারী। নারী নেবে সিদ্ধান্ত? নারীকে তো সিদ্ধান্ত দেয়া হবে!
> আর নারী সেটা মেনে নেবে—বিনা প্রশ্নে, বিনা তর্কে! তাই না? (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৮)

ইবসেন-রচিত নাটকে নোরার সশব্দে দরোজা বন্ধ করে স্বামীগৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি সেকালের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একান্তই বৈপ্লবিক। সংসারী নারী উপভৌগিক সমস্ত সুবিধা পেয়েও কেবল আত্মমর্যাদার প্রশ্নে এতটা দ্রোহী হতে পারে, সেটি ছিল সেকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অকল্পনীয়। বলাবাহুল্য, এরকম একটি নাটক লেখার জন্য হেনরিক ইবসেনকে কট্টরপন্থীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। আত্মমর্যাদাবোধে তাড়িত হয়ে নোরাই যে গৃহত্যাগের মতো দুঃসাহসী ভূমিকার মাধ্যমে সমাজে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ রেখেছিল, সেটি সৈয়দ শামসুল হক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তবে তিনি এও জানতেন এই ঘুণেধরা প্রাচীন প্রথার পরিবর্তন কোনও একক প্রয়াসে সম্ভবপর নয়। তবু নোরার এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ়ের মুখের

সংলাপে নাট্যকারের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রৌঢ় এবং নারী চরিত্রের প্রাসঙ্গিক কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে :

নারী। দরোজাটা ভেঙেই ফেলেছি কিনা?
প্রৌঢ়। না, না। ভাঙা অত সহজ নয়।
এ তো আর আজকের দিনের হালকা পল্কা দরোজা নয়।
ওক কাঠের দরোজা, ঊনবিংশ শতাব্দীর। কঠিন!
নারী। সমাজটার মতোই!
প্রৌঢ়। ঠিক বলেছেন। কঠিন ছিলো সমাজ। [...]
কিন্তু এখন আর তেমনটা নেই।
ভাঙতে শুরু করেছে। বদলাতে শুরু করেছে। বদলাচ্ছে। [...]
আপনার ওই বেরিয়ে আসাটা ছিলো বৈপ্লবিক।
দরোজা খুলে দড়াম করে বন্ধ করাটা ছিলো একটা প্রতীক। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২১)

অন্যদিকে, হেনরিক ইবসেনের *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকটি পুরোপুরি সামাজিক নাটক। সৈয়দ শামসুল হক এ নাটকের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বাঙালি সমাজের অদ্ভুত মিল প্রত্যক্ষ করেছেন। যে কারণে তিনি যখন ইবসেন থেকে ভাষান্তর করে *অপেক্ষমাণ* নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন একবারের জন্যও মনে হয়নি যে, এটি ভিনদেশি কোনো নাট্যকারের রচিত শতবর্ষ অতীতের ঘটনা; বরং দর্শক এ কাহিনির সঙ্গে এতটাই আত্মিক টান অনুভব করেন, যেন মনে হয়—এ তো এদেশেরই ঘরের গল্প; এ যে বাংলাদেশের অস্থির ও মেরুদণ্ডহীন, সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতিচিত্র। ইবসেনের নাটকে ঝরনা প্রকল্প নষ্ট হয়েছে ট্যানারির বর্জ্য দূষণে; স্বীয়স্বার্থে ও ক্ষমতার দম্ভে যেটিকে আড়াল করতে চেয়েছেন নগরের মেয়র পিটার। এর সঙ্গে রাজধানী ঢাকার হাজারিবাগের ট্যানারি শিল্প আর বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণচিত্র অনায়াসেই মেলানো যায়। এদেশের অধিকাংশ সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও এরকম দুর্নীতিতে আমূল আবদ্ধ। ঢাকার ওয়াসা (Water Suply And Sewarage Authority) ও নগর ভবনও (City corporetion) জনগণকে বিভ্রান্তমূলক তথ্য দিয়ে নিজেদের অপকর্মের পক্ষে নির্লজ্জ সাফাই গায়। ফলে ইবসেনের এ কাহিনি যেন বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের কাহিনি।

রক্ষণশীল পশ্চাৎপদ সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা প্রথাবিরোধী ও ভিন্নমত একেবারেই গ্রহণ করতে পারে না। *অপেক্ষমাণ* নাটকে পৌরপিতার চরিত্রের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে। ডাক্তার যখন নদীদূষণের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে, পৌরপিতা নিজের দোষ আড়াল করে জনমনে ডাক্তার সর্ম্পকে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে বলেছে :

পৌরপিতা। আমি একটা ভিতরের কথা বলি। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে—
এই ডাক্তার—একটা বাজে হুজ্জত তুলে—এই আমার ভাই—
আপনাদের মন খুশি করা কিছু কথা বলে—
আগামী নির্বাচনে—শহরের পৌরপিতা হতে চায়—আপনাদের ভোটে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৬)

পৌরপিতার এই কূটকৌশলী ও দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিয়ে নির্ভীক ডাক্তার তার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে বলেছেন :

ডাক্তার। ইতিহাস আরো একবার দেখছে,
কয়েকজন মুনাফাখোর লুটেরা সত্যকে কীভাবে বিকৃত করছে।
সত্যবাদীকে কীভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে।
আর, বিত্ত আর সম্পদ আর ক্ষমতার লোভে

কীভাবে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে দলে টানা হয়েছে। ধিক। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৬)

বস্তুত, সমাজে এমন কিছু দৃঢ়চেতা মানুষ থাকেন যারা জীবনের সবটুকু দিয়ে সত্যের জন্যে লড়াই করে যান। সৈয়দ শামসুল হকের *অপেক্ষমাণ* নাটকের পুরুষ চরিত্রটি এমনই একজন নির্ভীক ও সত্যান্বেষী মানুষ। একটি নির্ভেজাল সত্যকে উন্মোচনের তাগিদ থেকে তিনি নিজ এলাকার জনগণ, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, সকলের সঙ্গে লড়াই করে বেরিয়ে এসেছেন সত্য উন্মোচনে। নাট্যকার ডাক্তার চরিত্রটির সমাজহিতৈষী মানসিকতা উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপে :

আমি প্রাইভেট প্রাকটিসে যাইনি, আমি সামান্য বেতনে চাকরি
নিয়েছি পৌরসভার—
যেন আপনাদের পাশে রোগেশোকে দাঁড়াতে পারি। [...]
ডাক্তারের কাজ শুধু রোগের চিকিৎসা করা নয়,
ডাক্তারের প্রথম কাজ—আমার বিবেচনায়—রোগের কারণ নির্মূল করা।
জনজীবনের নীরোগ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৯)

আবার, স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদেরা নিজেদের স্বার্থে জনতাকে ব্যবহার করে। মুখে মুখে জনতাকে নিয়ে বড় বুলি আওড়ায়। কিন্তু নজর থাকে আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার দিকে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের এই কূটচাল ডাক্তার জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন—জনতা পুতুলমাত্র। কেননা সত্য-মিথ্যা যাচাই করার সক্ষমতা জনতার সবসময় থাকে না। ফলে সব ক্ষমতা থেকে যায় রাজনীতিবিদের হাতেই। ডাক্তার এবং পৌরপিতার সংলাপে সমাজ ও রাজনীতির এই গতিচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নরূপে :

পৌরপিতা। তোমার উদ্দেশ্যটা কী বলো তো? আমাদের অপমান করা?
আমরা জনতার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি?
জনতাই হচ্ছে আসল শক্তি—শক্তির উৎসই হচ্ছে জনতা।
ডাক্তার। এর চেয়ে বড় মিথ্যে আর কিছু নেই। দড়ি তোমাদের হাতে।
জনতা পুতুল—তোমরা নাচাচ্ছো। যেমন নাচাও, তেমনি নাচে!
শক্তি তাদেরই হাতে যারা সত্যমিথ্যা বিচার করতে পারে,
ভালোমন্দ স্পষ্ট করে নির্ণয় করবার ক্ষমতা রাখে।
আর, ভালোমন্দ বা সত্যমিথ্যা নির্ণয় করবার জন্যে চাই তথ্য—
পর্যাপ্ত শুধু নয়, সকল তথ্য, সব তথ্য,
আর সেই তথ্য বিশ্লেষণ করবার মতো মেধা।
জনতা তো একটা ধারণা মাত্র—
জনতার ভেতরে একটি একটি করে মানুষ।
সেই একটি একটি মানুষের সবারই কি আছে একই মাপের মেধা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

কিন্তু ডাক্তারের এ সংলাপের পরেও শোনা গেছে পৌরপিতার দাম্ভিক স্বৈরতান্ত্রিক স্বর :

পৌরপিতা। আমাদের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ করছেন উনি!
এতবড় অভিযোগ এনে তুমি পার পাবে না।
এ শহরে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩২)

রাজনীতিবিদের এই অপকৌশল সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হক আমাদের সোচ্চার করেছেন নারীচরিত্রটির মাধ্যমে উচ্চারিত অপর একটি সংলাপে :

মিথ্যাচারের কথা বলুন।
তিক্ত সত্যকে মিথ্যার মিষ্টি মোড়কে গেলবার কথাও বলুন। [...]
মিথ্যা গিলিয়ে জনসাধারণকে মৌতাতে ফেলে
সমাজকর্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা!
আপনি তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৪)

আবার, আলোচ্যমান নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রটির উক্তির মাধ্যমে ইবসেনের দুটি নাটকের সামাজিক বাস্তবতার মূলসার উঠে এসেছে নিম্নরূপে:

প্রৌঢ় । আপনি সংসারে নারী অবস্থান —
আসল তার রূপ—কোটি কোটি সংসারে—
সারা পৃথিবীতে, প্রতিটি সমাজে—
আপনার ব্যাক্তিগত জীবন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে—
সব নারীর হয়ে—উপলব্ধি করেছেন। [...]
আর আপনি—আপনি তো
একটা শহরের পরিস্থিতির ভেতরে উপলব্ধি করেছেন—
ক্ষমতা আর সম্পদের লোভে গুটিকয় মানুষ—ওপরতলার কিছু মানুষ—
কীভাবে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে—
তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েও—
কীভাবে ক্ষমতাধরেরা তাদের আসন পাকা করে—
সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে! (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৬)

ঈর্ষা নাটকের প্রৌঢ় যখন মনে করেছে অপর দুই চরিত্রের সমাজঘনিষ্ঠ কাহিনির ভেতরে তারও কাহিনি নিছকই ব্যক্তিগত, তখন পুরুষ চরিত্রটি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে—ব্যক্তিও সমাজের অংশ। তাই তার জীবনবাস্তবতাও প্রকারান্তরে সামাজিক বাস্তবতা।

পুরুষ। কে বলে মূল্য নেই! ব্যক্তি ব্যক্তি ব্যক্তি নিয়েই তো সমাজ।
বিন্দু বিন্দু পানি নিয়েই তো সাগর! একটি একটি ফুল নিয়েই উদ্যান! [...]
জীবনের প্রতারণা যদি শিল্পে ছায়া ফেলে—
শিল্প তো সমস্ত মানুষ—গোটা একটা সমাজ—
মানুষ আর সমাজের জন্যেই;
শিল্পে প্রতারণা থাকলে সমাজটাকেই তো প্রতারণা করা হয়। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৭)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্যমান নাটকে ইবসেনের পথে হেঁটেই সমাজের যাবতীয় অসঙ্গতি, অন্যায়, অনাচার তুলে ধরেছেন। হেনরিক ইবসেন তাঁর বাস্তববাদী ধারার নাটকের মাধ্যমে যেমন সমাজের সকল প্রকার অন্ধ সংস্কার, যাজকশ্রেণির অন্যায় আচরণ ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছিলেন; নারীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, মালিকশ্রেণির শোষণ ও নিষ্পেষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে জনগণের শুভচেতনা জাগ্রত করে সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

দুই

বস্তুত *অপেক্ষমাণ* নাটকের চরিত্রায়ণ কৌশল সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য কাব্যনাটকের তুলনায় স্বতন্ত্র। এখানে একটি চরিত্র বহুস্বরের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ইবসেনের নাটকের চরিত্র সৈয়দ হকের নাটকের চরিত্র বনে গেছে। আবার, সৈয়দ হকের নির্মিত চরিত্র ইবসেনের নাটকের চরিত্রে অভিনয় করেছে। চরিত্রের এমন মিথস্ক্রিয়া নাটকটিকে দিয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। আবার, একটি চরিত্র একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করায় অল্পসংখ্যক কুশীলব নিয়ে নাটকটির সফল মঞ্চায়ন সম্ভবপর হয়েছে; একটি নাট্যপ্রযোজনার জটিল প্রক্রিয়ায় যেটি ইতিবাচক দিক। এরপর আবার নাটকের শেষে আকস্মিকভাবে নাট্যকারদের মঞ্চে উপস্থিতি দর্শকদের মাঝে যেমন সাড়া জাগিয়েছে, তেমনি নাটকটির আঙ্গিককে অভিনব করে তুলেছে। নাটকের অভ্যন্তরে নাট্যকারদের এমন উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টিতে বাংলা কাব্যনাটকের ইতিহাসে বোধ হয় আর ঘটেনি; সেদিক দিয়েও এ নাটকটির মধ্যে নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়।

সৈয়দ শামসুল হক সঙ্গত কারণেই ইবসেনের মূলরচনা থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ নাটকে চরিত্র সংযোজন করেছেন। যেমন : ইবসেন রচিত *এ ডলস হাউস* নাটকের প্রধান চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—তরওয়ালড হেলমার, তার স্ত্রী নোরা, নোরার বন্ধু মিসেস লিনদ, হেলমারের বন্ধু ডাক্তার র‍্যাঙ্ক ও নিলস ক্রগস্তাদ। এছাড়া নাটকে গৌণ কিন্তু অপরিহার্য চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে আরও কিছু চরিত্র; এরা হলো হেলমার-নোরার তিন সন্তান, তাদের ধাত্রী অ্যান, গৃহপরিচারিকা ও কুলি চরিত্র। তবে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে কেবল নোরা ও তার স্বামী হেলমারের সক্রিয় উপস্থিতি ও কথোপকথন যুক্ত করেছেন। এছাড়া পরিপ্রেক্ষিতকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যও বেশকিছু চরিত্রের পরোক্ষ উপস্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সংখ্যা এগারো। এরা হলো নাটকের প্রধান চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান, তার স্ত্রী মিসেস স্টকম্যান, ছেলে মর্টেন ও ইয়েলিফ, ডাক্তারের স্কুল শিক্ষিকা কন্যা পেট্রা, ডাক্তারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নগরপিতা পিটার স্টকম্যান, ডাক্তারের শ্বশুর মর্টেন কিল, পত্রিকার সম্পাদক হোভস্টাড, পত্রিকার সম্পাদনা সহকারী বিলিং, পত্রিকার প্রকাশক আসলাকসেন ও ডাক্তারের প্রকৃত নিঃস্বার্থ নাবিক-বন্ধু ক্যাপ্টেন হরস্টার। এছাড়াও নাটকের প্রয়োজনীয় ক্লাইমেক্স তৈরিতে একজন মদ্যপ মাতাল এবং শহরের বেশকিছু জনচরিত্র ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে মূলরচনার সবচরিত্র গ্রহণ করেননি। তিনি কেবল প্রধানতম চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান, খল চরিত্র মেয়র পিটার স্টকম্যান, ডাক্তারের স্ত্রী চরিত্র নিয়ে নাটকের কাহিনি সাজিয়েছেন। অন্যাদিকে, তাঁর স্বরচিত নাটক *ঈর্ষার* মূল নাট্যকাহিনিতেও মাত্র তিনটি চরিত্রেরই শরীরী উপস্থিতি ছিল : প্রৌঢ় শিক্ষক চরিত্র, যুবক শিক্ষার্থী এবং যুবতী। চরিত্রসংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে *অপেক্ষমাণ* নাটকের ক্ষুদ্র পরিসরেও তাদের তিনজনেরই উপস্থিতি রেখেছেন নাট্যকার। আবার আলোচ্যমান নাটকে তিনি সম্পূর্ণ নূতন কিছু চরিত্র এনেছেন। যেমন—স্টেশন মাস্টার, কুলি, ব্রেকডান্সারের দল, কেরানি প্রভৃতি। বস্তুত, তিনটি নাট্যকাহিনিকে একই ক্যানভাসে উপস্থাপনের প্রয়োজনে সৈয়দ শামসুল হক মূলনাটকে চরিত্রের এমন সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। এতৎসত্ত্বেও মূল নাটকের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটেনি।

অপেক্ষমাণ-এর নাট্যকাহিনি শুরু হয়েছে কোরাস চরিত্রের মাধ্যমে; নিশুতিরাতে রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে। কোরাসে নাট্যকার যে চরিত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তারা উক্ত স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, কুলি এবং কেরানি। এরাই বিভিন্ন সময়ে নাটকের প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। এরাই কখনো ব্রেকডান্সারের দলভুক্ত হয়ে নাটকের মূলসূত্র দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে, কখনো *এন এনিমি অব দ্য পিপলের* জনগণের ভূমিকা পালন করেছে, আবার কখনো কখনো দৃশ্যানুযায়ী মঞ্চসজ্জার কাজে ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ কোরাসকে সৈয়দ শামসুল হক নাট্যপরিবেশনায় সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন। কোরাসের এই

বহুমাত্রিক উপস্থাপনা বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে অভূতপূর্ব ঘটনা। নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকের প্রারম্ভে যে মঞ্চনির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেখানেই কোরাসের এমন বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে দর্শকদের ধারণা দেবার প্রয়াস পেয়েছেন :

> শূন্য মঞ্চ। অন্ধকার মঞ্চের ওপর প্রথমে কয়েকটি তীব্র আলোর বৃত্ত নাচানাচি করে। তার কিছুক্ষণ পরে মঞ্চে প্রবেশ করে ব্রেকডান্সারের দল। এরা আসলে স্টেশনের মাস্টার, কুলি ও কেরাণীর দল। গায়ে সেই রকমেরই ইউনিফর্ম, কিন্তু তাদের হাতে ধরা নাটকের ট্রাজেডি ও কমেডির একটি করে মুখোশ। এরা কোরাসের ভূমিকা পালন করবে—দৃশ্যের প্রয়োজনে মঞ্চ সাজাতে আসবে। সঙ্গীতের সঙ্গে তারা ব্রেকডান্স শুরু করে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০১)

মূলত, প্রাচীন গ্রিক নাট্যকলায় নাট্যকারগণ কোরাসের ভূমিকাকে যেভাবে নাটকে প্রদর্শন করেছেন, সৈয়দ শামসুল হক তা আত্তীকৃত করে তার মধ্যে নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকে কোরাসের বহুমাত্রিক ভূমিকা নাটকটির মঞ্চপ্রদর্শনকে যেমন সহজতর করে তুলেছে, তেমনি চরিত্রাধিক্যের জটিলতা থেকে নাটকটিকে মুক্ত করেছে।

অপেক্ষমাণ শুরু হয়েছে রেলওয়ের প্লাটফর্মে তিনটি নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে; তারা নিজেরাই প্রসঙ্গক্রমে নিজেদের বর্তমান চরিত্র বদলে ফিরে গেছে অতীতে এবং দর্শকদের সম্মুখে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বেদনাদায়ক কাহিনি অভিনয়কলার মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। নাটকের প্রৌঢ়চরিত্র কখনও হয়ে উঠেছেন সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষা* নাটকের প্রবীণ অধ্যাপক, কখনও হয়েছেন *এ ডলস হাউস* নাটকের নোরার স্বামী হেলমার, আবার কখনও *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের খলচরিত্র নগরপিতা পিটার স্টকম্যান। নাট্যসমাপ্তিতে আবার তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রে। তবে মূল *ঈর্ষা* নাটকে যে অসূয়াকাতর প্রৌঢ় শিল্পীকে দেখা যায়, যিনি স্বীয় শিল্পচর্চা আর জৈবিক প্রয়োজনে নিজের ছাত্রীকে ব্যবহার করেছেন, আবার শিল্পকর্মের আদর্শানুসারী না হওয়ায় জনৈক প্রতিভাবান ছাত্রকে পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দিয়েছেন; সেই ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাকাতর প্রবীণ শিল্পী *অপেক্ষমাণ* নাটকে এসে ইতিবাচক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। *ঈর্ষা* নাটকে যেখানে তিনি ছিলেন হতাশায় মজ্জমান ব্যর্থ প্রেমিক সত্তা এবং যিনি তাঁরই প্রেমাস্পদ ছাত্রীর বিবাহিত জীবনকে তছনছ করে দেবার হুমকি দিয়ে বলেছিলেন :

> এত ঘৃণা? অসহ্য এতই? এতই দূরত্ব আজ? [...]
> দু'জনের মাঝখানে একটি যুবক আজ?
> প্রতিদ্বন্দ্বী এখন যুবক—আমারই একজন ছাত্র? [...]
> সে তোমাকে নগ্ন করে দেখেছে কি? এরই মধ্যে শোয়া হয়ে গেছে? [...]
> আহ্, আ, আ, কি যে ক্রোধ হচ্ছে আমার।— ক্রোধ। হাঁ, হাঁ, ক্রোধ। (শামসুল, ২০১৬ : ৩২০)

অথচ এই ক্রোধে মত্ত, প্রতিশোধে উন্মুখ প্রবীণ অধ্যাপক *অপেক্ষমাণ* নাটকে এসে শান্ত, স্থিত ও প্রজ্ঞাবান চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। অন্তরের যাবতীয় পাপাচার, অশুদ্ধতা ধুয়ে-মুছে এ যেন তাঁর নবতর সত্তায় আত্মোদ্বোধন। তবে *ঈর্ষা* নাটকেও প্রৌঢ়ের আত্ম-অনুশোচনার ইঙ্গিত ছিল। তবে সেটি ছিল কিছুটা ধোঁয়াশাপূর্ণ। সেখানে একবার তাঁর মনে হয়েছিল, মেয়েটির সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে শরীরী সম্পর্কে যাওয়া তাঁর উচিত হয়নি, কেননা প্রতারণা ও মিথ্যাচার যাবতীয় শিল্প ও সুন্দরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর যাই হোক মিথ্যে দিয়ে, চাতুরি দিয়ে সত্য, সুন্দর ও শিল্পের পূজা সম্ভবপর নয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মন ও শরীর মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। *ঈর্ষা* নাটকের শেষে প্রৌঢ়ের সংলাপগুলো বিচার করলে সেটি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ঈর্ষাকাতর প্রেমিকের মতোই তিনি সন্দেহ করেছেন

মেয়েটি হয়তো যুবকের সঙ্গেই অন্য কোথাও মিলিত হচ্ছে। তাকে ফেরানোর আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে তিনি বলেছেন :

> কোথায় সে? কোথায়? তুমি আছো কোথায়? [...]
> তুমি, তুমি, রক্তমাংসে যে তুমি, আমি সেই তোমাকে চাই।
> আমার ক্যানভাস হোক অমর, তোমার নদীতে আমি মরতে চাই। (শামসুল, ২০১৬ : ৩৬৮)

অথচ *অপেক্ষমাণ* নাটকে এই কামে, ক্রোধে উন্মত্ত প্রৌঢ় চরিত্রটি বিস্ময়করভাবে বদলে গেছেন। নারীর শরীর নিয়ে শিল্পচর্চা আর তাঁর আরাধ্য নয়; বরং প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য উপভোগ করে তাকে স্বীয় ক্যানভাসে অমর করে রাখাই এখন তার অন্বিষ্ট।

ঈর্ষা নাটকে যুবক ছাত্রের পছন্দ ছিল প্রকৃতির রূপলাবণ্য ও বাস্তবদৃশ্য নিয়ে ছবি আঁকা। প্রৌঢ় চরিত্রটি মত্ত ছিলেন ন্যুড আর বিমূর্ত চিত্রকলায়; প্রকৃতির ছবি আঁকা একটা সময় তার কাছে মনে হতো শিল্পের নয় বরং ক্যামেরার চোখ দিয়ে সৌন্দর্য-অবলোকন। কিন্তু অন্তরের ঈর্ষা আর পঙ্কিলতা ঝেড়ে ফেলে শুদ্ধতম সত্তায় উন্নীত হয়ে তিনি এখন ছুটে চলেছেন দূরের কোনো গ্রামে; যেখানে অবারিত মাঠের প্রান্তে আকাশের কোলে টুপ করে ডুবে যায় দিনান্তের রক্তিম সূর্য; কিংবা খরায়, বন্যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন ফসলের খেতে উদীয়মান সূর্যের মনোলোভা ছবি। রেলস্টেশনে দেখা পাওয়া যুবতী নারীকে (যেন *এ ডলস হাউসের* নোরাকে) উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, এ রেল স্টেশনে বসে অপেক্ষা করা কেবল নিছকই রেলে চেপে গন্তব্যে প্রস্থানের জন্য নয়; বরং এ অপেক্ষা দিন বদলের। কালোকে ধুয়ে মুছে আলোতে পরিবর্তন করার। প্রতারণা থেকে বেরিয়ে এসে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করার। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ় চরিত্রটিই নোরা ও ডাক্তারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যকে একাকার করে ফেলেছেন। অর্থাৎ সে-ই তিনটি চরিত্রের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যকে একই ফ্রেমে বেঁধেছেন। বস্তুত প্রৌঢ় চরিত্রটিই এখানে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের প্রতিনিধি হয়ে তিনটি নাটকের সারকথা দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। নারীচরিত্রটি অর্থাৎ নোরা যখন নাটক শেষে বলে উঠেছে আমাদের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা বোধ হয় শেষ হতে যাচ্ছে; তখন পুরুষ চরিত্রটি অর্থাৎ *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্রটি বলেছে—এ অপেক্ষার শেষ কেবল ট্রেনে চড়ে যাবার জন্য নয়, এ অপেক্ষার শেষ দিন বদলের। প্রৌঢ় চরিত্রটির উচ্চারিত সংলাপে সেই বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> প্রতারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু শুরু করবার।
> ব্যক্তির জীবনের প্রতারণা।
> জনতাকে প্রতারণা।
> সংসারের প্রতারণা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

এখানে ব্যক্তির জীবনের প্রতারণা বলতে প্রৌঢ় নিজের জীবনের কথা বলেছেন। কেননা তিনি শিল্পচর্চার নামে ছাত্রীর ন্যুড এঁকে, তাকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, তেমনি শিল্পকে করেছেন অমর্যাদা। তার অদূরদর্শী ও হীন তৎপরতায় তছনছ হয়ে গেছে দুজন সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীর জীবন। এই সত্য উপলব্ধি করেই তিনি এখন আত্মাকে শুদ্ধ করতে চাইছেন। অন্যদিকে, জনতাকে প্রতারণার কথা বলে তিনি ইঙ্গিত করেছেন *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের কাহিনি-অন্তর্গত নগরপিতার কথা। যিনি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য স্বীয়ভ্রাতা ডাক্তার স্টকহোমকে প্রতারিত করেছেন। চরিত্রটি কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে জনতাকে ঠকাতে চাননি। শহরের পানিতে বিষক্রিয়ার কথা তিনি নির্দ্বিধায় জনগণকে অবহিত করেছেন। অথচ বিষয়টি চেপে গেলে তিনি নিজভ্রাতা নগরপিতাকর্তৃক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারতেন। বরং সে সত্যে অবিচল থেকে সত্যকে প্রচারের জন্য সব হারিয়ে তিনি আজ পথে নেমে এসেছেন। যে জনতা তাকে ভুল বুঝে শহর ত্যাগে বাধ্য করেছে, সেই জনতার

স্বার্থরক্ষায় তিনি আজ পথে পথে। আবার সংসারের প্রতারণা বলতে প্রৌঢ় *এ ডলস হাউসের* নারীচরিত্র অর্থাৎ নোরাকে বুঝিয়েছেন। কেননা পুরুষশাষিত সমাজের প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে সেও জীবনানন্দে স্থিত হতে চেয়েছে। দিনবদলের এই জয়গানের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রৌঢ় চরিত্রের সংলাপে :

> হ্যাঁ, আমি সেই প্রান্তরে যাচ্ছি—
> খরায় উজাড় হয়ে যাওয়া মাঠে—সূর্য উঠছে—আঁকতে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

অপেক্ষমাণ নাটকের প্রারম্ভে তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক আলাপের সূচনাও ঘটেছে *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রের উদ্যোগে। নইলে ইবসেন নির্মিত চরিত্র নোরা এবং ডাক্তার স্টকম্যান তারা দুজনেই ছিলেন নিজেদের চিন্তায় আত্মমগ্ন, বিভোর। আশেপাশের ব্যক্তি বা পরিবেশ নিয়ে তাদের আগ্রহ ছিল না। নোরার এই আত্মমগ্নতা নাট্যকার মঞ্চনির্দেশ অংশে একটি উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি নোরাকে বলেছেন ছায়ামূর্তির মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা নারী, যার বসনপ্রান্ত হাওয়ায় উড়ছে। এমনকি প্রৌঢ়ব্যক্তি তাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে কুশল বিনিময়ের জন্য এগিয়ে গেলেও নোরা তখনো তাকে লক্ষ করে না। প্রৌঢ়ের সংলাপ এবং নোরার প্রতিক্রিয়ার যে মঞ্চনির্দেশনা নাট্যকার দিয়েছেন তা উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ়ের প্রথম সংলাপ ও নারী চরিত্রের প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ :

> প্রৌঢ়। এই যে—শুনছেন?
> নারী উত্তর দেয় না। যেন সে শোনেই নি।
> প্রৌঢ় এবার আর একটু কাছে এগিয়ে যায়।
> প্রৌঢ়। আপনি কি যাত্রী? ট্রেন আসবার বেশ দেরী আছে কিন্তু।
> নারী এবারও কোনো উত্তর করে না বা সাড়া দেয় না। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৪)

এরপর প্রৌঢ় হাল না ছেড়ে আবারো বারোটি বাক্যসংবলিত একটি দীর্ঘ সংলাপ বলে নারীটিকে বাক্যালাপে আগ্রহী করে তুলতে চায়। এ পর্যায়ে মঞ্চে প্রথম নারীচরিত্রটি অর্থাৎ নোরার প্রথম সংলাপ শুনতে পাওয়া যায়, তবে সেটিও নারীর স্বাভাবিক চপলতাসুলভ নয়; বরং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ একটি মাত্র বাক্যের সংলাপ : "আমি এখানেই ভাল আছি।" কিন্তু বারংবার প্রৌঢ় চরিত্রটির উত্থাপিত নানান প্রসঙ্গ এবং বাক্যালাপের আন্তরিকতা একসময় প্রৌঢ়ের সঙ্গে তাকে আলাপে অনুপ্রাণিত করে তোলে। সে প্রথমে প্রৌঢ়ের জীবনকাহিনি শ্রবণ করে। এরপর ধীরে ধীরে সে নিজের জীবনকাহিনি উন্মোচিত করে। অবশেষে তাদের এ আলাপে নিজে থেকেই যুক্ত হয় ওয়েটিং রুমে অপেক্ষারত অপর পুরুষ চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান। উল্লেখ্য এখানে স্পষ্টত প্রৌঢ়ের একক আগ্রহেই রেল স্টেশনে অপেক্ষারত তিনটি পৃথক চরিত্র একীভূত হয়ে তাদের জীবনের গল্পগুলো বিনিময় করে। একটু বিবেচনা করলে বোঝা যায়, প্রৌঢ় ব্যক্তির এমন উদ্যোগী হয়ে আলাপ জমানোর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক নিজেই যখন উদ্যোগী হয়েছেন আর্ন্তজাতিক ইবসেন নাট্যোৎসবে এ চরিত্রগুলির সম্মিলনের, সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের রচিত নাটকের চরিত্র উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে সেটিই স্বাভাবিক। আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে—যেহেতু তিনটি চরিত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী প্রৌঢ় চরিত্রটি। তাই বয়সের অভ্যাস অনুসারে প্রৌঢ় ব্যক্তির সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ধরে নিয়েই নাট্যকার অত্যন্ত কুশলী হয়ে প্রৌঢ়ের সঙ্গেই নোরার প্রথম আলাপ জমিয়েছেন। অর্থাৎ সৈয়দ শামসুল হক স্পষ্টত *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রের তুলনায় *অপেক্ষমাণ* নাটকে আলাপি স্বভাবের এক প্রৌঢ় চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্রটির ইতিবাচক পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত তিনি *ঈর্ষা* নাটকে রেখে এসেছিলেন, তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়েছেন আলোচ্যমান নাটকে।

অন্যদিকে নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকে নারী ও পুরুষ নামে যে চরিত্রদুটির চিত্রণ ঘটিয়েছেন, তা পুরোটাই ইবসেন নির্মিত চরিত্রের প্রতিরূপ। যেহেতু তিনটি নাটককে সমীকৃত করে একটি নাটক রচনা করতে হয়েছে তাঁকে, তাই নাট্যরস ধরে রাখতে এবং সংহত অবয়ব প্রদানের প্রয়োজনে তিনি ইবসেনের চরিত্রদুটিকে বিস্তৃত আকারে গ্রন্থিত করেননি। তবে চরিত্রদুটির যে আংশিক ঝলক এবং দৃঢ়তা তিনি নাটকে উপস্থাপন করেছেন তাকে ইবসেন নির্মিত ডিটেইলস চরিত্রের সারবত্তা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

নারীচরিত্রটি ইবসেনের নোরা চরিত্রের বাইরে *ঈর্ষা* নাটকের ছাত্রীর ভূমিকাতেও অভিনয় করেছে। তবে শেষাবধি ফিরে এসেছে নোরা চরিত্রেই। *এ ডলস হাউস* নাটকে নোরা চরিত্রটির একটি রূপান্তর দেখিয়েছেন নাট্যকার ইবসেন। যেমন : নাটকের প্রাথমিক অঙ্কে নোরার যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তাতে তাকে আমুদে, চলচপলা, স্নেহশীল মাতা ও একনিষ্ঠ পত্নী ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। তার মিষ্টি চিনেবাদাম খাওয়া স্বামীর পছন্দ নয়। তাই সে লুকিয়ে নিজের ভীষণ পছন্দের বাদাম খায়, প্রকাশ্যে স্বামীকে নিজের পছন্দ সম্পর্কে বলতে পারে না বা বলে না। বরং স্বামীর জেরার মুখে সে মনে করে স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার কখনোই যাওয়া উচিত নয়, হোক তা যতই সঠিক আর পছন্দের। হেলমার ও নোরার এতৎসংক্রান্ত সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

> হেলমার। তুমি কি আজ মিষ্টির দোকানে যাওনি?
> নোরা। না তো! একথা বলছো কেন? [...]
> নোরা। [ডানদিকে টেবিলের কাছে গিয়ে] তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়াটা আমার উচিত নয়।
> হেলমার। না, নিশ্চয় না। (সুনীল, ১৯৮৩ : ১২-১৩)

নোরার স্বামী যখন তাকে কথায় কথায় 'মেয়েছেলে' 'বেহিসেবী নারী' 'উড়নচণ্ডী' প্রভৃতি উক্তি করে তখন সে নীরবে সয়ে যায়, গায়ে মাখে না, বরং হেসে উড়িয়ে দেয়। আবার স্বামী হেলমার যখন তাকে ভালবেসে 'পক্ষীরাণী', 'ক্ষুদে কাঠবিড়ালী' প্রভৃতি প্রাণীবাচক বিশেষণ ব্যবহার করে, নোরা তখন সেগুলো সানন্দচিত্তে উপভোগ করে :

> হেলমার। আমার পক্ষীরানীর গলা নাকি?
> নোরা। হ্যাঁ, পক্ষীরাণীর। [...]
> হেলমার। আমার কাঠবিড়ালী বাড়ি ফিরলো কখন?
> নোরা। এইমাত্র। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৯-১০)

অথচ এই নোরাই কিছু ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অবশেষে পুরোপুরি বদলে যায়। সামাজিক প্রথা আর প্রচলন ভেঙে সে হয়ে ওঠে আত্মপ্রত্যয়ী নারী। যে সংসার, সন্তান ও স্বামী ছিল তার সার্বক্ষণিক ভাবনার, দৈনন্দিন কর্মের কেন্দ্রবিন্দু, সে-সবকে পেছনে ফেলে সে নিজেকে আত্মানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষারত যে নারীর ছবি এঁকেছেন সে মূলত এই দৃঢ়প্রত্যয়ী নোরা। সে এখন আর সংসারের পুতুল নয়, পুরুষের খেলার বস্তু নয়। বরং সমাজে নারীপুরুষের সমমর্যাদা ও অধিকারের দাবিতে সোচ্চার ও দৃঢ়কণ্ঠ। এই প্রত্যয়ের দীপ্তি তার অন্তরে ছিল বলেই সে রেলস্টেশনের অন্ধকারকে ভয় পায়নি; অচেনা পরিবেশে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেনি কিংবা ভয়বোধে আক্রান্ত হয়নি। বরং প্রৌঢ়ের আহবানের মুখে নিজের জীবনকাহিনি তাকে খুলে বলতে পেরেছে। নাটকের শেষে যখন প্রৌঢ় তাকে জানিয়েছে প্রতারণা ছেড়ে তার প্রকৃতিসম্ভোগে বেরিয়ে পড়ার কথা, তখন সেও তার গন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছে :

> নারী। আপাতত—যেখানে আমার জন্ম, সেইখানে।
> নতুন জন্ম আমি নিতে চাই। নারী নয়, ব্যক্তির জন্ম। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

এমনকি নারীচরিত্রটি তার এই নবজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নাটকের শেষ সংলাপ অবধি বজায় রেখেছে বা প্রমাণ করে গেছে। কেননা, *অপেক্ষমাণ* নাটকের শেষে যখন নাটকীয়ভাবে দুই দেশের দুই কালের দুজন নাট্যকারের সাক্ষাৎ ঘটে মঞ্চে, তখন প্রৌঢ় চরিত্রটি আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠেন—এই মহান নাট্যকারগণই তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নোরা সেটি মেনে নেয় না। সে বলে—নাট্যকারগণ তাদের সৃষ্টি করেননি, বরং তারাই নাট্যকার সৃষ্টি করেছে :

> প্রৌঢ়। আসলে ওই যে দেখছেন—ওঁরাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন!
> নারী। না! ভুল বললেন। আমরাই ওঁদের সৃষ্টি করেছি। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৫)

বস্তুত, নারীচরিত্রটির এমন দীপ্ত সংলাপের মাধ্যমে নোরার আত্মপ্রত্যয়ী রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে এখন পুরুষের ভুল শুধরে দেবার মতো সাহস সঞ্চার করতে পেরেছে। একজন নাট্যকার যেমন চরিত্রসৃষ্টি করেন, তেমনি ঘটনা কিংবা চরিত্রই যে প্রকৃতপক্ষে একজন কালজয়ী নাট্যকারের জন্ম অবশ্যম্ভাবী করে তোলে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে নোরার এই সংলাপে।

অপেক্ষমাণ নাটকের পুরুষ চরিত্রটি সৈয়দ শামসুল হক হেনরিক ইবসেনের *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছেন। ফলে এই চরিত্রের মধ্যে ইবসেন রচিত চরিত্র পুরোটাই মিশে আছে। সৈয়দ শামসুল হক আর সেখানে কোনও বদল আনেননি। ইবসেন যেমন একজন জনদরদি, প্রচণ্ড মেধাবী ও আবেগি ডাক্তার চরিত্র নির্মাণ করেছেন, সৈয়দ হকও এই চরিত্র নির্মাণে সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তাঁর নাটকে প্রথম পর্যায়ে এ চরিত্রটিকে তিনি দেখিয়েছেন একজন ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আত্মভোলা মানুষ হিসেবে; যিনি অত্যন্ত তন্ময়চিত্তে ওয়েটিং রুমে ক্রমাগত পায়চারি করেই চলেছেন, সহযাত্রীর প্রতি তাঁর কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। তার উপস্থিতি তখনই জানা যায়, যখন প্রৌঢ় চরিত্রটি নারী চরিত্রটিকে ওয়েটিংরুমে বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন :

> আসুন, ওয়েটিং রুমে বসবেন।
> ওখানে আরো একজন আছেন।
> কষে তিনি পায়চারি করছেন সেই এসেছেন থেকে।
> অদ্ভুত ভদ্রলোক। একটি কথাও এ পর্যন্ত হয়নি।
> দু' একবার চেষ্টা করেছিলাম।
> চোখমুখ দেখে তেমন ভালো ঠেকলো না।
> তাই বাইরে বেরিয়েছিলাম। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৫)

একপর্যায়ে নারীটি সম্পূর্ণ একা স্বামীগৃহ ছেড়ে সত্তানুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে শুনে প্রৌঢ় চরিত্রটি যখন বিস্ময় প্রকাশ করে, তখন দেখা যায়, আত্মমগ্ন পুরুষ চরিত্রটি নারীটিকে সমর্থন করছে। এ পর্যায়ে কিন্তু চরিত্রটিকে আর আত্মভোলা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ বলে মনে হয় না; বরং সমাজসচেতন একজন সদালাপী, বাস্তববাদী মানুষ হিসেবেই তিনি দর্শকের সম্মুখে হাজির হয়। তিনি দূর থেকে এদের কথোপকথন শুনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং নিজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ মতামত প্রকাশ করেছেন। তার সংলাপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার সৌজন্যবোধ, সুরুচি, প্রজ্ঞা ও পরিস্থিতি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা :

> দুঃখিত, আমি দুঃখিত। একপাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনছিলাম।
> আশাকরি মনে কিছু করেননি। বা, বেমওকা হাজির হয়ে পড়িনি।
> শুনলাম আপনি পেইন্টার। অনেক কথা বোঝেন শোঝেন।
> কিন্তু আপনার কথাটার প্রতিবাদ না করে পারলাম না।
> একা মানুষেরই কোনো ভয় থাকে না।

তবে, একা হয়ে ওঠাটাই যা মুশকিল।
সবাই পারে না। সবার কাছে একা মানেই—অসহায়।
আমার কাছে নয়। আমি এটা আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২২)

তার সংলাপ শোনার পর প্রৌঢ় চরিত্রটির মনে হয়, তিনি হয়তো কবি সাহিত্যিক বা আত্মমগ্ন প্রকৃতির লোক। যে কারণে তিনি তাকে প্রাচ্যভাববাদ-চর্চার পুরোধা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একলা চলা' বিষয়ক বিখ্যাত গানের পঙ্‌ক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানতে চান—তিনি কি ভাববাদে আস্থা রেখে দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দিতে চান! কিন্তু পুরুষ চরিত্র তখনি তাঁর ভ্রম সংশোধন করে বলেছেন—ভাববাদ নয়, বরং জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি অবশেষে একলা থাকার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি তাই স্পষ্ট করে জানান :

না, অতটা কাব্য করে বলার বা দেখার লোক আমি নই।
আমি কঠিন বাস্তবের মানুষ।
সে হিসেবেই আমি নিজেকে গড়ে তুলেছি।
বাস্তবকে আমি বিচার করে দেখি, বিশ্লেষণ করে দেখি,
তারপর আমার কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।
ওটা আমার সিদ্ধান্তের কথা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৩)

এরপর পুরুষ চরিত্রটি প্রৌঢ় এবং নারীচরিত্রটির কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নিজের জীবনের ট্র্যাজিক আখ্যান বর্ণনা করেন। হেনরিক ইবসেন তিনটি অঙ্কের বিস্তৃত পরিসরে যে নাট্যকাহিনি বেশকিছু চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, নাট্যকার সৈয়দ হক সেখানে পুরুষ চরিত্রের দীর্ঘ একটি সংলাপের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করেছেন। ইবসেনের মূল নাটকের যে অংশে নগরপিতা, ডাক্তার ও জনগণ মুখোমুখি হয়েছে সৈয়দ হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে সেখান থেকেই শুরু করেছেন। এদেশের মানুষ, সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি নাট্যকাহিনি ও চরিত্র সাজিয়েছেন। ইবসেনের নাটকে ডাক্তার চরিত্রটি যেমন দেশপ্রেমিক, নির্লোভ, সত্যান্বেষী, নির্ভীক চরিত্রের; *অপেক্ষমাণ* নাটকেও চরিত্রটি সেরকম। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা ও চরিত্রের বিবর্তন বা পুনর্নির্মাণ নয়; সৈয়দ হকের উদ্দেশ্য ছিল অতীতের বিখ্যাত নাট্যকারের বিখ্যাত চরিত্রকে সমকালের সমাজ, রাজনীতির সঙ্গে একাকার করে পরিবেশন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন শতবছর পরেও সব কালে, সব দেশে, সব সমাজে হেনরিক ইবসেন কতটা প্রাসঙ্গিক।

আলোচ্যমান নাটকের পুরুষ চরিত্রটি ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্রের বাইরে আরও একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রৌঢ় যখন নিজের কাহিনি অভিনয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন তখন এ চরিত্রটি যুবক ছাত্রের ভূমিকা নিয়েছে। আবার নাটকের শেষপর্যায়ে মূলচরিত্রে প্রত্যাবর্তন করেছে। নাটকের শেষে আবারও তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় দৃঢ়প্রত্যয়ী দিনবদলের পথিক চরিত্ররূপে। তিনি জানেন তার প্রতীক্ষা কেবল ট্রেনের জন্য নয়, বরং—

অপেক্ষা পরিবর্তনের।
বদলের—সবকিছু বদলে যাবার। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

ফলে তিনি ছুটে যেতে চেয়েছেন "শহরে শহরে গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরতে।" কারণ, তিনি জানেন সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না, সুযোগ নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হয়। যেমন গড়ে নিতে হয় নিজেই নিজেকে।

বস্তুত, "ইবসেনের নাটকগুলোর উপস্থাপন, চরিত্রায়ণ সাদামাটা হলেও সব মিলিয়ে এই সাধারণই একসময় অসাধারণ হয়ে ওঠে। নাটক যে সমাজকে উপস্থাপন করে, সেটিও নূতনভাবে দর্শকদের উপলব্ধি করান তিনি। ইবসেনের আগে নাটকে রাজা-রানি, বাদশা,

বেগম, সেনাপতি—অর্থাৎ বীর ও অভিজাত শ্রেণির চরিত্র চিত্রায়ণ করা হতো। কিন্তু জনজীবন উপস্থাপিত না হয়ে উপেক্ষিত থাকত। ইবসেন সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, সমাজস্থ অসংগতি ও নারীদের যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে" (ফরিদ, ২০১৬)। সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটকের চরিত্রনির্মাণ প্রসঙ্গেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। *অপেক্ষমাণ* কাব্যনাটকটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

তিন

হেনরিক ইবসেন তাঁর বিখ্যাত *এ ডলস হাউস* নাটকটি তিনটি অঙ্কের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। কিন্তু তার মধ্যেই যুক্ত করেছেন গ্রিক পঞ্চাঙ্ক নাটকের ব্যঞ্জনাসূত্র। অন্যদিকে তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকটিও রচিত হয়েছে তিনটি অঙ্কের কলেবরে। আবার *ঈর্ষা* নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে তিনটি চরিত্রের সাতটি বৃহৎ সংলাপের মাধ্যমে। সৈয়দ শামসুল হক অবশ্য *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রচলিত নাট্যফর্ম মেনে কোনও অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজনে যাননি। বরং একটি দৃশ্যের মধ্যেই পুরো নাটকটি সমাপ্ত করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন নাটকের চরিত্রগুলো এখানে কেবল সংলাপ প্রক্ষেপণের নান্দনিকতায় স্বকীয় হয়ে উঠেছে। তিনটি বৃহৎ কলেবরের নাটককে একই দৃশ্যে মঞ্চায়নের এমন অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) আয়োজিত ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে *অপেক্ষমাণ* নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয়। নাটকটি প্রযোজনা করে *নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়*; পরিচালনা করেন নাট্যজন আতাউর রহমান; তিনি এ নাটকটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র প্রৌঢ়ের ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এছাড়া এ নাটকের নারীচরিত্রে অভিনয় করেন অপি করিম ও যুবক ডাক্তার চরিত্রে অভিনয় করেন পান্থ শাহরিয়ার। বলাবাহুল্য পরিচালকের নির্দেশনার দক্ষতায় এবং অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাটকের এমন অনন্য সংমিশ্রণের অভিনবত্ব প্রত্যক্ষ করে ঢাকার দর্শক মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। এই জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় নাটকটি ২০১০ সালে মিশর আর্ন্তজাতিক নাট্যোৎসবে উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ পায়। এ সময়ে নাটকটির সমকালীনতা নিয়ে নির্দেশক আতাউর রহমান নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

> নাটকটির মধ্যে বর্তমান সময়ের অনেক কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এর আবেদন অনেক বেশি। এজন্য দর্শকের কাছে সহজে পৌঁছে যায়। গতবছর ঢাকায় ইবসেন নাট্যোৎসবে এর প্রথম মঞ্চায়ন হয়। তখন মিশরের শিল্পকলার একজন কর্মকর্তা ঢাকায় নাটকটি দেখে যান। তিনিই আমাদের নাটকটি নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল এ উৎসবে আমন্ত্রণ করেছেন। (আতাউর, ২০১০)

অপেক্ষমাণ নাটকের মঞ্চসফলতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন :

> আমার *রক্তকরবী* নাটকটি দেখে শম্ভু মিত্র মঞ্চে উঠে এসে তাঁর বিমোহিত হওয়ার কথা দর্শকদের সামনে জানিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, এ নাটকটিও তেমন একটি প্রযোজনা হবে। (আতাউর, ২০০৯)

অন্যদিকে, নাটকটির অন্যতম প্রধান চরিত্র নারীর ভূমিকায় অভিনয় করা নাট্যঅভিনেত্রী অপি করিম এ নাটকটিতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এক আলাপচারিতায় জানান :

> নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়েছিল গত বছরের নভেম্বরে। সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইবসেন উৎসবে। হেনরিক ইবসেনের দুটো নাটক *এ ডলস হউস* ও *অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল* এবং সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য *ঈর্ষার* সমন্বয়ে এ

নাটকটি রচনা করা হয়েছে। এ নাটকে আমি অভিনয় করেছি নোরা ও যুবতী চরিত্রে। গত বছরের নভেম্বর মাসে আমরা *রক্তকরবী* নিয়ে কায়রো উৎসবে গিয়েছিলাম। সে উৎসব থেকে ফিরেই এ নাটকটির কাজ ধরতে হয়েছিল। মাত্র ১২ থেকে ১৫ দিন সময় পেয়েছিলাম আমরা। এত অল্প সময়ে একটি মঞ্চনাটক তৈরি করে প্রদর্শন করা খুবই কঠিন কাজ। তবু আমরা সেই কঠিন কাজটাকে সত্যি করেছি। এই নাটকে একই সঙ্গে দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। এটা সত্যি কঠিন কাজ। দুটি চরিত্রের পোশাক-আশাক, মানসিক অবস্থা, স্বভাব, সংলাপ সবই ভিন্ন। রাতদিন খেটে আমাকে এই নাটকের জন্য তৈরি হতে হয়েছে। তবে মূল রচনাগুলো আমার পড়া ছিল বলে কিছুটা উপকার পেয়েছি। প্রচণ্ড ভয়ে ছিলাম সংলাপ মুখস্থ করা নিয়ে। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত টানা আমাদের কাজ করতে হয়েছে। (আতাউর, ২০০৯)

চার

অপেক্ষমাণ নাটকের ভাষানির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকার নূতন করে সংলাপ লিখেছেন কম, বরং ইবসেন থেকে রূপান্তর করেছেন বেশি। আবার, নিজের লেখা পুরাতন নাটকের ভাষা বা সংলাপ হুবহু তুলে ধরেছেন। ফলে, এ নাটকের সংলাপে শিল্পের কারুকাজ—উপমা, অলঙ্কারের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম চোখে পড়ে। *ঈর্ষা* নাটকের যে অংশ তিনি হুবহু তুলে ধরেছেন, সে অংশের ভাষার যে অপরূপত্ব, তার নূতন করে আলোচনা আমরা বাহুল্য মনে করছি। তবে হেনরিক ইবসেনের রচনা দুটি তিনি অনুবাদ করলেও তাকে এ-কাল ও সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তিনি সাজিয়েছেন। ফলে এ অংশগুলোতে ভাষার চমক, শব্দের নূতনত্ব, অলঙ্কার ও উপমার প্রয়োগ বেশ চোখে পড়ে। আর যেসব এলাকা তিনি নূতন করে বিন্যস্ত করেছেন সেখানেও তাঁর অনন্যতা দৃষ্টি এড়ায় না। এ নাটকে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেছেন। নাটকে সূত্রধার বা কোরাস হিসেবে ব্রেকডান্সারের দল যে গান ও নাচ পরিবেশন করেছে মঞ্চে, বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে তাও অভিনব ঘটনা। আধুনিক রক গানের ধাঁচে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন এবং তরুণসমাজে তুমুল জনপ্রিয় ব্রেকডান্সকে মঞ্চনাটকে উপস্থাপনের সম্ভাব্যতা তিনিই প্রথম ভেবেছেন। মূলত এমন সংগীত পরিবেশনা এবং নাচের মাধ্যমে তিনি নাটকে একটি পাশ্চাত্য ধাঁচের আবহ ও শিহরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

নাট্যকার ব্রেকডান্সার চরিত্রের উপযোগী করে যে সংগীত রচনা করেছেন রক ধাঁচে, সেখানে তিনি স্বভাবতই কোনও নির্দিষ্ট সুর সংযোজন করেননি। তিনি চেয়েছেন ব্রেকডান্স যেমন তারুণ্যের উদ্দীপনায় হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হয় এখানেও তেমনটা বজায় থাক। তিনি এমন করে পঙক্তির মাত্রা নির্ণয় করেছেন, শব্দের মালা গেঁথেছেন, যাতে পেশাদার না হলেও এ গান মঞ্চে ঠিকই পরিবেশন করা যায়, এবং ধ্বনিঝংকারে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যায়। ফলে আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাসের ঝংকারে গানগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন—

হো হো ইবসেন
হেনরিক ইবসেন॥ [...]
দৃশ্য দৃশ্য
পুতুলের সংসার করে অবিমৃষ্য—
অবিমৃষ্য
আরো এক নাটকের সেই এক ব্যক্তি
ব্যক্তি ব্যক্তি
জনতার শত্রু সে চিহ্নিত হয় হোক হেনরিক ইবসেন ইবসেন
হো হো ইবসেন
হেনরিক ইবসেন
হেনরিক ইবসেন ইবসেন

সত্যের পক্ষেই তার অভিব্যক্তি
বলেছেন
হো হো ইবসেন
হেনরিক ইবসেন॥ (শামসুল, ২০১৬ : ৫০২)

এখানে স্পষ্টতই অনুমান করা যায় ধ্বনিমাধুর্যে, শব্দের সুষমবিন্যাসে সংগীতের ভাষা কতটা উপযোগী এবং শিল্পমাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে। যেহেতু এটি কোরাসের পরিবেশনা, তাই মূল পঙক্তির পরে আবার সে লাইন থেকে শব্দের পুনরাবৃত্তি সুরের লালিত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, সংগীতের ব্যবহারটি ঠিক নাটকে কেমন হবে, তা নিয়েও নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনাটি নিম্নরূপ—

সঙ্গীতের সঙ্গে তারা ব্রেক ডান্স শুরু করে।
সেই সঙ্গে গানের কথাগুলো শ্রুত হয়।
গানের কথাগুলোতে খুব একটা সুর দেবার দরকার নেই। ১-২/১-২ মাত্রায় আবৃত্তির মতো করেও বলা যেতে পারে। মূল ব্যাপারটা হবে ব্রেক ডান্সের ড্রাম ও কী বোর্ডের সঙ্গীত নির্ভর। দলটি নেচে চলে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০১)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্যমান নাটকে হেনরিক ইবসেনের মূলরচনা থেকে প্রায়ই হুবহু অনুবাদ করলেও তাঁর মতো জাত কবির হাতে পড়ে তা আরও প্রাঞ্জল ও নান্দনিক হয়ে উঠেছে। আবার, কাহিনির বুননের কারণে তিনি কিছু সংলাপ কাটছাঁট করে রচনা করেছেন; সমকালীনতা বজায় রাখতে অনেককিছু বদল করেছেন। যেমন—নোরা ও তার স্বামী যখন ধর্মীয় বিধি-নিষেধ নিয়ে আলাপ করেছে, তখন তারা খ্রিষ্টধর্মাচার, যাজক, পাদ্রি, চার্চ প্রভৃতি অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছে। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক যখন সেটিকে অনুবাদ করেছেন তখন বাঙালি মুসলিম সমাজের ধর্মাচার এবং শিষ্টাচার মাথায় রেখেই তা করেছেন। যেমন—*এ ডলস হাউস* নাটকে হেলমার যখন নোরাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে আটকাতে চেষ্টা করে তখন নোরা বলে :

নোরা ॥ ধর্ম বলতে কী বোঝায় তা আমি সত্যিই জানিনে। [...] বিয়ের সময় যাজক হ্যানসেন আমাকে যা বলেছিলেন সেটাই আমি কেবল জানি—তিনি আমাকে বলেছিলেন ধর্ম বলতে এই বোঝায়—ওই বোঝায়। এখান থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়ানোর পরে আমি দেখতে চাই যাজক হ্যানসেন ঠিক কথা বলেছিলেন কি না; অন্তত, তিনি যা বলেছিলেন সে কথা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না।
হেলমার ॥ তোমার মতো যুবতীর মুখে এইরকম কথা শোনার কল্পনাও কেউ কখনও করেনি। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৮৫)

অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে এ কথালাপ ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে, যেখানে সুস্পষ্ট হয়েছে সাধারণ বাঙালি মুসলিম পরিবারের শিষ্টাচার, জীবনাদর্শ :

স্বামী। এত বোঝো, আর এটুকু বোঝো না যে তোমার স্থান হচ্ছে তোমার সংসারে। হ্যাঁ, সংসারেই। [...] হাদিস কোরান, গীতা বাইবেল, মানে ধর্ম—তোমাকে শেখায়নি?
স্ত্রী। শুনতে তোমার হয়তো খারাপই লাগবে—ধর্মটা যে কী, আমি ঠিক বুঝি না। [...] ধর্ম তো এই—মোল্লারা যা বলে, পাদ্রীরা যা বোঝায়, যা ব্যাখ্যা করে! এবার আমাকে নিজের মতো করে বুঝতে হবে। জীবনের পাঠ নিয়ে দেখতে হবে সত্যটা আছে কোথায়। আমাকে জানতেই হবে মোল্লারা যা বলে তার কতখানি সত্য, আর কতটা মনগড়া। বা, ওরা যা বলে তা আমার বেলায় খাটে কিনা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৫)

আবার *এ ডলস হাউস* নাটকের হেলমার চরিত্রের (*অপেক্ষমাণে* পুরুষ চরিত্র) মুখে আরবি শব্দমিশ্রিত সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন তিনি। নোরা বা নারী যখন তাকে জানিয়েছে মোল্লা-নির্ধারিত ধর্মে তার আপত্তি আছে, সে নিজের ধর্ম-কর্ম নিজেই বুঝে নিতে চায় বাস্তবতার নিরিখে তখন হেলমার তথা স্বামী চরিত্রটি জানিয়েছে : "স্বামী। তওবা করো, তওবা করো। মানুষ তোমার মুখে থুতু দেবে।" (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৫)

সৈয়দ শামসুল হকের কবিমানসের অনেকটা জুড়েই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর প্রায় রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি কিংবা রচনার অংশবিশেষ জুড়ে দিয়েছেন। *ঈর্ষা* কাব্যনাটকেও প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান কিংবা কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হতে দেখা যায়। *অপেক্ষমাণ* নাটকেও রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার চরিত্রটি যখন বলেছে—একা মানুষেরই কোনও ভয় থাকে না। পিছুটানহীন মানুষই পারে নির্ভীক চিত্তে মিথ্যের মোড়কে জড়ানো সমাজের সঙ্গে অকুণ্ঠ চিত্তে লড়ে যেতে, তখন প্রৌঢ় চরিত্রটি তাকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্য নাট্যচিন্তার সঙ্গে প্রাচ্যকবি রবীন্দ্রনাথের এই মেলবন্ধন নাটকটিকে করে তুলেছে অনন্যস্বাদী। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে :

> পুরুষ। একা মানুষেরই কোনো ভয় থাকে না।
> তবে, একা হয়ে ওঠাটাই যা মুশকিল।
> সবাই পারে না। সবার কাছে একা মানেই—অসহায়।
> আমার কাছে নয়। আমি এটা আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি।
> প্রৌঢ়। ও! আপনি তাহলে সেই গানের লোক—মুশকিলে ভরসা দিতে চান?
> 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে!' (শামসুল, ২০১৬ : ৫২২)

মূল *এন এনিমি অব দ্য পিপলে* যখন ডাক্তার স্টকম্যান, মেয়র পিটার স্টকম্যান ও জনতা সভামঞ্চে মুখোমুখি হয়েছে, তখন জনতার বাক্যালাপ ছিল উত্তর-প্রত্যুত্তরধর্মী; একটি সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারীরা যেমন নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে বা বক্তাকে প্রশ্ন করে ঠিক সেরকম। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক যখন এ অংশটি অনুবাদ করেছেন তখন এদেশীয় ঝাঁজ বজায় রেখেছেন। বাংলা অঞ্চলে সাধারণ জনতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো—কোনও কিছু পছন্দ না হলে 'ভূয়া ভূয়া' বলে দুয়োধ্বনি তোলা। আবার, এদেশের মিছিলের জনপ্রিয় স্লোগানগুলোকেও নাট্যকার নাটকে উপস্থাপন করে পাশ্চাত্যের একটি নাটককে এদেশীয় সামাজিক বাস্তবতায় ঢেলে সাজিয়েছেন। যেমন :

১. জনতা। ভূয়া! ভূয়া!
ভূয়া ভূয়া! (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)
২. রাজধানীর গোড়াতে — আগুন জ্বালো।
জ্বালো জ্বালো — আগুন জ্বালো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)
৩. চলো চলো — রাজধানী চলো।
ষড়যন্ত্রের গোড়া মারো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)
৪. ডাক্তারের চামড়া — তুলে নেবো আমরা।
ডাক্তারের চামড়া — তুলে নেবো আমরা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৬)
৫. জুতা মারো তালে তালে।
জুতা মারো দুই গালে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৭)

এছাড়াও *অপেক্ষমাণ* নাটকের ভাষায় ব্যবহৃত কিছু নান্দনিক অলঙ্কার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, রূপক-প্রতীক, প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

উপমা :

১. এক নারী মঞ্চের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মতো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৩)

২. রাগ? রাগ তো পানির মতো।
আগুন পেলে টগবগ করে ফোটে,
কিছুক্ষণ পরেই ঠান্ডা হয়ে যায়। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৭)

৩. যারাই মিথ্যার সঙ্গে বসবাস করে, জনতাকে ভুল পথে নিয়ে যায়,
আপন স্বার্থে ব্যবহার করে—
মহামারীর বীজাণু ছড়ানো কীটের মতো তাদের মেরে ফেলা উচিত। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৩)

উৎপ্রেক্ষা :

১. খাতার ওপরে কামরুল তাঁর দ্রুত হাতে কলমের টান দিয়ে
চলেছেন—
আকঁছেন হীরামন পাখির শরীর, তার ঠোঁট, তার পালক, বিশাল আকাশ—
কামরুল এঁকে চলেছেন—
মেয়েটির বিস্ময়ভরা চোখের সমুখে যেন ঘটে যাচ্ছে
ইন্দ্রজাল! (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৮)

চিত্রকল্প :

১. ভাবছি এবার থেকে প্রকৃতির ছবি আঁকবো।
যেমন ওই যে অসাধারণ ভোরের কথা বললাম,
বিস্তীর্ণ পাথারের ওপর সূর্য উঠছে।
একটু একটু করে কাঁটাবন, শস্যকাটা মাঠ,
শুকনো খড়ের স্তূপ, রুখো মাটি,
ভোরের রক্তমাখা আলোয় ফুটে উঠছে, আঁকবো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৬)

রূপক/প্রতীক :

১. এ তো আর আজকের দিনের হালকা পল্কা দরোজা নয়।
ওক কাঠের দরোজা, ঊনবিংশ শতাব্দীর। কঠিন! [...]
সমাজটার মতোই! (শামসুল, ২০১৬ : ৫২০)

২. আমি অবাক হয়ে যাই কীভাবে মৃতের শাসনে জীবিতেরা আজ পড়ে আছে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩২)

সমাসোক্তি :

১. হ্যাঁ, রক্ত! মিথ্যার আঘাতে সত্যের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৩)

২. জীবনের মিথ্যা তোমাকে শিল্পের মিথ্যা করে তুলবে।
তোমার ছবি হবে প্রতারক—হবে অশুদ্ধ—দূষিত। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৫)

বাগধারা/ প্রবাদ/ প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. একা হয়ে যেতে হয় সত্যের সম্মুখেই
শক্তিটা আছে শুধু সত্যেই— (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৩)

২. নারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত শব্দটা অচল, বিস্ময়কর? (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৮)

৩. সেটা হচ্ছে রাজধানীর মতলবী ফাঁদ। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)

৪. ডাক্তারের কাজ শুধু রোগের চিকিৎসা করা নয়, ডাক্তারের প্রথম কাজ—আমার বিবেচনায়—
রোগের কারণ নির্মূল করা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৯)

৫. পিলে চমকে ওঠে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩০)

৬. সত্যের পক্ষে যারা তারা চিরকালই সংখ্যালঘু— (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

৭. শক্তি তাদেরই হাতে যারা সত্যমিথ্যা বিচার করতে পারে,
ভালো মন্দ স্পষ্ট করে নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

৮. সত্য কাউকে মুকুট পরায় না। সত্য মানুষকে বিকশিত করে।
সত্য মানুষকে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে দেয়। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

পাঁচ

হেনরিক ইবসেন ছিলেন নরওয়েজিয়ান সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। অবশ্য তিনি তাঁর মহৎ রচনাপঞ্জি ও দূরদর্শী শিল্পদৃষ্টির জন্যে দেশকালের গণ্ডি ছাপিয়ে হয়ে উঠছেন বিশ্বজনীন। শিল্প এবং সমাজের যুগপৎ অবস্থান তাঁর নাট্যরচনার একটি বিশেষ প্রবণতা। প্রচলিত ভিক্টোরীয় সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও বিবিধ অসঙ্গতি বাস্তবতার নিরিখে তাঁর নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে। এসকল গুণই হেনরিক ইবসেনকে সাধারণের চোখে অসাধারণ করে তুলেছে। বস্তুত, "তিনিই প্রথম সমালোচকের দৃষ্টিতে সমাজকে দেখে নাটকের সমাপ্তিতে বৈচিত্র্য আনেন। অর্থাৎ ইবসেনই প্রথম নাট্যকার, যিনি ইউরোপীয় নাট্য ঐতিহ্যের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে নাট্য রচনা করেন। এ জন্য তাঁকে মানুষের কথা ও সমালোচকদের তীক্ষ্ণ তীরও হজম করতে হয়েছে। [...] প্রথমে তাঁর চিন্তা ও কর্ম বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হলেও পরবর্তী সময়ে সেই চিন্তাগুলোই সমগ্র ইউরোপে ও পরে বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে" (ফরিদ, ৩ জুন ২০১৬ : সাহিত্য পাতা)। বাংলাদেশেও সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে হেনরিক ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব; যাকে ঘিরে এদেশের প্রথিতযশা নাট্যকারগণ হেনরিক ইবসেনের বিভিন্ন বিখ্যাত নাট্যকর্ম অনুবাদ করেছেন এবং দেশের স্বনামধন্য নাট্যদলগুলো সেসব নাটক মঞ্চে পরিবেশনায় ব্রতী হয়েছেন। ফলে এদেশের নাট্যামোদী দর্শক ভিনদেশি এ নাট্যকারের দর্শন ও সমাজবোধের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। তবে সৈয়দ শামসুল হক এ ধারায় নিঃসন্দেহে অনন্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নাট্যজন আতাউর রহমানের অনুরোধে ইবসেনের নাটকের রসনির্যাস গ্রহণ করে তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনাবৃত্তিকে বহুদূর প্রসারিত করেছেন এবং তিনটি নাটকের মূলসার সমীকৃত করে সৃষ্টি করতে পেরেছেন কালজয়ী মৌলিক কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণ*। এ-নাটকে সৈয়দ হক নাট্যপ্রতিভার যে-স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন তার দ্বিতীয় স্বাক্ষর বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে বিরল।

টীকা

১. এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে আতাউর রহমান বলেন : "ইবসেনের উৎসবে নাটক মঞ্চায়নের কথা বলা হলে মাথার মধ্যে একটা ভিন্ন কাজ করার পরিকল্পনা আসে। সেই মতো সৈয়দ শামসুল হককে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী এভাবেই নাটকটি লেখার অনুরোধ করি।" (দ্রষ্টব্য : আতাউর রহমান, *'রক্তকরবী থেকে অপেক্ষমাণ'*, "আনন্দ পাতা", *দৈনিক প্রথম আলো*, সম্পাদক : মতিউর রহমান, ঢাকা, ১২ নভেম্বর, ২০০৯)

২. মূল কাব্যনাটকের সব উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬ গ্রন্থ থেকে।

৩. আলোচনায় ব্যবহৃত *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের সব উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে খায়রুল আলম সবুজ অনূদিত *এন এনিমি অব দ্য পিপল*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ গ্রন্থ থেকে।

৪. হেনরিক ইবসেনের *এ ডলস হাউস* নাটকের যাবতীয় উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে সুনীল কুমার ঘোষ অনূদিত এবং সম্পাদিত *ইবসেন নাট্য-সম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*, সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৮৩ গ্রন্থ থেকে।

সহায়কপঞ্জি

আতাউর রহমান (২০০৯)। 'রক্তকরবী থেকে অপেক্ষমাণ'। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, আনন্দ পাতা, ১২ নভেম্বর।

(২০১০)। প্রতিবেদন : 'কায়রো নাট্য উৎসবে বাংলাদেশের দুই নাটক'। বাংলানিউজটোয়েন্টি ফোর.কম, ঢাকা, লাইফস্টাইল, ৯ অক্টোবর।

খায়রুল আলম সবুজ (অনূ., ২০১৮)। *এন এনিমি অব দ্য পিপল*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

জাকির তালুকদার (২০১৬)। 'সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্য : শক্তিকেন্দ্রের সন্ধানে'। *পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, শামসুজ্জামান খান সম্পা., বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ফরিদ হাসান (২০১৬)। 'হেনরিক ইবসেন : প্রথা ভাঙার নাট্যকার'। *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, সাহিত্য পাতা, ৩ জুন।

সুনীল কুমার ঘোষ (সম্পা., ১৯৮৩)। *ইবসেন নাট্য-সম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*। সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা।

সৈয়দ শামসুল হক (সম্পা., ২০১৬)। *কাব্যনাট্যসমগ্র*। চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রাসঙ্গিকতা (১৯৬০-১৯৮৩)

উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এলাকা জুড়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম যেখানে বাঙালি ছাড়া ছোট বড় প্রায় ১৪টি আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করছে কিন্তু ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তাদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর। মূলত তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অব্যবস্থাপনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুকাল থেকে প্রবর্তিত ও প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি গঠিত হলেও ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে যখন অনেক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়ে যায় তখন তারা সবাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়েছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বেই তখন পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নিজেদের উদ্যোগে অনেক অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। তিনি জুম্মগোষ্ঠীর মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার করেছিলেন এবং শিক্ষাকে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল অনেক বেশি। এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এটি বর্ণনামূলক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে। আলোচ্যমান প্রবন্ধে এম এন লারমার উদ্যোগে কীভাবে পার্বত্য চট্টগামে শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল; তিনি কী কী অবদান রেখেছেন শিক্ষাবিস্তারে এবং এক্ষেত্রে আগত প্রতিবন্ধকতাসমূহের বর্ণনাসহ জুম্ম ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি তাদের জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি ও মুক্তি আন্দোলনে এম এন লারমার ভূমিকা অন্বেষণ করা হয়েছে।]

সূচনা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এবং নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাদেশের অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২, ২০২২ : ১)। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত এই পার্বত্য অঞ্চলে বৃহত্তর বাঙালি ছাড়াও এখানে ১৪টি সংখ্যালঘু জাতি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে (মনোজ বাহাদুর, ২০১৬ : ৭)। বাংলাদেশ সংবিধানে তাদেরকে 'উপজাতি' (বাংলাদেশ সংবিধান, পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার অন্যতম কারণ হল সংখ্যাল্পতা ও বাঙালির কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনামলে এবং পাকিস্তান আমলে জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। পাশাপাশি সেখানে আধুনিক শিক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল অনেক পরে—যার অন্যতম কারণ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এই শাসকগণ নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য চাইতো না যে সাধারণ প্রজারা

*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা ৯২০৮।

লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক। অথচ তারা নিজেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিল (শরদিন্দু শেখর, ২০০২ : ১৫)। মূলত ১৮৬০ সালে এটি একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করেছে এবং বর্তমানে এখানে ২৬টি উপজেলা ও ৭টি পৌরসভা রয়েছে। এখানকার নদী, ঝর্না, পাহাড় ও বনাঞ্চল-ই অঞ্চলটিকে একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে (মন্ত্রণালয়ের পটভূমি, ২০২২) কিন্তু স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে গঠিত হলেও ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এখানে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। তবে অল্পসংখ্যক প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনামলে যা ছিল মূলত উচ্চ-শ্রেণি তথা রাজপরিবারের জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল হলো 'চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল'[১]; যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাঙ্গামাটিতে ১৮৬৩ সালে (W W Hunter, 1909 : 99)। হাচিনসনের মতে, তখন এই বোর্ডিং স্কুলে প্রায় ৫০ জনের মত আদিবাসী ছাত্র ছিল, যারা সেখানে থেকে পড়াশুনা করত এবং সরকার তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিল (R. H. Sneyd Hutchinson, 1906 : 77)। কিন্তু সেসময় ছাত্রের অভাবে, যাতায়াতের অসুবিধা ও সচেতনতার অভাবে বান্দরবান ও মানিকছড়িতে প্রতিষ্ঠিত অন্য দুইটি বোর্ডিং স্কুল ১৮৭১ সালেই বন্ধ হয়ে যায় (মং শানু চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ২০২০)। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ সেসময় তাদেরকে সচেতন করার কাজে উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছিলেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, লারমার বাবা চিত্ত কিশোর লারমা এবং চাচা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের স্বার্থের কথা না ভেবে এবং জনমত যাচাই না করেই রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করে যার সমাপ্তি হয় ১৯৬০ সালে। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধের পরেও অনেক আদিবাসী বাবা-মা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব বেশি সচেতন ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা[২]জানান—

> তিনি যখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছেন তখন অনেক আদিবাসী বাবা-মা তার বাবা-মাকে বলেছিলেন যে, তোমাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কী করবে? ওরা তো দূরে থাকবে, বাবা-মা'র খোঁজ নিবেনা বরঞ্চ আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমাদের কাছে থাকবে, আমাদেরকে কাজ করে খাওয়াবে। (মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২০২০)।

কাপ্তাই বাঁধের কারণে মানুষের উপর সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব এবং তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সামন্ত নেতৃত্বের অপারগতার কারণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন পাহাড়ি জনগণদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, শিক্ষালাভের বিকল্প নেই। মূলত ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের পর সবাই সচেতন হয়ে একসাথে শিক্ষা গ্রহণের যে চেতনা তা বৃদ্ধি পেয়েছিল; তারা ভেবেছিল যে, লেখাপড়া করতে হবে, কেননা তাদের আর পূর্বের মত করে থাকার অবস্থা নেই (মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২০২০)। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালের দিকে লারমার সাথে একত্রিত হয়ে অন্যান্য পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ অনেক অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন—যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী যেন শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেসকল ছাত্ররা কলেজে পড়াশুনা করত তারাও নিজ নিজ গ্রামের স্কুলগুলোতে তখন শিক্ষকতা করত, বাবা-মা'কে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে উৎসাহ প্রদান করত। ফলে সকলের মধ্যেই তখন সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই ১৯৬৬ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিতের হারও বৃদ্ধি পায় (আলীউর, ২০১৫ : ৩৭৩-৩৭৪)। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বেই আদিবাসী ছাত্ররা ১৯৬৬ সালে ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে বাঙালিদের সাথে একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। আর এভাবেই তিনি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় বাংলাদেশের সকল পাহাড়িদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামে এম এন লারমার রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে গবেষণা হয়েছে কিন্তু সেখানে তার উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার প্রসঙ্গে কোনও বিস্তারিত গবেষণা ইতোমধ্যে হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট আদিবাসীর সংখ্যা হল ১৬,৫০,১৫৯ জন, যার মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাস করছেন শতকরা ২.৯৯ ভাগ (Population and Housing Census Preliminary Report-2022 : 10)। আলোচ্যমান প্রবন্ধের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল এবং পাহাড়িদের মধ্যে পরবর্তীকালে শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা পর্যালোচনা করা। তবে বিশেষভাবে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে প্রবর্তিত হয়; কীভাবে এই শিক্ষার তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তার ঘটে; এক্ষেত্রে তার অগ্রণী ভূমিকা কী ছিল তা পর্যালোচনা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় বিবরণ ও বিশ্লেষণ দুই-ই স্থান পেয়েছে। এখানে একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মূলত এটি বর্ণনামূলক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে আর এই পদ্ধতিতে পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলা হয়। এই গবেষণার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এই গবেষণায় প্রাথমিক ও সহায়ক দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত সংবিধান, জনশুমারি ও গৃহগণনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য, রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারসমূহ এবং কিছু কিছু সাক্ষাৎকার যা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও জার্নাল ইত্যাদি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিচয়

রাঙ্গামাটি শহর থেকে কিছুটা দূরে মহাপুরম (মাওরুম) নামক একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরাই ছিলেন সংস্কৃতিবান শিক্ষক। তার বাবা শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমা, যিনি ছিলেন মহাপুরম জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি একাধারে ছিলেন মানবতাবাদী, সমাজসেবী ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী। তিনি চেয়েছিলেন সামন্তবাদে নিমজ্জিত ও পশ্চাৎপদ জুম্ম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। মাতার নাম সুভাষিনী দেওয়ান, যিনি ছিলেন স্নেহময়ী ও ধর্মানুরাগী। তিনিও পড়াশুনা পছন্দ করতেন। তৎকালে তাদের বাড়িতে একাধিক ছাত্র সারাবছর থেকে খাওয়া-দাওয়া করে পড়াশুনা চালিয়েছে। ব্যক্তি জীবনে এম এন লারমা ছিলেন ভদ্র, নম্র, ক্ষমাশীল, সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং মৃদুভাষী ব্যক্তি। তার স্মরণশক্তি ছিল অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তিনি সৃজনশীল মননের অধিকারী ছিলেন (জয়ীতা, ২০১৪ : ৩৫)। মূলত তিনি এবং তার ভাই-বোনেরা এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিবারের গুরুজনদের কাছ থেকে বাস্তব জীবনের শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, রাজনৈতিকচেতনাসহ সংগঠন গড়ে তোলার শিক্ষাও অর্জন করেছিলেন। লারমার ছোট ভাই সন্তু লারমা শিক্ষাজীবনে মাতা-পিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন—

> পিতা শুধু একজন শিক্ষকই নন। তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একজন রাজনীতিবিদ, আর অন্যদিকে তিনি একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। [...] তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। (সজীব, ২০১৬ : ৪৭)

এম এন লারমা ছোটবেলা হতেই পড়াশুনা করতে বেশি পছন্দ করতেন। পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ প্রসঙ্গে তার বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা জানান—

> স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও মঞ্জু গল্পের বই পড়তো সবসময়, এই অভ্যাসটা প্রথম শ্রেণি থেকেই ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ে বাবা কলকাতা থেকে ডাকযোগে বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা এনে দিতেন। পত্রিকাগুলোর মধ্যে মাসিক *বসুমতি*, *শুকতারার* নাম মনে পড়ে। এসবই মঞ্জু গভীর আগ্রহ সহকারে পড়তো। বৃত্তির টাকা দিয়ে বই কিনত। প্রয়োজনে বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে সে নিজেই বই সংগ্রহ করত। এভাবে তার নিজের সংগ্রহেই অনেক বই পত্র ছিল। (জ্যোতিপ্রভা, ২০১৪ : ১০)

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে এম এন লারমার অবদান

কর্ম ও পেশাগত জীবনে তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। তবে শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল অনেক বেশি, কেননা তিনি খুব সহজে কঠিন বিষয়কে সহজ-সরলভাবে বোঝাতে পারতেন। এছাড়াও তিনি ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি তাদেরকে দেশপ্রেমের চেতনাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এম এন লারমা সর্বদা ছাত্রদের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য গঠনমূলক আলোচনা করতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তবে তিনি যে বিষয়ে আলোচনা করতেন, আবার সপ্তাহ খানেক পর সে বিষয়ে তাদের থেকে জানতে চাইতেন। লারমা নিজে অনেক বই পড়তে ভালবাসতেন তাই তিনি তার ছাত্রদেরকেও বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে বলতেন। বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখতে বলতেন, যেন তারা বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় এবং সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়। তিনি একাধারে নিজ দেশের সংগ্রাম, আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি চীন, ভিয়েতনাম ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সংগ্রাম ও আন্দোলন সম্পর্কেও বলতেন যেন তারা অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়। সেসময় পাহাড়ি ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এভাবেই তিনি ছাত্রদের কাছে প্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি এম এন লারমা ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি; তাই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসা অর্জন করেছেন। ১৯৬৮ সালে তিনি যখন দিঘীনালা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তখন তিনি স্কুল হোস্টেলে থাকতেন। সে সময় স্কুলে আসার পথে নদী পারাপারের জন্য একটি ব্রিজ নির্মাণাধীন ছিল যেটিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল বাঙালিরা। তখন নদী পারাপারের জন্য কেবল একটি ডাইভারসন ছিল; ফলে ছাত্ররা যখন ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার হয়ে স্কুলে আসছিল তখন বাঙালি শ্রমিকরা প্রায় ৪০ জন ছাত্রকে আটক করে থানায় খবর দেয়। কিন্তু যখন লারমা এই সংবাদ পান তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের উদ্ধারের জন্য চলে যান এবং তাদেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি তার ছাত্রদের আপন করে নিয়েছিলেন (মেসবাহ, ২০১৫ : ৪৫৬-৪৫৭)। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষাবিস্তারের পাশাপশি জুম্মজাতি নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সচেতন হবে। আর এভাবেই আদিবাসীরা একত্রিত হয়ে শাসকদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলবে জন-আন্দোলন। শিক্ষাক্ষেত্রে এম এন লারমার ভূমিকা প্রসঙ্গে তেজদীপ্ত চাকমা অজিত তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

> জুম্ম সমাজের মধ্যে এম এন লারমা প্রথম অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষাবিস্তার ছাড়া ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে অধিকার সচেতন করা যাবে না। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন মাত্রায় শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি তৎকালীন ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করেন এবং তাদের জুম্ম সমাজের মধ্যে শিক্ষাসচেতনতা ও শিক্ষাপ্রসারে উদ্বুদ্ধ করেন; তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষার প্রচারাভিজানে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষকতার মূল

> উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকতার আড়ালে অধিকার হারা জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করা ও তাদের সুসংগঠিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন শিক্ষিত মানুষ অতি সহজে তার অধিকারগুলো চিনতে এবং নির্যাতন-নিপীড়ন, শোষণ-শাসনের ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সঠিক পথ ও মত খুঁজতে পারে। (তেজদীপ্ত, ২০১৪ : ৩৩)

তিনি এম এন লারমা প্রসঙ্গে আরও বলেন—

> তিনি (লারমা) প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে জাগ্রত করতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প হতে পারেনা। পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর ভূমিকা অগ্রগামী। (তেজদীপ্ত, ২০১৪ : ৩৩)

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদেরকে সচেতনতার শিক্ষাও দিতেন। তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তাদের চেতনাকে যেন জাগ্রত করে তোলা যায়, তার শিক্ষাও তিনি দিতেন। এই প্রসঙ্গে বিজয় কেতন চাকমা বলেন—

> মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে জীবনের সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। [...] তিনি বলতেন রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত কোন অধিকারই টিকে থাকতে পারেনা। তাই প্রথমেই জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অধিকার সচেতন করে তুলতে হবে। অন্য কিছু দ্বারা মানুষের নিকট হতে অতি সহজেই সস্তা বাহবা পেতে পারে; কিন্তু এর দ্বারা মানুষের তেমন উপকার হবে না। (বিজয় কেতন, ২০০২ : ১৫-১৬)

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে এম এন লারমার ভূমিকা প্রসঙ্গে মোনঘরের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথের বলেন—

> এম. এন. লারমা মূলত তার জ্যাঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমার কাছ থেকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনিও তার জ্যাঠার মত শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি সর্বদা শিক্ষার্থীদের অধিকার, দাবি নিয়ে সোচ্চার ছিলেন, আন্দোলন করেছেন। তাই দেখা যায় যে, তার যখন বি. এ পরীক্ষা পাশের ফলাফল পান তখন তিনি ছিলেন জেলখানাতে। মূলত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়িরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত, তাই তিনি তাদের সচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তার শিক্ষার্থীদের সর্বদা বলতেন যে, তোমরা পড়াশুনা কর এবং এর পাশাপাশি বাস্তব শিক্ষা তথা দৈনন্দিন শিক্ষা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে, যেটা দিয়ে তোমাদের জীবন চলবে। এর পাশাপাশি তিনি যখন পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ও তিনি সর্বদা পাহাড়িরা যেন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের সকল ন্যায্য দাবি-দাওয়ার কথা তুলে ধরেছিলেন। (শ্রদ্ধালংকার, ২০২০)

এম এন লারমা অনেক বড় মনের অধিকারী ছিলেন। তার যে অর্জিত জ্ঞান ছিল তা সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। যা জানতেন তা সবাইকে বলতেন। ১৯৬৫ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত তার কিছু স্লোগান ছিল যা এখনও জনপ্রিয়। যথা : 'গ্রামে ছড়িয়ে পড়', 'শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো', 'সকল জাতির অধিকার সমান' প্রভৃতি যা এখনও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৪০-১৪২)। আদিবাসীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন যে, ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ—এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না। (জুলিয়ান, ২০২০)

পাহাড়ি ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা ও জুম্মজাতির মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সূচনা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সারাটা জীবন ছিলেন বিপ্লবী ও প্রতিবাদী। জাতিতে আদিবাসী হলেও তার চিন্তা-চেতনা ছিল দেশের সকল অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন শাসনব্যবস্থা ছিল সমান্ততান্ত্রিক এবং সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ। কিন্তু তার পরিবার-পরিজনেরা সর্বদাই অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক প্রজাশ্রেণির ওপর যে শোষণ তার প্রতিবাদ করেছেন। তার জ্যাঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক। তিনি স্কুল ইন্সপেক্টর থাকাকালে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। তিনি মূলত আদিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে শিক্ষার প্রসার করেছিলেন। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, তার পরিবারের প্রায় সকলেই এই সামন্ত নেতৃত্বের বিরোধী ছিলেন এবং যারা রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তারা জুম্মবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জুম্ম সমাজে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করেছিলেন (মঙ্গল, ২০১৬ : ২১)।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিপ্লবী রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছিলেন, কেননা তিনি স্কুল জীবনেই গভীরভাবে দেখেছেন যে, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নির্মম অত্যাচার, জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এই জুম্ম আদিবাসীরা। সুদূর অতীত থেকেই এই আদিবাসীরা শোষিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শোষিত হয়েছে, '৪৭ পরবর্তীকালে পাকিস্তান শাসক কর্তৃক নির্মিত কাপ্তাই বাঁধের ফলে লক্ষাধিক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এম এন লারমা ষাটের দশকে ছাত্রদের একত্রিত করে প্রথমে রাজনৈতিকভাবে তাদের সংগঠিত করেন। তিনি ছাত্রদের পাশাপাশি যুবসমাজকেও একত্র করেন। ফলে বলা হয় যে, ষাট এবং সত্তর এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। তখন সর্বত্রই এক ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলন লক্ষ করা যায়। (মঙ্গল, ২০১৬ : ২১-২২)

প্রথমদিকে ১৯১৫ সালে পাহাড়ি ছাত্রসমাজ কর্তৃক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু স্থায়ী বেশিদিন হয়নি। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দমনের কারণে এটি ১৯৩০ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাত্রদের নিয়ে ১৯৪৫ সালে আবারও আন্দোলনের সূচনা করেন। এটিও কেবল ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মূলত তখন সামন্ততান্ত্রিক শাসক ও পাকিস্তানি প্রশাসন একত্রিত হয়ে আদিবাসীদের শোষণ করছিল। ফলে আদিবাসীদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পাহাড়ি ছাত্ররা—যারা নিজেরা সচেতন হয়ে 'স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য জেগে উঠা দরকার'—এই চেতনা নিয়ে পুনর্গঠিত করেছিল 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'। এটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল জুম্ম আদিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়সহ সকল ধরনের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করা (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯২)। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৫৬ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে এই পাহাড়ি ছাত্রসমিতিতে যোগদান করেছিলেন এবং পরবর্তী বছর ১৯৫৭ সালে সংগঠনটির বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন শুরু হলে এর কার্যক্রম পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৬০ সালের দিকে পাহাড়ি ছাত্রসমিতির কার্যক্রম তিনি নূতনভাবে শুরু করেন। তার নেতৃত্বে ছাত্রসমিতির সদস্যদের মাধ্যমে তখন ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী জাতিসমূহ—যারা শাসকগোষ্ঠীর দমন, নিপীড়নের কারণে অবলুপ্তির পথে যাচ্ছিল—তারা সকলে একত্রিত হয়। তাদের মাধ্যমেই তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রথম ও একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। (মঙ্গল, ২০১৬ : ৫)

কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি

১৯৬০ সালে যখন পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে তখন এম এন লারমা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই বাঁধ নির্মাণের যে লক্ষ্য ও নীতি তা ছিল মূলত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। তাই তিনি তখন এর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হন। যখন কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হয় তখন এম এন লারমার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন—

> ১৯৬০ সালে এই মরণফাঁদ প্রকল্প চালু হয়। এ ঘটনাটি মারাত্মকভাবে নাড়া দেয় এম এন লারমার জীবনকে, এটি হয়ে উঠে তাঁর জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। এ সময়ে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তাঁকে তাড়া করে ফিরতে থাকে এক মহাবিপদের চিন্তা। জুম্ম জনগোষ্ঠীর শিকড় ছিন্ন এবং অস্তিত্ব বিপন্ন করা এবং জুম্ম সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিলুপ্ত করার এক 'রাষ্ট্রীয়' ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পাহাড়ি জনগণসহ দেশের আপামর জনগণকে সচেতন, সক্রিয় ও সংগঠিত করার কঠিন কর্মপন্থা তিনি গ্রহণ করেন। (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৩৯)

কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে লারমা তৎকালীন স্বনামধন্য পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে প্রবন্ধ লিখেন। এছাড়া কলকাতার 'The Statesman' পত্রিকাতেও তার এই বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। যেখানে বলা হয় যে, কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প হলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার প্রকল্প (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৩৯)। এম এন লারমা মনে করতেন—এই কাপ্তাই প্রকল্প হলো পাহাড়িদের অস্তিত্বকে বিলোপ সাধনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং তাদের জনগোষ্ঠীকে নিঃস্ব করার একটি প্রকল্প যাকে তিনি পাহাড়িদের 'চিরন্তন কান্না' বলে অভিহিত করেন। মূলত তখন এই কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে সামন্ত নেতারা প্রতিবাদ করেনি এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বরং তারা পাকিস্তানি সরকারের কর্মকাণ্ডকে প্রশংসা করে। কিন্তু এসময় এম এন লারমা জনগণকে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন—

> একদিকে পাক শাসকগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের পাহাড়ি জাতি বিনাশী এ সকল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শ নির্মাণের কাজে, জুম্ম যুব শক্তিকে জাতীয় অগ্রণী বাহিনী হিসেবে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষায় অগ্রসর করার কাজে, সকল শোষণ-নির্যাতন, অশিক্ষা কুসংস্কার থেকে মুক্তির সামাজিক আন্দোলন গড়তে 'গ্রামে চলো' স্লোগান নিয়ে গ্রামঞ্চলে 'জাতীয় শিক্ষায়' স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং যুব বাহিনীকে সর্ব পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এম এন লারমা। (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৩৯)

এম এন লারমা ১৯৬২ সালে এই বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে একটি লিফলেট প্রচার করে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জায়গায় পৌঁছে দেন। এই লিফলেটটি তখন জনগণের মধ্যে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে তৎকালীন সরকার ১৯৬৩ সালে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। ১৯৬৫ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন (ঘোষণাপত্র, ২০১৪ : ৫)। কাপ্তাই বাঁধের কারণে এম এন লারমার যে শিক্ষা আন্দোলন সেটা সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল; পরবর্তীকালে যেটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। সেসময় শিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মোনঘর'-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কীর্তি নিশান চাকমা বলেন—

> ৬০ সালের পর শিক্ষা চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে চলে যায়। কারণ এসময় কাপ্তাই বাঁধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এসময় পূর্বের যে পুঁথিসাহিত্য ছিল সেটা থেকে বের হয়ে অনেক আধুনিক সাহিত্য, কবিতা, নাচ, গান ও নাটক রচিত হয়। এছাড়া এসময় শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন

> বলা হয়েছিল যে, আগে স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করতে হবে তারপর ধর্মীয় চর্চা করতে হবে। (কীর্তি নিশান, ২০২০)

এম এন লারমার নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন ও কার্যক্রম

ছাত্রাবস্থায় এম এন লারমা ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ১৯৫৬ সালে এস এস সি পরীক্ষার সময় তিনি যে হোস্টেলে থাকতেন সেখানে পরীক্ষার্থীরা যেন তাদের সুবিধা অনুযায়ী আহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে পারে, সেজন্য তিনি সহপাঠীদের নিয়ে অনশন ও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। অবশেষে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে নিয়েছিল। এছাড়াও ১৯৫৭ সালে তারই নেতৃত্বে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা 'পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা নির্মিত ১৯৬০ সালের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ছাত্র সমিতির আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। এছাড়া ১৯৬৩ সালের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন এবং পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমাদের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি প্রায় ষাট হাজার পাহাড়ি আদিবাসী দেশান্তরিত হয়। এভাবে ৬০-এর দশকে প্রায় পুরোটা সময়েই আদিবাসীদের ক্রান্তিকালীন অবস্থায় ছাত্ররা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় এম এন লারমার নেতৃত্বে (জিমি, ১৯৮৪ : ২৩-২৪)।

১৯৬২ সালে যে ঐতিহাসিক পাহাড়ি সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালের এই সম্মেলনে উপস্থিত কর্মীরা এম এন লারমার নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা তখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য তাদের সাথে আলোচনা করত। পাশাপাশি তারা তখন গ্রামের সাধারণ জনগণকেও সংগঠিত করার কাজ করত। এ সময় ছাত্ররা সামন্ত নেতাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ফলে তখন সমিতির কর্মীরা নানা ধরনের কৌশল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়; যেমন—তারা এলাকায় গিয়ে যে সকল মুরুব্বি ও হেডম্যান রয়েছে তাদের পায়ে ধরে সালাম করত। কখনও কখনও তারা নানা বিষয়ে গল্প করত। তবে বয়স্করা অনেক তর্ক করত ছাত্রদের সাথে কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তারা ছাত্রদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হয়েছিল। আর এভাবেই তখন এম এন লারমার নেতৃত্বে তাদের সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন ছাত্ররা। (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৪০, আরও দেখুন, সজীব চাকমা, ২০১৬ : ৫২ এবং মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৩)।

ঐতিহাসিক ছয় দফা : পাহাড়ি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা দাবিকে শুধু বাঙালি জাতিই নয় পাহাড়িরাও সমর্থন জানিয়েছিল। যদিও এই ৬ দফা দাবিতে কোথাও পাহাড়িদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কোনও আলোকপাত ছিল না। তবুও তারা ভেবেছিল যে, এর মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ কর্তৃক চালিত শোষণ ও নিপীড়ন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যেমন তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে; তেমনি আদিবাসীদেও দীর্ঘ লালিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। তাই পাহাড়ি ছাত্ররা তখন এম এন লারমা ও তার ছোট ভাই সন্তু লারমার নেতৃত্বে এই ছয় দফা আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন—

> গোটা পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রগতিশীল ব্যক্তিরা। এই আন্দোলনের অবদান হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ এবং বাঙালিকে একটা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এটাতো এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলন; ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে এ আন্দোলন। এদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই এই আন্দোলনের পরিবেশটা সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলন শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হয়েছে এটা বলা উচিত না। কারণ আওয়ামী লীগ এককালে ছিল একটা সাম্প্রদায়িক দল। আওয়ামী মুসলিম

লীগ একটা পর্যায়ে এসে আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে। শেখ মুজিব ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। তিনি প্রথম থেকে মুসলিম লীগে জড়িত ছিলেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে যে জাতীয়তাবাদ, আর গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন বা নেতৃত্বের যে জাতীয়তাবাদ তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। এদেশের প্রগতিশীল যে আন্দোলন অর্থাৎ বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রাম বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যেটা বামপন্থীরা শুরু করেছিলেন। তবে আন্দোলনের নেতৃত্বে থেকে একপর্যায়ে তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হন। যে কারণে হয়তো পাহাড়িদের মত সংখ্যাল্প জাতিসমূহের অধিকারটা সেখানে স্থান পায়নি। অথচ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পাহাড়িদের অধিকারের ঘোষণা থাকার কথা ছিল। কারণ নেতৃত্ব যদি বাম প্রগতিশীল হয় তাহলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এদেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার লিপিবদ্ধ থাকবে না কেন? এ কারণে যতদূর জানা যায় ১৯৬৬ সালে পাহাড়ে আদিবাসীদের মধ্যে ৬ দফা আন্দোলন তেমন ব্যাপক কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। ঐ সময়ে পাহাড়িরা নিজেদের সংগঠিত হওয়ার আন্দোলনটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৮)।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান : পাহাড়ি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

১৯৬৯ সালে সারা দেশব্যাপী যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল এর প্রভাব তখন পার্বত্য চট্টগ্রামেও পড়েছিল যদিও এটি সমতল অঞ্চল হতে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্রসহ সাধারণ জনগণও এই আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসচেতন হয়েছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ফলে পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায় ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালের এই গণ-আন্দোলনের সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি'। এটি মূলত গঠন করেছিল রাঙ্গামাটি কলেজের বাঙালি ও পাহাড়ি ছাত্ররা একত্রিত হয়ে এবং আহ্বায়ক ছিলেন অশোক মিত্র কারবারী। এই কমিটির উদ্যোগে তখন ছাত্ররা রাঙ্গামাটিতে মিছিল করে। সেটা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় বিষয় কেননা সেসময় মিটিং-মিছিলকে বলা হতো রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ। আর এই ধরনের কাজ করলেই থানায় ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন ছাত্ররা একত্রিত হয়ে সারা দেশব্যাপী পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে মিছিল করে। যদিও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির মূল নেতৃত্বে ছিলেন এম এন লারমা কিন্তু এসময় মূলভূমিকা পালন করেছিলেন সন্তু লারমা (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৯)। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন—

বর্তমানে যেমন সমতলের রাজনীতির সাথে পাহাড়িরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পূর্বে তেমন ছিল না। যেমন আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। তবে এর শাখা পার্বত্য অঞ্চলে নেইনি। পাহাড়ে এসে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি করতাম। এর কারণ ছিল বাস্তবতার আলোকে নিজেদেরকে সংগঠিত করে দেশের বৃহত্তর পরিধিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থাকা। তবে এম এন লারমা ১৯৬৮ সালে শিক্ষকতার কাজে চট্টগ্রাম আসেন। রেলওয়ে স্টেশনের কাছের এলাকাটা ছিল বিহারী বাঙালি রেল কর্মচারীদের। তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে যুক্ত থেকে। এ সময় তিনি চট্টগ্রামের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন, নিয়মিত সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন। ৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানে এম এন লারমার নেতৃত্বে শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল। পাহাড়ি ছাত্র যুবকরা এ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছিল। এর বিরুদ্ধে পার্বত্য আদিবাসীদের সমর্থন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির টানাপোড়েনে পাহাড়িরাও আন্দোলিত ছিল নানা ভাবে। একদিকে ন্যাপ, প্রগতিশীল দল, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাথে বিচ্ছিন্নভাবে কথাবার্তা চলছিল এম এন লারমার। (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৯)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তখন পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা ১৯৬৯-এর যে ১১ দফা দাবি ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছিল, যেন সকলে তৎকালীন আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারে। সেসময় মূল ভূমিকা রেখেছিলেন রাঙ্গামাটি কলেজের শিক্ষক মং শানু চৌধুরী ও

মটুলাল চাকমা। তাদের নেতৃত্বে তখন ছাত্রদের এই আন্দোলন আরও বেশি বেগবান হয়েছিল। পূর্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনা ও চিন্তা-চেতনা কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো কিন্তু '৬৯ এর এই গণআন্দোলন তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সকল স্কুল, কলেজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রথম তারা বুঝতে পারে যে তারা চাইলে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে, তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বলতে পারবে। ফলে তখন ছাত্রদের মধ্যে অনেক বেশি সচেতনতা ও উৎসাহ কাজ করেছিল এই গণঅভ্যুত্থান দ্বারা (মেসবাহ, ২০১৫ : ২০০)। এভাবে তখন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে একটি প্রভাব বিস্তার করেছিল। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে প্রায় সকল পাহাড়ি ছাত্রসহ সাধারণ জনগণ এই গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

এম এন লারমা শিক্ষকদেরকেও শিক্ষাবিষয়ে সচেতন হতে বলেছিলেন এবং শিক্ষকতায় যোগদান করতে বলেছিলেন। অংজয় মারমা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তিনি একদিন লারমার বাড়িতে গিয়েছিলেন তার আহ্বানে, বাসায় গিয়ে দেখেছিলেন লারমা খুব সাধারণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, লারমা খুব সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করতেন। তার বসবাসের জায়গাটি ছিল সাধারণ একটি ঘর যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আলাপচারিতায় লারমা তাকে পাহাড়ি আদিবাসীদের যে বঞ্চনা-দুঃখ-দারিদ্র তা বলেন এবং জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষকসমাজকে এগিয়ে আসতে বলেন (অংজয়, ২০১৬ : ৭৯-৮০)। এছাড়াও তিনি শিক্ষকদের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে চলা নির্যাতন, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হয়ে ওঠার জন্য মন্ত্র পাঠাতেন। এ প্রসঙ্গে অংজয় মারমা বলেন যে—

> কোন এক সময় তাঁর সাথে আমার একবার বান্দরবান সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারবাবু, যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্বের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। (অংজয়, ২০১৬ : ৮০)

বিজয় কেতন চাকমা ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট শিজকমুখ জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পূর্বে তিনি তার নিজের জমিতে চাষাবাদ করতেন। চাকরি করতে তার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এম এন লারমার জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানার আগ্রহে তিনি শিক্ষকতায় এসেছিলেন কেননা তিনি জানতেন লারমা তার জীবনের প্রথমদিকে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন, তার পিতাও গুণী শিক্ষক এবং তার জ্যাঠা কৃষ্ণকিশোরও পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে অনেক ভূমিকা রেখেছেন। এম এন লারমা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে—

> মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে জীবনের সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বলাবাহুল্য, মাত্র কিছুদিনের জন্য হলেও তাঁর জীবনাদর্শের শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে আমি অনেক লাভবান হয়েছি। এই সময়ে আমার কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রীকে দেখলে এবং তাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুর ব্যবহার সত্যিই আমার জন্য গৌরবের। (বিজয় কেতন, ২০০২ : ৪৪)

সহকর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার

ছাত্রদের পাশাপাশি এম এন লারমা পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক চিন্তা করতেন। তাই তিনি কর্মীদের সর্বদাই দেশ এবং দেশের বাইরের নানা ধরনের বই পড়তে বলতেন যেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হতে পারে। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সমাজ-তত্ত্ব, দর্শন, প্রাণী জগতের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, অর্থনীতির বিকাশ, অনুবাদ সাহিত্যসহ ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট বই পড়তে উৎসাহিত করতেন নিজ কর্মীদের। পাকিস্তান আমলে সমাজতন্ত্র বিষয়ক বই ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোপনে ছাত্র সমিতির কর্মীরা বিভিন্ন সাম্যবাদী মতাদর্শের বই সংগ্রহ করে পড়ত। এই বইগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল

মার্কসবাদ-লেলিনবাদ সংশ্লিষ্ট বই, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পত্রিকা *হক কথা* এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বই যেমন—*আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *চীনের আকাশে লাল তারা*, *দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন*, *রুশ বিপ্লব*, *চীন বিপ্লব*, *ভিয়েতনামের যুদ্ধ*, *ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম* প্রভৃতি (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৪)। এভাবে তিনি তার কর্মীদের ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তুলেছিলেন এবং এদের নিয়ে একত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন করেছিলেন। ছাত্র সমিতির কর্মীদের পাশাপাশি তিনি তার জনসংহতি সমিতির সদস্যদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ দিতেন। এ প্রসঙ্গে রেণী তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

> জনসংহতি সমিতির সার্বক্ষণিক কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা স্বল্প শিক্ষিত। তিনি এদেরকে নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাই তিনি দলীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এসব নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত সহকর্মীদের জন্য পার্টিতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি হাজারো কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সহকর্মীদের লেখাপড়া শেখাতেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি রাজনীতির ক্লাসও পরিচালনা করতেন। তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেক কর্মী বিভিন্ন স্থানে আজও দলীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। (রেনী, ২০১৬ : ৭৬)

নতুন নেতৃত্ব তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি

১৯৭০ সালে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীদের উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় ছাত্র সমিতির শাখা বিস্তারের কাজ আরও বৃদ্ধি পায়। তবে এতে মূল ভূমিকা রেখেছিল সন্তু লারমা, গৌতম কুমার চাকমা ও রূপায়ন দেওয়ান প্রমুখ। তখন খুব গোপনে কাজ করতে হতো। সমিতির সদস্যদের চাঁদার অর্থে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ছাত্রদের পাশাপাশি তখন স্কুলের শিক্ষকরাও শাখা বিস্তারের জন্য সাহায্য করেছিল। যেমন : পানছড়ি, মাইজছড়ি, কাচালঙ্গ, দিঘীনালা হাইস্কুলের শিক্ষকরা নিজেদের ইচ্ছাতেই সেসকল স্কুলে শাখা খুলতে রাজী হয়েছিল। তখন রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের সকল পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সদস্যরা লারমার নেতৃত্বে একত্র হয়ে সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নূতন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তবে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা তাদের এই আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল শিক্ষাকে। তারা চেয়েছিল একসাথে শিক্ষাবিস্তারের পাশাপশি গ্রামের সাধারণ জনগণ ও ছাত্রদের কাছাকাছি তারা পৌঁছতে পারবে। কেননা শিক্ষা ছাড়া সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রায় অসম্ভব। তাই তারা প্রথমেই বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। আর এই স্কুলকে কেন্দ্র করে গ্রামের সকল জনগণ তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাবে এবং তারাও স্কুলে এসে শিক্ষকেদের সাথে মিশবে, আলোচনা করবে আর এতে করে ছাত্র সমিতির কর্মীরা তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে কর্মীদের গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে এবং এ সকল জনগণ তাদের নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৫)। তাদের ধারণা ছিল যে, যদিও গ্রামে প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী মানুষ ছিল খুব কম কিন্তু যদি তাদেরকে শিক্ষা দ্বারা সচেতন করে একত্র করা যায় তবে কেবল দেশে পাকিস্তানি প্রশাসকদের বিরুদ্ধেই নয় বরঞ্চ সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও তাদের লড়াইটা চালিয়ে নিতে পারবে। কেননা তারা পরস্পরের সাথে আঁতাত করেছিল এবং জুম্ম সাধারণ জনগণকে দিনের পর দিন শোষণ ও নিপীড়ন করে আসছিল। তাই এই আন্দোলনের মাধ্যমেই তখন নূতন নূতন নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি

এম এন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ জনগণকেও সচেতন করেছিল। পাশাপাশি তারা তখন সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও আন্দোলনরত ছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত

সতর্কতার সাথে পাহাড়ি ছাড়াও সমতলের নেতাদের সাথে আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি বাস্তবতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিজেদেরকেই আদায় করে নিতে হবে। অর্থাৎ তারা-ই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে। তাই লক্ষ করা যায় যে, এম এন লারমার নেতৃত্বেই তখন এই আদিবাসীদের আন্দোলন প্রায় পুরো চট্টগ্রামেই বিস্তার লাভ করেছিল (মেসবাহ, ২০১৫ : ২০৪)। সকল শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালের Indigenous and Tribal Population-এর ১০৭নং ধারাতে বলা হয়েছে :

> (চ) অনুচ্ছেদ ২১-এ শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, Measures shall be taken to ensure that members of the populations concerned have the opportunity to acquire education at all levels on an equal footing with the rest of the national community. (Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957)
>
> (ছ) অনুচ্ছেদ ২৩-এর উপ-অনুচ্ছেদ ১-এ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, Children belonging to the population concerned shall be taught to read and write in their mother tongue or, where this is not practicable, in the language most commonly used by the group to which they belong. (Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957)

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ১১টি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের শিক্ষা ও মাতৃভাষা সম্পর্কে কোনও শাসনব্যবস্থায়ই কোনও ধরনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। তখন শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ আদিবাসীদেও কোনও অধিকার ছিলনা। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবারের নেতৃত্বে শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল। এম এন লারমা যখন জাতীয় সংসদ সদস্য হন তখন তিনি পার্বত্য অঞ্চলের জন্য নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ে চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছেও স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৫)। তার স্বপ্ন ছিল—

> দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত-শ্রেণিগত নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তাঁর বুকভরা আশা ছিল, সংবিধানে জাতি-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং ঔপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও নিপীড়নের চিরঅবসান হবে। (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৬)

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ভিন্ন ভাষার আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের ভাষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় সংসদে তৎকালীন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও ক্রীড়া (শিক্ষা বিভাগ) মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তার প্রস্তাব শেষ করেন। তিনি জানতে চান—

> ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি পৃথক ভাষাভাষি চাকমা, মারমা (মগ), ত্রিপুরা, লুসাই, বম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাকদের ভাষা উন্নয়নের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; এবং
>
> খ. প্রশ্নে উল্লিখিত দশটি ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; করিয়া থাকিলে, কবে হইতে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তায়িত হইবে; না হইলে, উহার কারণ কি? (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯২)

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯২)—

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ প্রচলিত ১০টি ভাষা উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা আপাতত নাই।
খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হেতু দেশের অন্যান্য অংশের সহিত ইহার সম্পর্ক নিবিড় হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য জেলার মত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান করা হইতেছে।

এম এন লারমা আরও কিছু বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না; হইলে উহার সংখ্যা কত এবং ঐগুলির নাম কি;
খ. উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কোনটার উন্নয়নের কাজ অর্ধসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে কিনা; থাকিলে উক্ত বিদ্যালয়গুলির নাম কি; এবং
গ. খ-উল্লিখিত বিদ্যালয়সমূহের কাজ সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; থাকিলে, কবে করা হইবে, না থাকিলে, উহার কারণ কি? (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯২)

এছাড়াও তিনি সংসদে দেশে কতটি সংস্কৃত ও পালি টোল এবং চতুষ্পাঠী কলেজ আছে তার নির্দিষ্ট সংখ্যা জানতে চান এবং সেসকল শিক্ষকগণ কোন সরকার কর্তৃক শিক্ষক কল্যাণ ভাতা পান কি না এবং সেটা কি পরিমাণ, তা তিনি জানার জন্য প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কোনও প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না জানতে চান। কিন্তু এই বিষয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী উত্তরে বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন করা হবে কিন্তু এখনও অবধি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯৩)। এভাবে তখন সংবিধানে আদিবাসীদের মাতৃভাষাকে কোনপ্রকার উন্নয়ন না করে বরঞ্চ পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়। আর এর বিরুদ্ধে তখন এম এন লারমা প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু সংবিধানে আদিবাসীদের এই ভাষাকে কোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এছাড়া লারমা ১৯৭২ সালে সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সংশোধনী দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রস্তাবে বলেন—

১৭ অনুচ্ছেদের ৩য় পঙক্তিতে অবস্থিত 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত' শব্দাবলীর পরিবর্তে 'শিক্ষার বিভিন্ন দিকে মেধা ও প্রবণতা অনুসারে' শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক। (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৯৫)

তিনি বলেন—

আমি এই সংশোধনী এনেছি তার কারণ, এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। শিক্ষা যদি শুধু আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত হয়, তাহলে যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে দেশের কর্ণধার হবে, মেধা-অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগের অভাবে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। সেই মেধা ও প্রবণতা বিভিন্ন জনের বিভিন্নভাবে পরিস্ফুটিত হয়। সেই দিকে লক্ষ রেখে যদি মেধার প্রবণতা অনুসারে শিক্ষার স্তর নির্ধারিত হয়, তাহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিভার বিকাশ লাভ হবে। আর যদি মেধা ও প্রবণতা অনুসারে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া না হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদেরকে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৯৫-১৯৬)।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করে আরও বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, যদি মেধা ও প্রবণতাকে শিক্ষার সব স্তরে যথার্থভাবে মর্যাদা দেওয়া না হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদের মেধার উপযুক্ত বিকাশ সাধিত হবে না। (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৯৬) কিন্তু ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর ঘাতকদের ষড়যন্ত্রে তিনি অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তীতে তার ছোট ভাই ও সহকর্মী সন্তু লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার বিস্তারের পাশাপাশি পাহাড়িরা নিজেদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করেছে।

সমাপনী বক্তব্য

জাতিতে আদিবাসী হলেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তা-চেতনা ছিল দেশের সকল অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি ছিলেন বিনয়ী, মিতব্যয়ী, সাহসী, সৎ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। তিনি যখন পাহাড়ি ছাত্র সমিতিতে যোগদান করেন তখন থেকে তার নেতৃত্বেই এই সমিতির ছাত্ররা তাদের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন সাংসদ হন তখনও তিনি জাতীয় সংসদে আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং তাদের মাতৃভাষাসহ জাতিসত্তা সম্পর্কে বলেছেন। আর এভাবেই তার নেতৃত্বে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা সচেতনতার পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতাও গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে সজীব চাকমা বলেছেন—

> এম এন লারমার জন্ম, শিক্ষালাভ এবং আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে কোন গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়। কেননা তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামকে নাড়িয়ে দিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করতে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে জাগরিত করতে, দেশের ও বিশ্বের দরবারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। তার শিক্ষা লাভ ছিল অতীতের অন্য সবার চাইতে ব্যতিক্রম, তার কর্মজীবন, জীবন-দর্শন অন্য সবার চাইতে আলাদা। তিনি শিক্ষা লাভ করে কোন চাকুরী নিয়ে ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেছে নেননি। তিনি শিক্ষকতা করেও সেখানে আবদ্ধ থাকেননি, ওকালতি করেও উকিল হয়ে থাকেননি। কেননা তিনি ভাবতেন আরো অনেক কিছু, তিনি অনুভব করতেন আরো অনেক বিষয়। তিনি জানতেন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ ও নিপীড়িত জাতির সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের কথা। তিনি বুঝতেন আধুনিক সব রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা। তিনি ভাবতেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও নিপীড়ত-নির্যাতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের কথা, তাদের জাগরিত করবার ও সংগঠিত করবার কথা, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের কথা। তিনি তাঁর এই চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমও হন। (সজীব, ২০১৬ : ৩৪)

এম এন লারমা ১৯৬০-র দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে অনেকের মনে নতুন নেতৃত্ব তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ঘটান যেন শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সকলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তিনি সহকর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ভূমিকা রাখেন যার কারণে তার সহকর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে পাহাড়ি অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন, ফলে স্কুলগুলোতে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৭ সাল থেকে ৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুরা মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করছে, যার ফলে আদিবাসী শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধিতে আদিবাসীদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

টীকা

১. ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম স্কুল। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত ভারতীয় পুলিশ ব্রিটিশ কর্মকর্তা R. H. Sneyd Hutchinson তাঁর *An Account of the Chittagong Hill Tracts* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। তিনি আরও বলেন—সেসময় স্কুলটিতে শিক্ষক ছিলেন দুইজন এবং শ্রেণি সংখ্যা ছিল দুইটি। স্কুলটিতে আদিবাসী ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হত।

২. খাগড়াছড়ি জেলার জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা যিনি ২০২১ সালে আদিবাসীদের মাতৃভাষা সংরক্ষণে অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক পেয়েছেন।

সহায়কপঞ্জি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন (২০১১)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা। ওয়েবসাইট: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act

মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা., ১৯৭৪)। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, সংখ্যা-৩০, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, ১৩ জুলাই, ১৯৭৪।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ (২০২২)। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রাঙ্গামাটি। ওয়েবসাইট: http://www.chtdb.gov.bd/

'মন্ত্রণালয়ের পটভূমি' (২০২২)। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা। ওয়েবসাইট : https://mochta.gov.bd/

মনোজ বাহাদুর গুর্খা (২০১৬)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের গুর্খা জনগোষ্ঠী*। হিমাদ্রী বাহাদুর গুর্খা, সেঞ্জিত বাহাদুর গুর্খা ও তনুশ্রী গুর্খা কর্তৃক প্রকাশিত, রাঙ্গামাটি।

আলীউর রহমান (২০১৫)। *রাঙ্গামাটির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। গতিধারা, ঢাকা।

শরদিন্দু শেখর চাকমা (২০০২)। *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন*, প্রথম খণ্ড। অঙ্কুর, ঢাকা।

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ (মেসবাহ কামাল, ২০১৫)। *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগামের রাজনৈতিক সংগ্রাম*। অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা., ২০১৬)। *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, স্মারক গ্রন্থ। অংজয় মারমা 'সেই ভদ্রলোকটি', এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য (২০১৬)। 'জুম্ম জাতির স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'। মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত।

বিজয় কেতন চাকমা (২০০২)। 'স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ, *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

রেনী (২০১৬)। 'আমার চোখে মানবেন্দ্র লারমা', মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত।

সজীব চাকমা (২০১৬)। 'এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা এম এন লারমা'। মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত।

কীর্তি নিশান চাকমার সাথে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ২৮/৮/২০২০।

প্রফেসর মং শানু চৌধুরীর সাথে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ৩/৯/২০২০

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার সাথে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৭/৮/২০২০।

শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথেরর সঙ্গে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২/৯/২০২০।

ঘোষণাপত্র (২০১৪)। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩১ তম মৃতুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

জয়ীতা চাকমা (২০১৪)। 'জুম্ম নারী আন্দোলনে এম এন লারমার অবদান ও আদিবাসী নারীদের বর্তমান অবস্থা', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

জ্যোতিপ্রভা লারমা (২০১৪)। 'মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা'। *এম. এন. লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ২০১৪ স্মরণিকা*। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবাষিকী পালন জাতীয় কমিটি, রাঙ্গামাটি।

তেজদীপ্ত চাকমা অজিত (২০১৪)। 'এম এন লারমা ঃ জুম্ম জাতীয় চেতনার স্ফুলিঙ্গ', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (২০০২)। 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ!', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

শ্রী জিমি (১৯৮৪)। 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি', *১০ নভেম্বর-'৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

জুলিয়ান বম (২০২০)। 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী', জুমজার্নাল। পার্বত্য চট্টগ্রাম। ওয়েবসাইট : https://www.jumjournal.com

Population and Housing Census Preliminary Report-2022 (2022). Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning. Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka.

R. H. Sneyd Hutchinson (1906). *An Account of the Chittagong Hill Tract*. The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta.

W W Hunter (1909). *A Statistical Account of Bengal*, Volume VI. Trubner and Co, London.

Indigenous and Tribal Populations Convention-1957. International Labour Organization, ওয়েবসাইট https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন

নূর নাহার শারমিন সুলতানা*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) অবস্থান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। মূলত রোমান্টিক উপন্যাস 'কাশবনের কন্যা'র সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নিবিড় হলেও 'পথ জানা নাই'- এর মতো বাস্তবতাঘনিষ্ঠ গল্প রচনা করেও তিনি তাঁর শিল্পদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প রচনায়ও তিনি উৎকীর্ণ করেছেন শৈল্পিক নৈপুণ্য। গ্রামীণ জনজীবন, বিশেষত দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের সংগ্রামশীল জীবনবাস্তবতা, বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দাহ, হতাশা-বেদনা, নৈরাশ্য-যন্ত্রণার রূপচিত্রাঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। দক্ষিণ বাংলার ঝালকাঠি জেলার নদী-অধ্যুষিত এক গ্রামীণ জীবনপরিবেশে আজন্ম বেড়ে উঠেছেন তিনি। এ কারণে তাঁর সৃষ্টিকর্মে সেই জীবনেরই রয়েছে বিপুল উপস্থিতি। দীর্ঘসময় দেশ থেকে বহুদূরে অবস্থান করলেও তাঁর মনোলোক থেকে অতীতের সেই যাপিত জীবনকে তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। ফলে মনের চেতন কিংবা অবচেতন স্তর থেকে উঠে আসা সেই জীবনই বারবার তাঁর সৃষ্টিকর্মে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।]

বাংলাদেশের জীবন ও সমাজ প্রধানত গ্রামনির্ভর। স্বাভাবিকভাবেই, বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম প্রধান উপজীব্য হচ্ছে গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন এবং এ জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ ও প্রসঙ্গ। তবে জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা এবং অভিজ্ঞতার তারতম্যের কারণে পল্লিজীবনকে সাহিত্যের আয়নায় প্রতিবিম্বিত করার ক্ষেত্রে স্বভাবতই বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি বেছে নিয়েছেন। "কেউ বাস্তবতার নিরাবেগ অবিকল উপস্থাপনা করেছেন, আবার কেউ অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করা সত্ত্বেও বাস্তবতাকে দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে [...]" (আকিমুন, ১৯৯৩ : ২০৪)। গ্রামের মাটি ও মানুষের সাথে গভীর ও ব্যাপক সম্পর্ক না থাকলে গ্রামীণজীবনকে নিখুঁতভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা কঠিন। "শহরবাসী সাহিত্যকর্মীদের পক্ষে গ্রাম-জীবনের অন্তর্নিহিত চেহারা ও চরিত্রে অভিজ্ঞতার অভাব অস্বাভাবিক ঘটনা রূপেই প্রতিফলিত। যোগসূত্রের এই অভাবের ফলে অন্তঃশীলা গ্রামীণ জীবন-চিত্র গভীর অন্তরঙ্গতায় কিংবা বিশ্লেষী আলোর বর্ণচ্ছটায় শিল্পীর চেতনায় প্রতিফলিত হয় না" (ভুঁইয়া ইকবাল, ১৯৯৮ : ৫৪)। এ কারণে বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণজীবননির্ভর বিশ্বাসযোগ্য ও কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম সেসব সাহিত্যিকের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছে, গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল ব্যাপক ও গভীর।

স্থান ও কালভেদে এদেশের গ্রামীণ জীবনে আছে বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা। এতৎসত্ত্বেও এমন কিছু অনুষঙ্গ আছে যা গ্রামজীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। "বাংলাদেশ চিরকালই ছিল কৃষিনির্ভর। কাজেই ভূমি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই বাংলাদেশে গ্রামের পত্তন, শ্রেণীবিন্যাস এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক-অধিকারের বিকাশ ঘটেছে" (রওনক, ১৯৭২ : ১৯)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কৃষিকাজ ও কৃষিনির্ভর পেশা, সামাজিক আচার-আচরণ, সংস্কার ইত্যাদি হচ্ছে বাংলার গ্রামীণ জীবনের মৌলিক অনুষঙ্গ। এর পাশাপাশি উল্লেখ করা

*প্রভাষক, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, ঢাকা।

যায় উৎসব ও পালাপার্বণ, আতিথেয়তা, পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ—যা এদেশের গ্রামীণ জনপদের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। আবার অভাব-দারিদ্র্য, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, ক্ষমতাবানদের শোষণ-নির্যাতন ইত্যাদির দৃষ্টান্তও বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যকে স্বীকরণ করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা রচনা করেছেন তাদের কালজয়ী কথামালা; গ্রামীণ জীবন ও জনপদকে অবলম্বন করে সৃষ্টি করেছেন গল্প-উপন্যাস। শামসুদ্দীন আবুল কালাম এই ধারারই সার্থক উত্তরাধিকার; যাঁর কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসরে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ জনাঞ্চলের বিচিত্র চলচ্ছবি।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলো হলো: *শাহেরবানু* (১৯৪৫), *পথ জানা নেই* (১৯৫৩), *ঢেউ* (১৯৫৩), *দুই হৃদয়ের তীর* (১৯৫৫), *অনেক দিনের আশা* (১৯৫৬), *জীবন-কাব্য* (১৯৫৬), *পুঁই ডালিমের কাব্য* (১৯৮৭), *মজা গাঙের গান* (১৯৮৭)। এসব গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলোতে এক ধরনের রোমান্টিক স্বপ্নময়তার আবেশে গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের জীবনের নানা অনুষঙ্গকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, তাঁর গল্পের ক্যানভাসে স্থাপন করেছেন গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি, পেশা ও জীবিকা, অভাব-দারিদ্র্য, শোষক শ্রেণির দৌরাত্ম্য, পারস্পরিক সোহার্দ্য-সম্প্রীতি, বিবাদ-বিসংবাদ, শ্রেণিবৈষম্য, লোকাচার-লোকসংস্কৃতি, লোকচিকিৎসা, লোককথা, নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, নিপীড়ন-নির্যাতন, সমকালীন রাজনৈতিক প্রভাব, নগরসভ্যতার দৌরাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পে এ বিষয়সমূহ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটিই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

জীবন ও প্রকৃতি

বাংলার বিচিত্র-সুন্দর প্রকৃতি তার সকল সৌন্দর্য ও সৌকর্য নিয়ে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করেছে এদেশের মানুষের জীবন ও মননকে। তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা; মানুষের জীবনে অনপনেয় ছাপ রেখে গেছে প্রকৃতির নানাবিধ পরিবর্তন। শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'মজা গাঙের গান' (*মজা গাঙের গান*) , 'নবমেঘভার' (*দুই হৃদয়ের তীর*), 'ভাঙন' (*শাহেরবানু*), 'জোর যার' *(শাহের বানু)*, 'বন্যা' (*পথ জানা নাই*), 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*), 'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*), প্রভৃতি গল্পে গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষায় বৃষ্টির ছন্দ, শরতের শান্ত-স্নিগ্ধ নদীতীর, হেমন্তে ধানকাটার উৎসব, শীতের হিম কুয়াশা কিংবা বসন্তের পুষ্পশোভিত দৃশ্যপট প্রভৃতি বিষয় যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট এসব মানুষের প্রকৃতিনির্ভরতা, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠতা এমনকি প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা—সবকিছুই লেখক তুলে ধরেছেন গভীর পারঙ্গমতায়। 'মজা গাঙের গান' গল্পে গ্রীষ্মের খরতাপে চৌচির ধানক্ষেত, মন-কেমন-করা ঘুঘুর ডাক, আর রৌদ্রের খরতাপে 'উনুনের শূন্য আর তেতে ওঠা পাত্রের মত কম্পমান জগত'–এসব টুকরো টুকরো দৃশ্যের কোলাজ গ্রীষ্মের বিরূপ প্রকৃতিকে দৃশ্যমান করে তোলে। একইভাবে বর্ষাসিক্ত বাংলার অপরূপ চিত্রও অঙ্কন করেছেন গল্পকার। গ্রামবাংলার অবারিত সৌন্দর্য যে ঋতুতে মূর্ত হয়ে ওঠে তার নাম বর্ষা। দিনভর বৃষ্টির গানে, আকাশ কালো-করা মেঘের পদচারণায় কিংবা ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে নতুন এক রূপে সজ্জিত হয় বাংলার গ্রামগুলো। 'নবমেঘভার' গল্পে মাজু মিঞার স্মৃতিচারণে বর্ষণমুখর পল্লিপ্রকৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত মাজু মিঞার বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সাথে বর্ষার মেঘভার যেন একাকার হয়ে ধরা দিয়েছে এ গল্পে। তাই বর্ষণমুখর একটি দিনে মাজু মিঞা বিস্মরণের পর্দা ছিঁড়ে বারবার ফিরে যাচ্ছে শৈশবে। পানিতে ভেসে যাওয়া প্রান্তরে নাক উঁচু করে ব্যাঙের একটানা ডেকে যাওয়া কিংবা 'পানির মুকুরে নিজের ছায়া দেখা তৃণলতার' উল্লেখ-এ সবই গল্পকারের পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচায়ক। বর্ষণমুখর দিনে অলস সময় পার করতে হয় গ্রামের মানুষদের। কর্মহীন সময়গুলো পার করার জন্য নানারকম বিনোদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ। বর্ষার কর্মহীন সময়গুলো গল্প-গুজব এবং সন্ধ্যায় পুঁথিপাঠের

আসর জমিয়ে পার করে। হেমন্তকালে গ্রামের মাঠে মাঠে শুরু হয় ফসল তোলার উৎসব। শরতের রোদ ঝলমল সকালগুলো কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়তে থাকে, প্রকৃতিতে ধ্বনিত হয় শীতের পদধ্বনি। সোনালি ধানের আহ্বানে আবর্তিত হয় কৃষকের সমস্ত চিন্তাচেতনা। নতুন ধান কেবল কৃষকের ক্ষুধাই মেটায় না, তার ভবিষ্যৎকে স্বপ্নময় ও রঙিন করে তোলে। হেমন্তের শেষে কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে হিমশীতল অনুভূতি ছড়িয়ে শীতের আগমন ঘটে। পল্লিবাংলায় শীতের আমেজই আলাদা। শীতকালে গ্রামের প্রতিটি ঘর নবান্ন উৎসবে রঙিন হয়ে ওঠে। নতুন ধানের তৈরি পিঠে পুলি এবং খেজুর রসের পায়েস (সিন্নি) খাওয়ার ধুম পড়ে যায় ঘরে ঘরে। 'ভাঙন' গল্পে দেখা যায়, খেজুর রসের সিন্নি খাওয়ার আনন্দ থেকে বাদ যাচ্ছে না গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলোও। এ গল্পের আনোয়ারের চুরি করে আনা খেজুরের রস, নারিকেল দিয়ে 'সিন্নি' রাঁধা এবং মধ্যরাতে পরিবারের সদস্যদের 'শীতে গুটিসুটি দিয়ে উনুন ঘিরে চাপাস্বরে গল্প, তারপর কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি করে খাওয়া'র মধ্যেও গ্রামীণ জীবনে এ ঋতুর আবেদন পরিস্ফূটিত হয়।

প্রকৃতির ঐশ্বর্যে পল্লিবাংলার মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হলেও প্রকৃতির বিরূপতা তাদের জন্য নিয়ে আসে চরম বিপর্যয়। 'বন্যা' গল্পে বন্যাকবলিত অসহায় গ্রামবাসীর নিয়তিনির্ভরতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে গ্রাম, মাঠ, জমির আল এমনকি নদী পারাপারের সাঁকোও। এ সময় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার একমাত্র বাহন হয়ে ওঠে নৌকা। বন্যার পানিতে মানুষের ক্ষুণ্নিবৃত্তির অন্যতম অবলম্বন ধানক্ষেতগুলোও তলিয়ে যায়। মৌসুমী ঝড়ের 'দুরন্ত দমকা বাতাসে ঘরের বেড়া-চাল পর্যন্ত যখন কাঁপিয়া ওঠে তখন চাষীরা আকাশের দিকে হাত তুলিয়া আরো জোরে আল্লা, আল্লা বলিয়া ফুকারিয়া ওঠে' (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ২)। এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার ওপর অগাধ বিশ্বাসে মোনাজাতের পর মুখে হাত বুলিয়ে যেন তারা স্পষ্ট দেখতে পায় 'পানি নামিয়া গিয়াছে, ঝড় শান্ত হইয়া মেঘদলভার হটাইয়া লইয়া গিয়াছে।' অতিবৃষ্টির ফলে যেমন পথ-ঘাট-ক্ষেত-খামার ডুবে যায় তাদের ফসল এবং প্রাত্যহিক জীবনাচারে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তেমনি অনাবৃষ্টির ফলেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন 'মৌসুম' গল্পে দেখা যায়, টানা বৃষ্টিহীনতার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় গ্রামের মানুষগুলোর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে ঘর থেকে ঘরে। প্রকৃতির এই বিরূপতা লেখকের অনবদ্য ভাষাভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে—

> চৈত্র মাস শেষ হয়ে গেল, তবু একফোঁটা জল নেই। এখনো দক্ষিণা হাওয়া কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে মৃদু মর্মর তুলে ঝিরঝিরিয়ে যায়, উদ্দাম হয়ে মৌসুমী সংবাদ আনে না। সময় সময় এমনো হয় যে নারকেল গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। পত্রঝরা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এতো তীব্র রৌদ্রে পুড়ে হঠাৎ বুঝি তার শুকনো ডালে আগুন ঝ'রে যাবে। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১৩২)

দীর্ঘ এই অনাবৃষ্টি কৃষকদের মনে হতাশা জাগিয়ে তোলে, 'তাদের ঘরে ঘরে মনে মনে নামে দুর্ভাবনার অন্ধকার।' আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবিধাবঞ্চিত প্রকৃতিনির্ভর অসহায় এসব মানুষ তাই পুজো, ব্রত আর পিরের দরগায় সিন্নি দেয়ার মাধ্যমে আসন্ন দুর্ভাগ্যকে এড়ানোর প্রয়াস পায়। 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*) গল্পেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার গ্রামীণ মানুষের দুর্ভোগের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পুরো গল্পটি পত্রাকারে বর্ণিত। গ্রামে বন্যার দৃশ্য সরেজমিনে দেখতে এসেছে এক শহুরে জমিদারনন্দন। তারপর মিতা নামের এক নারীর উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিতে বন্যার নানা ঘটনা বর্ণনা করেছে। সে চিঠির সূত্রেই প্রকৃতির চরম বিরূপতার শিকার মানুষের জীবনের চালচিত্র উদ্ভাসিত করেছেন গল্পকার। গল্পে বর্ণিত বন্যাপ্লাবিত গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে স্বল্প জমিতে যেটুকু ফসল ফলায় তাই দিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করে তারা। কিন্তু 'যে জীবন ছিল তাও ভেস্তে গেছে বন্যায়'। গ্রামবাসীর দুর্দশা ও বন্যার স্বরূপ লেখকের ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে এভাবে :

> পানি থৈ থৈ করছে চতুর্দিক। বড়ো তাল-নারকেল গাছগুলিও কোমর সমান পানিতে ডুবে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং পানি যে কতখানি তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে। এই বিস্তীর্ণ এলাকার সব লোকেরা জায়গা নিয়েছে জেলা বোর্ডের উঁচু রাস্তাটার ওপরে; ঘরের চাল খুঁজে খুঁজে ভাসিয়ে এনে তারি ওপরে ছাউনি তুলেছে; বৃষ্টি হলে তার মধ্যে ঢোকে আবার থামলে বাইরে এসে ঝিমায়। (শামসুদ্দীন, ১৯৫৩ : ৮৭-৮৮)

বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী অঞ্চলের আরেক পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ নদীভাঙন। 'জোর যার' *(শাহের বানু)* গল্পে নদী ভাঙনের ফলে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা হারিয়ে আশ্রয়হীন মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রামের এককালের অবস্থাসম্পন্ন কৃষক রহম আলীর বাড়িটি নদীর তীরে অবস্থিত। সবসময়ই নদীভাঙনের আশঙ্কার মধ্যে থাকে রহম আলীর গোটা পরিবার। আশেপাশে কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই তার। তাছাড়া আকালের দিনে অভাবের সংসারে সকলেই নিজ নিজ ঘরসংসার সামলাতে ব্যস্ত। এ কারণে বসতবাড়িটি যদি নদীগর্ভে চলেই যায় তাহলে সন্তান-সন্ততি নিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে ভেবে পায় না রহম আলী। এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রহম আলীর মানসিক অবস্থা ফুটে ওঠে নিচের গল্পাংশে :

> এদিকে নদী ক্রমান্বয়ে আগাইয়া আসিতেছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও তাহার ছলাৎছল জলকল্লোলে ধ্বংসের করতালি শুনিতে পায় রহম আলী। এক রাত্রেও ঘুমাইতে পারে না। চাপ চাপ মাটি ভাঙিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের এক একশানা পঞ্জরাস্থি ও মন যেন ভাঙিয়া পড়ে। স্ত্রী, মরিয়ম, সাত বছরের ছোট ছেলেটি সকলেই তো সর্বদা তটস্থ। কোন সময় যে এক বিরাট চাপশুদ্ধ তাহারা ঘরবাড়ি সমেত নদীর গর্ভে লুপ্ত হইয়া যাইবে কে জানে! (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১২৮)

'মজা গাঙের গান'-গল্পে নদীভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গল্পের সম্পন্ন ঘরের গৃহিনী বরুজান পরিবার পরিজন সহায় সম্পত্তি হারিয়ে এখন নিঃস্ব। শুকিয়ে যাওয়া খালের ধারে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন তার। একদিন আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় তার বিয়াই সম্পর্কের এক বৃদ্ধ আত্মীয়। নদীভাঙনে নিঃস্ব হয়ে দেশান্তরী হয়েছে সে বিয়াই। দীর্ঘদিন পর ঘটনাক্রমে আবার সাক্ষাৎ ঘটে সর্বস্বহারা দুই নিঃসঙ্গ মানুষের মধ্যে। গল্পটিতে জীবন আর প্রকৃতির বিরূপতা নানাভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। বরুজানের বাড়ির ধারের একসময়কার উত্তাল স্রোতস্বিনী এখন মৃতপ্রায়, বৃদ্ধ আত্মীয়টির ভাষায়, 'এত বড় গাঙটা আছিলো ঐখানে তা কোন ফুসমন্তরে এমন করিয়া হাওয়ায় উড়িয়া গেল?' এ যেন তাদের দুজনের জীবনেরই এক প্রতিরূপ। নদীভাঙন ও খরাসহ প্রকৃতির বিরূপতা ছাড়াও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রবল দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পটিতে। তবু এরই মধ্যে জীবনকে নতুন করে সাজানোর স্বপ্ন দেখে দুই প্রবীণ। বরুজানের ভাষায়, 'মনে কয় বেয়াইর সঙ্গে আবারও সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াই এই ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছিলাম।' বাড়ির ধারের মজা গাঙে সামান্য খুড়লেই টলটলে পানির দেখা মেলে। বিরূপ প্রকৃতিকে জয় করে নতুন করে জীবনবৃক্ষে নতুন করে ফুল ফোটানোর ইঙ্গিতও মেলে এই তথ্যের মধ্যে।

পেশা ও জীবিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি কৃষির জন্য অত্যন্ত অনুকূল। স্বভাবতই কৃষিকে আশ্রয় করেই জীবিকার অবলম্বন খোঁজে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে কৃষিজীবী ছাড়াও মাঝি, জেলে, পোস্টমাস্টার, ইত্যাদি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের যাপিত জীবনের চিত্র উঠে এসেছে। তাঁর বিভিন্ন গল্পে বিধৃত হয়েছে প্রান্তিক মানুষদের দারিদ্র্যপীড়িত, শোষণ-বঞ্চনাময় জীবনকাহিনী। 'ইতিকথা' (*শাহেরবানু*), 'পৌষ' (*শাহেরবানু*), 'শেষপ্রহর' (*শাহেরবানু*), 'শাহের বানু' (*শাহের বানু*), 'কেরায়া নায়ের মাঝি' (*শাহেরবানু*), 'শেষ প্রহর' (*শাহেরবানু*), 'মুক্তি' (*শাহেরবানু*) 'হঠাৎ' (*অনেক দিনের আশা*), 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*), 'মদনমাঝির গেলেপতার' (পথ জানা নাই), 'নবমেঘভার' (*দুই*

হৃদয়ের তীর), প্রভৃতি গল্পে নিম্ন পেশাজীবী মানুষগুলো কখনো প্রকৃতি আবার কখনো গ্রাম্য জোতদার-মহাজনদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবননির্বাহ করে। ফলে দিনান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটে না, বরং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ক্রমশ নিপতিত হয়। আর এই অভাব-দারিদ্র্য পারিবারিক কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত নানা সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'সরজমিন' গল্পে এক অজপাড়াগাঁয়ের চিত্র বর্ণিত হয়েছে, যেটিকে লেখক বলেছেন 'এতই নগণ্য যে হয়তো মানচিত্রেও নেই'। সে গ্রামের অধিবাসীরা কৃষিজীবী। স্বল্প জমিতে প্রাণান্ত পরিশ্রমে যে পরিমাণ ফসল তারা ফলায় তাতে তাদের জীবন কোনোরকমে কেটে যায়। এ গ্রামের কৃষকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লেখক বলছেন :

> সে কী জীবন! জীবিত থাকা যাকে আমরা বলি সে লক্ষণ তো কারো মাঝে দেখলুম না। এ যেন বোঝা; কোনোমতে এরা টেনে চলেছে। মাঝে মাঝে যখন পারে না, থেমে পড়ে মূঢ়ের মতো, এদিক ওদিক তাকায়। সে চোখ গরুর মতো। অসহায়, স্পষ্ট কোনো ভাষা নেই, কিন্তু বেদনাটা উচ্চারিত। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ৮৭)

গ্রামের দরিদ্র কৃষক রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ধান ফলায়। সেই ধান বিক্রি করে কোনোমতে আধপেটা খেয়ে দিনাতিপাত করে; অথচ সমাজের তথাকথিত উঁচুশ্রেণির মানুষ কৃষকদের কঠোর শ্রমে উৎপন্ন চাল নিয়ে করে বিলাসিতা। 'সরজমিন' গল্পে এ বিষয়টিও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় তুলে ধরেছেন লেখক—যে কৃষকদের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের ফসল 'কালিজিরা ধানের চাল না হলে আমাদের ডাইনিং টেবিল পোলাওয়ের গন্ধে ভুরভুর করে না' 'বালাম, রূপশালী, কনকভোগ আর বাকতুশী-র যে চাল ছাড়া আমাদের খাওয়া হয় না' তা এদেরই পরিশ্রমলব্ধ। অথচ দিনান্ত পরিশ্রম করে তাদের কপালে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না। এ গল্পের দরিদ্র বর্গাচাষী লালু খাঁর জীবনে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অন্ন ও চিকিৎসার অভাবে তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের করুণ পরিণতির চিত্র বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। অভাবের সংসারে লালুকে জীবনসংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে তার স্ত্রী জোবেদা। লালুকে গঞ্জনা না দিয়ে নিজেই সামলে নিত ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দনরত শিশুকে। একদিন ছোট মেয়েটিকে ভাতের থালা সামনে নিয়ে কাঁদতে দেখে এর কারণ জোবেদার কাছ থেকে জানতে না পারলেও রাতে ছোট ছেলেটির কাছে জানতে পারে–জোবেদা কীভাবে প্রতিদিন ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে ছোট মেয়েটিকে পানির সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খাইয়ে শান্ত করে। এরই মধ্যে হঠাৎ চালের দাম বেড়ে গেলে চরম কষ্টে নিপতিত হয় পরিবারটি। ওদিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে লালু। এতদিন জোবেদা সন্তানদের শাক-পাতা খাইয়ে কোনোরকম দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু একদিন বিলের জলে কলমী শাক তুলতে গিয়ে মৃত্যু ঘটে জোবেদার। শুধু জোবেদা নয়, পরবর্তীতে একে একে প্রাণ হারায় তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও। তীব্র অন্তর্যন্ত্রণায় দগ্ধ লালুর উক্তি : 'একটা না দুইটা না তিনটা পোলাও আমার এইখানে শুইয়া আছে। খিদা লইয়া, আফছুছ লইয়া- লাখে লাখে!'

নতুন ফসলের জন্য প্রান্তিক কৃষক হোসেনের যুগপৎ আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা 'ইতিকথা' গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে ফসলের অপেক্ষায় তারা তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে থাকে সে ফসলের ফলন ভালো না হলে তাদের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। সারা বছর তারা অপেক্ষা করে নতুন ধান ঘরে এলে সে ধান বিক্রি করে ধার-কর্জ শোধ করবে, নিত্য প্রয়োজনীয় নানান চাহিদা মেটাবে এবং পরিবার-পরিজনের সদস্যদের শখ-আহ্লাদও মেটাবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষিদের এই অধীর অপেক্ষার পরিণতি সুখকর হয় না। হোসেনের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আশানুরূপ ফলন না হওয়ায় হোসেনের জীবনে দেখা দেয় চরম দারিদ্র্য যার পরিণতিতে ঘটে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি এবং সংসার জীবনের অশান্তি। এই গল্পের হোসেন সহজ-সরল নির্বিরোধ চরিত্র। সংসারে তার দৈন্যদশা। অথচ নিশাচর করিম, ডাকাত মদন

মাঝি, আতাহার মুন্সী, জবান খাঁ-দের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত নেই। দারিদ্র্য-জর্জরিত সংসারের টানাপড়েনে ক্লিষ্ট হোসেনের স্ত্রী জরিনাও একসময় স্বামী হোসেনকে চৌর্যবৃত্তিতে প্ররোচিত করে। কেননা জরিনা মনে করে, 'ভালমানুষীতে মরণ ছাড়া গতি নাই।' জরিনার প্ররোচনায় চৌর্যবৃত্তি শুরু করলেও অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে হোসেন। তার বিবেক ও নীতিবোধ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হোসেনকে সাহস যোগায় তার স্ত্রী জরিনা। চুরির মত গর্হিত অপরাধকেও এক ধরনের বৈধতা প্রদানের চেষ্টা থেকে জরিনা বলে—

> চোর কে না? শুধু করিমের নাম কেন? গু খায় সব মাছে, নাম পড়ে পাঙাসের। গ্রামের মাতব্বরেরা কী করে? জবান খাঁ কী শয়তানি করিয়া তোমার দু' কুড়া জায়গা নিয়ে নিলে; কিন্তু সেজন্য তাকে চোর বলার সাহস আছে তোমার? (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ২৩)।

এক পর্যায়ে হোসেনেরও ভাবনালোকে পরিবর্তন আসে। তারও মনে হয়, 'কীই বা পুণ্য-পাপ! অসৎ নয় কে?" আর ন্যায়-অন্যায়ের এসব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের আহত বিবেককে শান্ত রাখার চেষ্টা করে হোসেন।

ভাগ্যহত কৃষক একদিকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, অন্যদিকে জমিদার-মহাজন-জোতদারের খাজনা আদায়, ঋণ পরিশোধের তাগাদায় অতিষ্ঠ তাদের জীবন। এ যেন "জলে কুমির ডাঙায় বাঘ" প্রবাদেরই বাস্তব প্রতিফলন। 'পৌষ' গল্পে এমনই বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে দরিদ্র তাজুর মর্মন্তুদ জীবনচিত্রে। গ্রামের সমবায় কৃষিঋণ সমিতির ঋণের টাকায় বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কায়ক্লেশে ফ্যান-ভাত খেয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করে সে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসলের উৎপাদন ভালো না হওয়ায় অনাগত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় তার মন ভারাক্রান্ত। ধান বিক্রির সামান্য টাকায় কীভাবে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করবে; ধার শোধ, খাজনা, খাওয়া-পরা এসব সম্পন্ন করবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিশেহারা তাজু। সামন্তপ্রভু হলধর চক্রবর্তীর সুদের টাকা শোধের তাগাদাও তাকে বিচলিত করে। তাই তাজু হিসেব কষতে থাকে–ধান বিক্রির টাকায় হলধর চক্রবর্তীর কর্জ শোধ করবে, নাকি সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করবে। গল্পের শেষে দেখা যায়, পাওনা টাকা চাইলে উচিত-অনুচিতের বোধ হারিয়ে হলধর চক্রবর্তীর সহচর হাকিমের গলা চেপে ধরে নিজের অব্যক্ত ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করে তাজু। পরিণতিতে তার শেষ সম্বল ভিটেমাটি হারাতে হতে পারে জেনেও বুকের মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশে পিছপা হয় না তাজু।

গ্রামের এক দরিদ্র পোস্টমাস্টার মাজু মিয়ার জীবনের করুণ পরিণতির চিত্র ফুটে উঠেছে 'নবমেঘভার' গল্পে। স্বল্প বেতনভুক মাজু মিয়ার জীবনে স্বপ্ন আর উচ্চাশা ছিল অনেক, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সেসব স্বপ্নের কোনোটিই পূরণ হয়নি। বরং দারিদ্র্যের কশাঘাতে চোখের সামনে সেসব স্বপ্নের নির্মম মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়েছে সে। কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করে পিতার অকাল মৃত্যুতে সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়ে সামান্য বেতনের পোস্টমাস্টার হতে হয়েছে মাজু মিয়াকে; যে একসময় কবিতা লিখত আর জীবনে বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখত। স্থানীয় এক অবস্থাপন্ন পরিবারে বিয়ে করেও দারিদ্র্যের ছোবল থেকে মুক্তি পায়নি মাজু মিয়া বরং দিনে দিনে সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। কারণ ধনী পিতার কন্যা মনিরা দরিদ্র পোস্টমাস্টারের সংসারে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। ফলে অহর্নিশ কলহ বিবাদ লেগে থাকে দুজনের মধ্যে। একটি কন্যা সন্তানের জন্মও তাদের অসুখী সংসারে সুখের প্রদীপ জ্বালাতে ব্যর্থ হয়। দিনের পর দিন স্ত্রীর তীব্র বিষোদগার চলে সৎ সহজ-সরল মাজু মাস্টারের ওপর। এক পর্যায়ে স্ত্রী মনিরা সংসার ছেড়ে চলে গেলে সংসারক্ষেত্র থেকে চিরকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় জীবনসংগ্রামে পরাস্ত মাজু মিঞা। অনেক উৎসাহ আর উদ্যম নিয়ে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করে মাজু মিয়া, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

'হঠাৎ' গল্পের মফেজ আলীর পেশা কাঠের কারবার। সুন্দরবন থেকে কাঠ কেটে এনে নিকটবর্তী জনপদে বিক্রি করে সে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রত্তনকে এই কাজের জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা মজুরিতে নিয়োগ করে মফেজ আলী। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্যজীবী মানুষের সংখ্যাও প্রচুর। মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায় তারা। 'শাহের বানু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাজেদ গ্রামের খাল-বিল থেকে মাছ ধরে শহরে নিয়ে বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। সে ভালবাসে শাহের বানু নামের একটি মেয়েকে। গ্রামের নদী-নালা-খাল-বিল থেকে মাছ ধরে সেগুলো শহরের বাজারে বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে সংসার চালায় সে। মাছ বিক্রির টাকায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ভালোবাসার মানুষ শাহের বানুকে একটি শাড়ি উপহার দিতে চায় সে, কিন্তু কাছারির খাজনা পরিশোধের দায় থাকায় সেই ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয়। খাজনা পরিশোধ নাকি প্রেয়সীর বায়না মিটানো–এমন এক উভয় সংকটে পড়ে মাজেদের মনের শান্তি উধাও হয়ে যায়, নৈতিক মূল্যবোধেরও অবনতি ঘটে। ফলে বাজারের হাশেম মোল্লার দোকানের গদিতে বসা তার আট বছরের কন্যা শিশুর চোখ ফাঁকি দিয়ে হাতবাক্স থেকে টাকা চুরি করার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েটি দেখে ফেলে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বাটখারা দিয়ে মেয়েটিকে আঘাত করে মাজেদ, তারপর ধরা পড়ার ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। সেখানেই মেয়ের পিতার কোঁচের আঘাতে জীবন দিতে হয় তাকে।

'কেরায়া নায়ের মাঝি' গল্পে কেরায়া নৌকার দরিদ্র মাঝি আজহার। স্ত্রী জমিলা এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন। কেরায়া বাওয়া ছাড়াও 'ধুলোট কৃষির সময় সকাল সন্ধ্যা খাটুনি, একা একা জোঁকের কামড় খেয়ে বর্গাক্ষেতে বীজ বুনোনো, চাই বুনে মাছ ধরা, হাটে বিক্রি করা' ইত্যাদি নানা কাজ করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে আজহার। তার সন্তানেরাও খাল-বিল থেকে শাপলা তুলে সেগুলো হাটে বিক্রি করে। কিন্তু তাতেও অভাব মেটে না। গল্পের এক পর্যায়ে দেখা যায়, আজহারের ছোট ছেলে কাশেম ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থাসম্পন্ন মুন্সীবাড়ির শসার মাচা থেকে একটি ছোট শসা ছিঁড়েছে বলে তাকে প্রহার করে সে বাড়ির ছোট মিয়া। এ ঘটনায় সংসারের ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত-বিপর্যস্ত জমিলার খেদোক্তি—

> পোলাগো খাওয়াইতে পারবা না, হেরা এরডা ওরডা যাইয়া ধরবে, এর দুয়ারে চাইবে ফ্যান, ওর দুয়ারে খুদ। কেউ কিছু না দিলে খাওনিয়া জিনিস পাইলে খাইবে আবার হেইয়ার উপরে যদি খায় অন্যায় মাইর, তউ তুমি কিছু কইতে পারবা না? [...] কয়দিন ধইরা পেটে ভাত পড়ে না খেয়াল আছে? [...] কিছু কইতে পারবা না, খাইতেও দেতে পারবা না, তয় জন্ম দেছেলা ক্যা? (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ৫২-৫৩)

সন্তানদের ক্ষুধার্ত মুখ, স্ত্রীর ভৎর্সনা সহ্য করতে না পেরে আজহার অসুস্থ শরীর নিয়েই কেরায়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চাল-ডাল নানা সওদাপাতি করেও আনে কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর আগেই নৌকাতেই তার করুণ মৃত্যু ঘটে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নানা পেশার সাথে এমন কিছু পেশারও দেখা মেলে যেগুলো আইন ও সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য। যদিও দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেঁচে থাকার তাগিদে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শেষ অবলম্বন হিসেবে অনেকে বেছে নেয় এসব পেশা। যেমন: চুরি ও ডাকাতি। এদের সিংহভাগই ছিঁচকে চোর বা সিঁধেল চোর। আশপাশের বাগানের নারিকেল-সুপারি, ফল-ফলাদি চুরি করে বা সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। চুরি করা দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে সংসারের চাহিদা মেটায়। রাতের বেলা চুরি করলেও দিনের বেলা সাধারণ মানুষের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তারা মেলামেশা করে। 'ইতিকথা' গল্পে এরকমই এক চোর–'সবার পরিচিত করিম চোর'-এর উল্লেখ রয়েছে। লেখকের ভাষায় তার চৌর্যবৃত্তির বর্ণনা—

> রোজ রাতে গ্রামের বুক চিরে প্রবহমান খালে তার ছোট ডিঙিখানা সন্তর্পণে নিশীথের অভিসারে বেরোয়। কোথায় যায় কী করে অন্ধকারে জানা না গেলেও, ভোরের বেলা আশেপাশের গ্রামের বাগানের মালিকেরা দেখে তাদের বাগানের নারকেল, সুপুরি সাফ হয়ে গেছে; আর ক্বচিৎ কেউ কখনও দেখে ফেলে যে, বন্দরের দিক থেকে করিম নিশ্চিন্ত মনে নৌকো নিয়ে বাড়ি ফিরছে। নৌকোর মধ্যে হোগলা পাতায় ঢাকা হরেক রকম সওদা। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১৭)

অনেক সময় অসাধু উপায়ে উপার্জন করে স্বচ্ছল জীবনযাপনও করে কেউ কেউ। দারিদ্র্যের কারণে অনেকেরই নীতিবোধ দুর্বল হয়ে যায়। তাদের কাছে তাই যেনতেন প্রকারে বেঁচে থাকাটাকেই সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে হয়। 'ইতিকথা' গল্পেও অভাবজনিত কারণে দাম্পত্য কলহ এবং নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পের হোসেন সহজ-সরল নির্বিরোধ চরিত্র। সংসারে তার দৈন্যদশা। অথচ নিশাচর করিম, ডাকাত মদন মাঝি, আতাহার মুন্সী, জবান খাঁ-দের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত নেই। দারিদ্র্য-জর্জরিত সংসারের টানাপড়েনে ক্লিষ্ট হোসেনের স্ত্রী জরিনাও একসময় স্বামী হোসেনকে চৌর্যবৃত্তিতে প্ররোচিত করে। জরিনা মনে করে, 'ভালমানুষীতে মরণ ছাড়া গতি নাই।' তাছাড়া— 'আজকালকার এমন দিনে নীতি ধর্মের শিকল পরে ভালোমানুষী করা যে আত্মহত্যারই শামিল।' এক পর্যায়ে স্ত্রীর প্ররোচনায় হোসেনের মত সহজসরল নির্ভেজাল ভালোমানুষও চৌর্যবৃত্তিকে বেছে নেয় জীবনধারণের অবলম্বন হিসেবে। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যারা এসব অনৈতিক পেশা অবলম্বন করে তাদের মুখে সমাজের অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের যে চিত্র ফুটে ওঠে তাতে মনে হয়, বিত্তবান মানুষেরা যদি একটু দয়ার্দ্র হতো তাহলে হয়ত চৌর্যবৃত্তির মতো এমন পেশা তারা বেছে নিতো না। এ প্রসঙ্গে করিম আর হোসেনের কথোপকথন স্মর্তব্য, যেখানে হোসেনের কাছে চৌর্যবৃত্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে করিম এভাবে :

> আতাহার মুন্সীর ঘরে কত চাউল আছে তা জানো? এক সের চাউলও তার কাছে ধার পাওয়া যায় না। যাবা আজ আমার সঙ্গে তার কিছু নামাইয়া আনতে?
> : ডাকাতি? চমকে উঠল হোসেন।
> : না না, ডাকাতি কেন, সিঁধ কাটিয়া কিছু নামাইয়া আনমু। মুন্সীর ঘরের পিছন দিকেই গোলা, কী করতে হইবে না হইবে সব আমি ঠিক করইয়া রাখছি। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ২৪)

তবে জরিনার প্ররোচনায় চৌর্যবৃত্তি শুরু করলেও অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে হোসেন। তার বিবেক ও নীতিবোধ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হোসেনকে সাহস যোগায় তার স্ত্রী জরিনা। চুরির মত গর্হিত অপরাধকেও এক ধরনের বৈধতা প্রদানের চেষ্টা থেকে জরিনা বলে—

> চোর কে না? শুধু করিমের নাম কেন? গু খায় সব মাছে, নাম পড়ে পাঙাসের। গ্রামের মাতব্বরেরা কী করে? জবান খাঁ কী শয়তানি করিয়া তোমার দু' কুড়া জায়গা নিয়ে নিলে; কিন্তু সেজন্য তাকে চোর বলার সাহস আছে তোমার? (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ২৩)।

এক পর্যায়ে হোসেনেরও ভাবনালোকে পরিবর্তন আসে। তারও মনে হয়, 'কীই বা পুণ্য-পাপ! অসৎ নয় কে?" আর ন্যায়-অন্যায়ের এসব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের আহত বিবেককে শান্ত রাখার চেষ্টা করে হোসেন।

'মদনমাঝির গেলেপতার' গল্পে মদন একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত এবং এই গল্পে তার জীবনাখ্যানই প্রতিফলিত হয়েছে। মদন মাঝি নৌপথে ডাকাতি করে। তার নাম শুনলে যাত্রীরা ভয়ে 'খরগোশের মতই কাঁপে', তা 'পারতপক্ষে ঐ দশ পঁচিশখানা গাঁয়ের পাশের প্রায় মাইল দশেক গাঙ এলাকায় কোনো নাও চলে না।' অথচ মদন মাঝির দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা শুনে সবাই শিউরে উঠলেও তার ছিল একটা কোমল হৃদয়। গরিব মানুষের প্রতি সে ছিল অত্যন্ত

সহানুভূতিশীল। যাদের আছে তাদের লুট করাই তার পেশা এবং নেশা। সেই লুট করা অর্থে-সম্পদে উপকথার রবিন হুডের মতো বহু গরীবকে সে বাঁচিয়ে রাখে। এ কারণে মদন মাঝির নৃশংসতার কথা জানলেও দরিদ্র মানুষরা কখনও তাকে শত্রু ভাবত না। আবার তাকে লোকে ভালোওবাসতো না। 'অনেক দিনের আশা' গল্পের আয়নদ্দিও চৌর্যবৃত্তিতে নিয়োজিত। মন্বন্তরের ফলে উপায়ান্তর না দেখে এ কাজে জড়িয়ে পড়ে সে। সমাজের ধিক্কার সত্ত্বেও এই পেশাকে পাল্টানোর কোনো উপায় খুঁজে পায় না।

'শেষ প্রহর' গল্পের দরিদ্র কৃষক হোসেন বিয়ে করে 'চোর' নামে খ্যাত আজহারের কন্যা রাবেয়াকে। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে তার অভাব আরো বেড়ে যায়। সর্বগ্রাসী অভাবের করাল ছোবলে হোসেনের সুখ-শান্তি উধাও হয়ে যায়। অভাবের বিধ্বংসী থাবায় হোসেনের নীতি-নৈতিকতায় ধস নামে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং স্ত্রীর প্ররোচনায় হোসেন নিজেও এক পর্যায়ে যোগ দেয় চৌর্যবৃত্তিতে। অভাব-অনটন ও দাম্পত্য কলহের জের ধরে স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে হোসেন এবং সেবা-শুশ্রূষার অভাবে মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে 'মুক্তি' গল্পে অভাবের তাড়নায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। হতদরিদ্র চেরাগ আলী ঝোঁকের মাথায় জায়গাজমি বিক্রি করে দূরদেশ থেকে বিয়ে করে এনেছিলো সুন্দরী জয়তুনকে। একপর্যায়ে তাদের কোলজুড়ে আসে সন্তান। কিন্তু এতে নির্মল আনন্দের পরিবর্তে সংসার বৃদ্ধির ফলে অভাব আরো ঝেঁকে বসে। আবার এরই মধ্যে শুরু হয় আকাল। অর্ধাহার-অনাহারে থেকে চেরাগ আলী আর জয়তুনের দিশেহারা অবস্থা; পরিণামে শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যেহেতু মূলত গৃহকর্তার আয়-উপার্জনের ওপর নির্ভর করে সেহেতু সংসারের অভাব অনটনের দায়ভারও বর্তায় গৃহকর্তা চেরাগ আলীর ওপর। তার নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রীর গঞ্জনা। দাম্পত্য ও পারিবারিক অশান্তি তীব্র রূপ ধারণ করে একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুতে। এই মৃত্যুর জন্য চেরাগ আলীর দারিদ্র্যকেই দায়ী করে জয়তুন। সন্তানের বিয়োগব্যাথায় পাগলপ্রায় হয়ে যায় সে। সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ চেরাগ মিলিটারির দালাল চৈতন দাসের কাছে ৫০ টাকার বিনিময়ে জয়তুনকে বিক্রি করে দেয়। সে মনে করে, এবার বুঝি মুক্তি পাওয়া যাবে দারিদ্র্যজীর্ণ এই সংসার জীবন থেকে, মৃত্যু থেকে পাওয়া যাবে নিষ্কৃতি।

সামন্তপ্রভু ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য

বিশ শতকের শুরুতে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘুণপোকার মতো ভেতরে থেকে সামন্তসমাজের ভাঙনের সূচনা করে। পুরনো মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা, অনুশাসন এবং রীতিনীতি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে শুরু করে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই প্রক্রিয়াটি ধীরগতিতে এলেও সময়ের পরিক্রমায় সেটি ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। সামন্তপ্রভুরা প্রাণান্ত চেষ্টা করে গ্রামজীবনে তাদের মৌরসি-পাট্টা জারি রাখতে; কিন্তু সময়ই তখন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। শোষণ ও নির্যাতনের পাল্লা ভারি করে সামন্তসমাজ চেষ্টা চালায় তাদের ক্ষয়িষ্ণু আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখতে। ফলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে সাধারণ প্রতিবাদী জনতার সাথে সামন্তপ্রভু ও তাদের বশংবদদের সংঘাতের ঘটনা বাড়তে থাকে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম-এর 'পৌষ' (*শাহের বানু*), 'অনেক দিনের আশা'(*অনেক দিনের আশা*), 'পৌষস্বপ্ন'(*অনেক দিনের আশা)*, 'দুর্যোগ' (*অনেক দিনের আশা*) 'কলাবতী' (*অনেক দিনের আশা)*, 'কালীদহের তীরে' (*অনেক দিনের আশা*), 'মৌসুম'(*অনেক দিনের আশা*) প্রভৃতি গল্পে গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের ওপর সামন্তপ্রভু বা মাতব্বরশ্রেণির দৌরাত্ম্যের বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজ মোটা দাগে দুটি ভাগে বিভক্ত : শোষক আর শোষিত। কৃষিজমি, নগদ টাকা বা নানা সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে শোষক শ্রেণি আবহমান কাল ধরে সাধারণ মানুষদের ওপর তাদের অত্যাচারের জোয়াল চাপিয়ে দেয়। দুর্দিনে ধার দেয়া টাকা পরিশোধ করতে না পারলে

ছিনিয়ে নেয় জায়গা-জমি। শুধু জমি গ্রাস নয়, নারীদের প্রতিও রয়েছে তাদের লোলুপ দৃষ্টি। তাই অসহায় নারীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের কামনা চরিতার্থ করতে চায়।

'পৌষ' গল্পে দরিদ্র কৃষক তাজু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে পৌষ মাসের। কেননা, 'চাষীজীবনের সেরা সময় পৌষ মাস; বুকে আসে অনেক শ্বাস, পায় অনেক আশা পূরণের আশ্বাস'। কিন্তু সে আশায় ছন্দপতন ঘটে যখন মনে হয়, ফসল বিক্রির সামান্য টাকায় শোধ করতে হবে ধারকর্জ। তাছাড়া এসময় মহাজনের লোকজন পাওনা টাকা সুদে-আসলে পরিশোধ করে নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। ফলে ফসলের হাতছানির মধ্যেও তাজুর মনে অহোরাত্রি জেগে থাকে সামন্তপ্রভু হলধর চক্রবর্তীকে অর্থ পরিশোধের তাগাদা। তার আশঙ্কা যে-মানুষ হলধর চক্রবর্তী, কোন দিক দিয়ে কোন প্যাঁচ কষে অধিকতর এক বিপদে ফেলবে তা ভাল করে খেয়ালও করতে পারবে না। ধান বিক্রির টাকায় মাকে একটি কাপড় কিনে দেবে, নাকি ধার শোধ করবে—এই টানাপড়েনে তাজু অস্থির। এজন্যই ধান বিক্রি করে হাট থেকে প্রায় পালিয়েই বাড়ি ফিরছিল তাজু; কিন্তু ঠিকই হলধর চক্রবর্তী আর তার বশংবদ হাকিম খাঁর চোখে পড়ে যায় সে। বাধ্য হয়েই টাকাটা তুলে দিতে হয় তাদের কাছে, কিন্তু হাতের সম্বল টাকাগুলো বাঁচাতে না পারার আক্ষেপ দ্রুতই আক্রোশে রূপান্তরিত হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাকিম খাঁকে আক্রমণ করে বসে তাজু। হাকিমও পাল্টা আক্রমণ করে তাজুকে। উত্তেজিত মুহূর্তে বেসামাল আচরণ করলেও পরক্ষণেই অনিশ্চিত পরিণতির আশঙ্কা গ্রাস করে তাজুকে। হলধর চক্রবর্তী হয়ত এবার তার ভিটেমাটি গ্রাসের সুযোগ পেয়ে যাবে—এই ভাবনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে সে এবং গল্পটির শেষ হয় শোষকশ্রেণির মনে শোষিতের প্রতি অনুকম্পা জাগবে, এ আশাবাদের মধ্য দিয়ে। 'শাহেরবানু' গল্পে দরিদ্র মৎস্যজীবী মাজেদের মাকেও দেখা যায় সামন্তপ্রভুর পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে; তাঁর ভাষ্যে নিঃসহায় মানুষের চিরন্তন আশঙ্কাই যেন মূর্ত হয়ে উঠে—অনেক টাকা বাকী পড়েছে, এখন হতেই ধীরে ধীরে শোধ করে না দিতে থাকলে কোন দিন কি বিপদ হয়ে যাবে, তখন আর উদ্ধারের উপায়ও পাওয়া যাবে না।

সমাজপতিদের নারীলিপ্সার প্রসঙ্গও এসেছে একাধিক গল্পে। 'অনেক দিনের আশা' গল্পের দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন নারী ফুলজান গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি বড়োমিয়ার ইন্দ্রিয়জ লোলুপতার শিকার। ফুলজান বড়োমিয়াকে নানাভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তবু নির্লজ্জ বড়োমিয়া 'হাতিনায় বসে পান চায়, তামাক চায়, চোখ নাচিয়ে মশ্‌করার চেষ্টা করে'। অবশেষে নিজের স্বার্থে নয়, বরং নিজের ভালোবাসার মানুষ চুরির অপরাধে ফেরারি আয়নদ্দিকে আইনের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই বড়োমিয়ার কাছে নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় ফুলজান।

'পৌষস্বপ্ন' গল্পের তালুকদারও এ শ্রেণির মানুষ। এ গল্পের দরিদ্র কৃষক মালেক ক্ষুণ্নিবৃত্তির আশায় তার স্ত্রী মকুকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে শহরে যাওয়ার আগে তালুকদারের কাছে নিজের জমি বিক্রি করে এবং বসতবাড়ি বন্ধক রাখে। কিন্তু সেখানেও ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। একপর্যায়ে অভাব-অনটনে বিপর্যস্ত মালেকের মৃত্যুর পর নিঃস্ব অসহায় মকু গ্রামে ফিরে এসে নিজের বাড়িতে পা রাখার সাথে সাথেই তালুকদারের আগমন ঘটে। মকুকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তালুকদার দাবি করে যে মকুর স্বামী মালেক কেবল বাড়ি বন্ধকই নয়, বিক্রিও করে দিয়েছে। কেবল বাড়ি গ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় না তালুকদার। মকুর দিকে সে তার লালসার হাতও বাড়িয়ে দেয়। নির্দয় এই পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার আর নির্মম বাস্তবতা মকুকে স্তব্ধ করে দেয়। এরই মধ্যে বন্য শিয়ালের হাতে মারা পড়ে মকুর কোলের সন্তান। এরপর তালুকদার যখন পুনরায় থাবা বিস্তার করে, তখন মকু ব্যর্থ হয় নিজেকে রক্ষা করতে। বন্য শেয়াল আর মানুষরূপী শেয়ালের থাবায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায় সে।

এ ধরনেরই আরেক দুশ্চরিত্র পুরুষ 'দুর্যোগ' গল্পের সুন্দর মিঞা তালুকদার। মিলিটারির ঠিকাদারি আর মন্বন্তরের সময় চালের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে সুন্দর মিঞা। এ গল্পের অসহায় নারী চরিত্র কাঞ্চনমালা। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে সে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে কাঞ্চনমালাকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় সুন্দর মিঞা। এক দুর্যোগের রাতে কাঞ্চনমালাকে অপহরণ করে সুন্দর মিঞার ঘরে নিয়ে আসে তার দুষ্কর্মের সহযোগী রহমান। সুন্দর মিঞা সুযোগ পায় তার কামনা চরিতার্থ করার। দুশ্চরিত্র সমাজপ্রভুর কাছে নারীর অসহায়ত্ব বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এ গল্পে। সমাজপতিদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণে পাশাপাশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর রুখে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্তও প্রচুর। 'দুর্যোগ' গল্পে দুশ্চরিত্র সুন্দর মিঞার একের পর এক কুপ্রস্তাবে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এক পর্যায়ে কাঞ্চনমালা কীভাবে প্রতিবাদী সত্তায় জাগ্রত হয় তা লক্ষ করা যায় নিচের উক্তির মধ্যে :

> মানে মানে সরে পড়ো তুমি–নইলে সারা গাঁয়ে একথা রটিয়ে দেবো। গাঁয়ের অনেক মেয়ে তোমার হাতে গেছে জানি–আমাকেও সে দলের ভেবো না। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১০৫)

গল্পের শেষে সুন্দর মিঞা যখন এক ঝড়বাদলের রাতে রহমানের মাধ্যমে কাঞ্চনমালাকে অপহরণ করে নিয়ে এসে তার নারীত্বের অবমাননা ঘটায়—বিধ্বস্ত, পর্যুদস্ত কাঞ্চনমালা তখন প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখে। লেখকের ভাষায় :

> ঝড়বাদল চিরদিন থাকবে না। সাধ্যমত সুন্দর মিঞা খুঁজুক আজ তার দেহে দুনিয়ার তৃপ্তি; নর্মশ্রান্ত হয়ে ঘুমাক। তারপর জাগবে কাঞ্চন। দেশলাই-এর একটি কাঠিতে এই অন্যায়ের পুরীতে আগুন জ্বেলে বাইরে যেয়ে দুনিয়ার [...] (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১০৯)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের অনেক গল্পেই তালুকদারের মতো এরকম বিবেকহীন প্রভাবশালীদের দেখা মেলে। এরকমই আরেকটি চরিত্র বৃন্দাবন চক্রবর্তী। 'কলাবতী' গল্পে হিন্দু কলাবতী ও মুসলিম মজিদের মধ্যে প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কলাবতী ও মজিদের জীবনে যে দুর্দশা ঘনিয়ে আসে তাতে ইন্ধন জোগানোর মাধ্যমে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার পরিকল্পনা করে বৃন্দাবন চক্রবর্তী। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধানো, মামলা মোকদ্দমায় প্ররোচিত করার মাধ্যমে কলাবতীর পিতা সুরেন দাসের সম্পত্তি দখল ও কলাবতীর পরিবারকে সমাজে একঘরে করাসহ নানা অপকর্ম করেই ক্ষান্ত হয়নি বৃন্দাবন চক্রবর্তী, কলাবতীর পরিবারের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কলাবতীকে ভোগ করতে চায় সে।

সামন্ত জমিদাররা তাদের কায়েমি স্বার্থকে রক্ষার প্রয়োজনে কিছু সহযোগী সৃষ্টি করেছিল। এদের মধ্যে জোতদার-তালুকদার যেমন ছিল তেমনি ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে লাঠিয়াল বাহিনী, যারা জমিদারের পক্ষে মারপিট থেকে শুরু করে শোষণ-নির্যাতন সবই করত। জমিদার এদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে যেমন পুরস্কৃত করত, তেমনি আদেশ পালনে অন্যথা হলে তাদের ওপর শাস্তির খড়্গ নেমে আসত। 'কালীদহের তীরে' গল্পে এমনই এক কুচক্রী জমিদারের কারণে পাশাপাশি দুটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং পরিণতিতে প্রাণহানিও ঘটে। 'মৌসুম' গল্পের সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরী। জমিদারদের প্রভাব ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হলেও দ্বারিকানাথ শোষণ-নির্যাতনের পথ থেকে সরে আসেনি। অনাবৃষ্টি শেষে বৃষ্টির আগমনে ভালো ফসলের সম্ভাবনায় আনন্দিত গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের মুখের হাসি সে সহ্য করতে পারে না। গ্রামের প্রতিবাদী যুবক রমানাথ ও তার পিতা সখানাথের ওপরই তার ক্ষোভ বেশি। শহরের ক্ষমতাশালী মহলের সাথে নিজের সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে চালের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সখানাথদের দুর্দশাকে প্রলম্বিত করার পরিকল্পনা করে সে। সখানাথের উদ্দেশে দ্বারিকানাথের স্বগতোক্তি তাঁর সামন্তসুলভ মানসিকতারই পরিচায়ক—

> মৌসুম না হয় পেয়েছো-ই, কিন্তু বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে যে আকাল কোন পুঁজি দিয়ে তাকে ঠেকাবে! আমার স্টক করা চালের দাম তখন চড়চড় ক'রে আরো বেড়ে যাবে। তখন কার দুয়ারে মাথা কোটো দেখবো না! (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১৫২)

এভাবেই শোষক শ্রেণি সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালাত। তাদের প্রতি সহানুভূতি-সহযোগিতা তো নয়ই বরং কূট কৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে দারিদ্র্যের নাগপাশে আবদ্ধ করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করত। যদিও সময়ের পরিক্রমায় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়। তরুণ কৃষকদের প্রতিবাদী মনোভাব এ গল্পটিকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

যুদ্ধ ও মন্বন্তরকালীন বাস্তবতা

ভারতবর্ষের জনজীবনে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালব্যাপী সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। "ভয়াবহতা, ব্যাপকতা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, জীবনহানি, ধ্বংসযজ্ঞ প্রভৃতি সবদিক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে (১৯১৪-১৮) অতিক্রম করে যায়" (আজিজুল, ১৯৯৮ : ২৭২)। এই যুদ্ধে সাত কোটিরও বেশি সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যের প্রাণহানি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশ হিসেবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অবস্থান ছিল মিত্রশক্তির পক্ষে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপাল) প্রায় ৮৭ হাজার সৈনিক এই যুদ্ধে নিহত হন।[১] শুধু প্রাণহানি নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির প্রভাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকার সমস্যা, যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ, মজুতদারি, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট 'সেই সঙ্গে আসে মেদেনীপুরের ঝড় (অক্টোবর ১৯৪২) এবং দামোদরের বন্যা (১৯৪৩)। এই পরিস্থিতির শীর্ষবিন্দু হয়ে ওঠে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর (স্বপন ও হর্ষ, ২০০০ : ১১১)। এই মন্বন্তর প্রধানত গ্রামবাংলার জনজীবনে নিয়ে আসে চরম বিভীষিকা, দুর্ভাগ্য।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের শেষপ্রহর (*শাহের বানু*), পথ জানা নাই (*পথ জানা নাই*), অনেক দিনের আশা (*অনেক দিনের আশা*), হঠাৎ (*অনেক দিনের আশা)*, জীবনের শুভ অর্থ (*পথ জানা নাই*), বজ্র (*পথ জানা নাই*) প্রভৃতি গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। বিশেষত, যুদ্ধোত্তর সংকট, মন্বন্তর, খাদ্যাভাবে মানুষের মৃত্যু, মানবেতর জীবনযাপন, কর্মসংস্থানের অভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হওয়া, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পতিতাবৃত্তি, নারীব্যবসা প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পগুলোতে রূপায়িত হয়েছে।

'পথ জানা নাই' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটময় পরিস্থিতির জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে। 'মাউলতলা' নামে বহির্জগতের সাথে সম্পর্কবিহীন প্রান্তবর্তী একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এ গল্পের আখ্যান পরিকল্পিত। নানা রাজশক্তির উত্থান-পতন, বণিকসভ্যতার স্পর্শ, ইংরেজ শাসনের দৌরাত্ম্য কোনো কিছুই মাউলতলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী একটি সড়ক মাউলতলার মানুষদের জীবনে নিয়ে এসেছিল আকস্মিক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। মাউলতলার মানুষ ভেবেছিল এ সড়ক তাদের যুক্ত করবে সম্ভাবনার সোনালি আলোয় ভরা শহরের সঙ্গে, তাদের জীবনের অপূর্ণতাগুলোকে ভরে দেবে পূর্ণতার সম্ভারে। তবে দরিদ্র কৃষক গহুরালীর মতোই মাউলতলার মানুষগুলো অনেক মূল্য দিয়ে বুঝলো যে পথ সবসময় সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধিকেই নিমন্ত্রণ করে আনে না। কোনো কোনো পথ একই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনে দুর্ভাগ্য আর দুরাশাকেও। সড়কটি নির্মাণের ফলে গ্রামের অভাবগ্রস্ত মানুষগুলো শহরে কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায় ঠিকই, তবে একই সঙ্গে শহরের কুটিলতা আর কূটকৌশলও গ্রামে প্রবেশ করে; বদলে দেয় মাউলতলাবাসীর সহজ-সরল জীবনকে—"এই পথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানিতেও ছুটোছুটি শুরু হইল ধীরে ধীরে। শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগিলো কূটবুদ্ধি আর

কৌশলের দড়িজাল" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ১৭৩)। ক্রমেই মাউলতলার জীবন হয়ে ওঠে জটিল, শঙ্কাগ্রস্ত। শুরু হয় দলাদলি, হানাহানি; ঘটে যায় খুনের মতো ঘটনা। তাই রাস্তার প্রধান উদ্যোক্তা জোনাবালী গ্রামের মানুষদের ভর্ৎসনা করে—'সড়ক কি এয়ার লাইগা বানাইছিলাম আমরা? আকাট মুর্খ জানোয়ারের দল!'। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে আক্রান্ত হয় নির্জন গ্রাম মাউলতলাও। দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনেও যা ঘটেনি এবার তাই ঘটল এ অঞ্চলে :

> চাল-ডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের। কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এ সড়ক বহিয়াই আসিল মন্বন্তর, আসিল রোগব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ১৭৪)

এই জোয়ারে শহর থেকে আসতে থাকে দুর্নীতিবাজ নানা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, মিলিটারির দালাল। শহর থেকে আসতে থাকা এসব মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে গ্রামের মানুষদের। যার পরিণামে শহরের সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ করে যে লুৎফর, তার সাথে আজগরউল্লাহর কন্যা কুলসুম উধাও হয়ে যায়; লড়াই-ফেরত ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ঘটনাচক্রে গহুরালীর স্ত্রী হাজেরাও একদিন উধাও হয়ে যায় মিলিটারির দালালের সঙ্গে। রাগে দুঃখে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে গহুরালী। নতুন রাস্তাটিকেই তার এবং গ্রামবাসীর জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে কোদাল দিয়ে রাস্তাটিকে কোপাতে থাকে সে। সেই সঙ্গে স্বগতোক্তি করতে থাকে—"ভুল অইছিলো এই রাস্তা বানাইয়া। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না; ঠিক অয় নাই।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ১৭৬)

'শেষ প্রহর' গল্পে মন্বন্তরের প্রভাবে দরিদ্র গ্রামবাসী সর্বগ্রাসী অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হয়ে ওঠে। ঘরে সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষিত হবার পর সবাই ধার-কর্জ করে ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে। কিন্তু চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে দ্রুতই নাগালের বাইরে চলে যায়। এ পরিস্থিতিতে হোসেনের মত দরিদ্র মানুষেরা শেষ চেষ্টা হিসেবে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। 'অনেক দিনের আশা' গল্পে দেখা যায় আয়নদ্দির মতো সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনে কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তেতাল্লিশের মন্বন্তর। একসময় আয়নদ্দির আত্মীয়-পরিজন সহায়-সম্বল সবই ছিলো। কিন্তু 'আকালের বছর অভাব আর মহামারীর ঝাপটে' আয়নদ্দি সবই হারালো। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রবল বাসনায় নিরুপায় আয়নদ্দি এক পর্যায়ে চৌর্যবৃত্তিকে বেছে নেয় পেশা হিসেবে। মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী অভাব-দারিদ্র্য কেবল মানুষের মুখের আহারই কেড়ে নেয় না; কেড়ে নেয় মূল্যবোধ আর নীতি নৈতিকতাকেও—যা ধনী-দরিদ্র সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ধনীরা যেমন মন্বন্তরের সুযোগে নিজের আখের আরো ভালোভাবে গুছিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করে, দরিদ্ররাও তেমনি সর্বস্ব হারিয়ে যেনতেনভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক মরণপণ সংগ্রামে মেতে ওঠে। মন্বন্তরের প্রভাবে তরুণ মনের স্বপ্নসাধ কীভাবে ভেঙে গুড়িয়ে যায় তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'হঠাৎ' গল্পে। সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী কিশোর রত্তনের হৃদয়ে ঝড় তোলে কুলসুম নামের এক অপরিচিত কিশোরী। দুজনের মধ্যে দ্রুতই গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা। কুলসুমকে নিয়ে নানারকম স্বপ্ন-কল্পনার জাল বোনে দরিদ্র কৃষকের সন্তান রত্তন। এরই মধ্যে তার পিতা এলালদ্দি সুন্দরবন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করার একটি কাজ ঠিক করে রত্তনের জন্য। চল্লিশ টাকা মাস মাইনের আকর্ষণীয় এই কাজের খবর রত্তনের দরিদ্র পিতামাতার মনে আনন্দের ঢেউ তুললেও কুলসুমকে হারানোর আশঙ্কায় রত্তনের মন বিষাদে ছেয়ে যায়। তার মনে হয়—'চারিদিকে তার স্বপ্নসাধ চুরমার করে দেবার জন্য কী এক ষড়যন্ত্র তৈরী হয়েছে, মনের কোনো সুকুমার কামনা বাসনার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না তারা।' খালের পাড়ে সৌন্দর্যের পসরা সাজানো পলাশ আর মাদারের রঙ তার মনকে

কুলসুমের জন্য আকুল করে তুললেও পরিবারের কথা চিন্তা করে নিজের মনকে শক্ত করার চেষ্টা করে রত্তন :

> কিন্তু না। তার কথা ভাববে না আর। এই আকাল ছিন্নভিন্ন করেছে সংসার, কেড়ে নিয়ে গেছে আত্মীয়স্বজন, দুঃখ-কষ্টে ভরে তুলে দুর্বিসহ করেছে জীবন, এমন কী হৃদয়ো তার চাপে চুরমার! এদিনে না মূল্য আছে জীবনের, না ভালোবাসার। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ৮৩)

'জীবনের শুভ অর্থ' গল্পে দেখা যায় মন্বন্তরের কারণে গ্রাম থেকে দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য মানুষ ভিড় করেছে শহরের রাস্তায়-অলিতে-গলিতে। ক্ষুধা-অনাহারে পর্যুদস্ত এসব মানুষের কাছে মনে হয়, শহরেই আছে তাদের ক্ষুধা-নিবারণের নিশ্চয়তা। কিন্তু সেখানেও তাদের অতিবাহিত করতে হয় মানবেতর জীবন, পড়তে হয় তীব্র অস্তিত্ব সংকটে। অন্যদিকে অনাহারে ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত এসব মানুষ নাগরিক জীবনে কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে–এমন আশঙ্কায় ভুগতে থাকে শহরের মানুষ। এরকমই একজন ব্যক্তি লোকনাথ দত্ত। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান লোকনাথ দত্ত এখন বিপুল বৈভবের মালিক। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা বুভুক্ষু মানুষের স্রোত তাকে বিচলিত করে তোলে। লেখকের বর্ণনায় :

> অম্বিকা চৌধুরীর বাড়ির সামনে ঐ ভয়ানক ভিখিরিদের কী বিতরণ করা হচ্ছে? ফুটপাতের ওপর অমন লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে কোন অমৃতের প্রতীক্ষা করছে ওরা? যেদিকে তাকান–ফুটপাথে, আইল্যান্ডে, দরজাবন্ধ বাড়ীর রোয়াকে রোয়াকে ঐ অদ্ভুত বুভুক্ষু জনতা কোন ফাঁকে পঙ্গপালের মতো এই শহরকে ছেয়ে ফেললো, ভেবে কী এক ভয় তাঁকে বিষন্ন করে আনলো। (শামসুদ্দীন, ১৯৫৩ : ৪৯)

তেতাল্লিশের মন্বন্তরের বিপুল বিস্তৃত থাবা গ্রামের সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে তার আরেক বাস্তবতা প্রতিভাত হয়েছে 'বজ্র' গল্পে। কর্মসংস্থানের খোঁজে গ্রামের বাস্তুহারা নিরন্ন মানুষ আশ্রয় নেয় শহরের ফুটপাথে। জীবনধারণের অনিবার্য তাগিদে গ্রামের কৃষক হয় শ্রমিক, অর্থের প্রয়োজনে চাকুরিসূত্রে গ্রাম থেকে ছুটে আসা অসহায় অস্তিত্বহীন মানুষ নীতিভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়, বেছে নেয় পতিতাবৃত্তির মত গ্লানিকর জীবন। এ গল্পের সহজসরল পল্লিবালিকা ফুলিও পতিতাবৃত্তির মতো নির্মম জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয় জীবনের তাগিদে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ার ক্ষণিকের শরীরী আনন্দে নিঃস্ব হৃদয়ের জ্বালা জুড়ানোর জন্য দেহপসারিণীর গৃহে রাত্রিযাপন করে। কিন্তু অচিরেই আবিষ্কার করে এই নারী আর কেউ নয়, তারই আদরের ছোটবোন ফুলি। নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আনোয়ার।

মন্বন্তর ও তৎপরবর্তী সময়ের নানা অরাজকতা ও নীতিহীনতার অন্যতম উদাহরণ নারীব্যবসা। 'কলাবতী' গল্পের নামচরিত্র কলাবতীর জীবনের করুণ পরিণতি সমাজে নারীর অসম্মানজনক অবস্থানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মুসলিম যুবক মজিদের সাথে কলাবতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, এর পরিণতিতে প্রেমিক মজিদের মৃত্যু এবং সেই অপরাধে কলাবতীর পিতা সুরেন দাসের জেলদণ্ড, সামন্তপ্রভু বৃন্দাবন চক্রবর্তীর ষড়যন্ত্রে কলাবতীর পরিবারের একঘরে হওয়াসহ নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলাবতীর জীবনে একের পর এক দুর্দশা দেখা দিতে থাকে। অভাব-অনটনে জর্জরিত, সমাজের চোখে নিগৃহীত এবং দুর্ভাগ্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত কলাবতীর জীবনে শেষ আঘাতটি আসে তাদের পরিবারের ছদ্ম-শুভাকাঙ্ক্ষী মহিমের মাধ্যমে। মিলিটারির কনট্রাক্টর এক পাঞ্জাবি শিখের রাঁধুনি হিসেবে চাকুরি জুটিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে কলাবতীকে নিয়ে যায় মহিম। পরিশেষে অর্থের বিনিময়ে কলাবতীকে তুলে দেয় নারী পাচারকারী চক্রের হাতে।

পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও বিবাদ-বিসংবাদ

পল্লিবাংলার মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের চেয়ে পারস্পরিক প্রীতিময় সম্পর্কই বেশি চোখে পড়ে। যন্ত্রসভ্যতায় অভ্যস্ত শহরবাসীর তুলনায় এখানেই তারা ব্যতিক্রমী। বিপদে পড়লে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না। 'শেষপ্রহর' (*শাহেরবানু*) গল্পের হাজী সাহেব এমনই একজন মানুষ যাঁর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পের দরিদ্র-অসহায় কৃষক হোসেনের প্রতি তার সহানুভূতিশীল আচরণের মাধ্যমে। হোসেনের জীবনের নানা দুর্যোগে হাজী সাহেব ছিলেন তার পরম আশ্রয়। আর তাই হোসেনের কাছে তিনি ছিলেন 'খোদারই মূর্তিমান স্নেহাশীষের মতো'। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ কাসেম খাঁ আর তার 'মুনিষ' সাদেকের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, যা মালিক ও শ্রমিকের প্রথাগত সম্পর্কের পরিধি ছাড়িয়ে এক মহত্তর পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হয়। গল্পে দেখা যায়, সাদেকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে-বাগানে কাজ করে গৃহস্থ কাসেম খাঁ। আবার কাসেম খাঁর প্রতিনিধি হয়ে একাই ভাটি অঞ্চলে চলে যায় সাদেক, সেখানকার জমি মুনিষদের হাতে বন্দোবস্ত দেয়ার ভারও বর্তায় সাদেকের ওপর। এক পর্যায়ে সাদেক গুটিবসন্তে আক্রান্ত হলে কাসেম খাঁ তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে এবং পরিবারের একজন সদস্যের মতই সেবাশুশ্রূষা করতে থাকে। গ্রামের লোকজন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত সাদেকের সাথে কাসেম খাঁর এই ঘনিষ্ঠতায় আপত্তি জানিয়ে তাকে 'গুটিঘরে' রেখে আসতে বলে। কিন্তু সাদেকের এই অবস্থায় তাকে দূরে সরিয়ে দেয়নি কাসেম খাঁ। দারিদ্র্যের নিষ্পেশনে জীবন অতিষ্ঠ হলেও বিপদে-আপদে পাড়া প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজনের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা গ্রামবাংলার মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত আহার্য যেমন প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, আবার অনেক সময় নিজেদের দু-মুঠো অন্নের সংস্থান না হলেও প্রতিবেশীদের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনে পিছিয়ে থাকে না এসব মানুষ। *মজা গাঙের গান* গল্পগ্রন্থের নামগল্পে দরিদ্র বৃদ্ধা বরুজান ও তার প্রতিবেশী ছদু শেখের পরিবারের মধ্যে এমনই সৌহার্দ্যময় সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। মজা গাঙের গান থেকে সামান্য কিছু মাছ ধরে সেখান থেকে প্রতিবেশিনী বরুজানকেও কয়েকটি মাছ উপহার দেন ছদু শেখ। আবার বরুজানও ছদু শেখ ও তার স্ত্রীকে সাধ্যমত আপ্যায়নের চেষ্টা করে।

তবে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতিময় সম্পর্কের পাশাপাশি অনেক সময় অহেতুক দ্বন্দ্বেও জড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসী। জমির ভাগ-বাটোয়ারা কিংবা পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ গ্রামীণ সমাজের এক চিরপরিচিত চিত্র। এই বিবাদ-বিসম্বাদ কখনো ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, আবার কখনো বা এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও জেদের কারণে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় বংশপরম্পরায় চলতে থাকে এটি। 'কালীদহের তীরে' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে কালীদহের খালের দুই পাশে দুই গ্রাম–পূবকান্দা ও পাঁচআনি। এ দুই গ্রামের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে তীব্র বিবাদ। দুই গ্রামের দুই মাতবর আসগর ও করিমের পিতামহেরা ছিলেন জমিদারের লাঠিয়াল। দুই লাঠিয়াল সর্দারের পারস্পরিক বিরোধ থেকে দুই গ্রামের মানুষের দীর্ঘস্থায়ী মতবিরোধের শুরু, যা এখনও বর্তমান। সেই বিবাদ এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে—

> [...] এ গাঁয়ের লোক ও-গাঁয়ের পথে হাঁটে না। হাটে বা গঞ্জে পারতপক্ষে সামনাসামনি পড়ে না। যায় না একই নদীতে ইলিশ মাছের দিনে। হাটে বা গঞ্জে এ-গাঁয়ের লোক কোনো জিনিসের দর আট আনা করলে ও-গাঁয়ের লোক তা ডবল দামে কিনে নাকের সামনে দিয়ে উঁচিয়ে নিয়ে যায়। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ৮৮)

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কৈলাস সাহার চেষ্টায় দুই গ্রামের বিবাদ ক্রমশ থিতিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সেটি গুরুতর রূপ ধারণ করে। এরই মধ্যে আসগর সর্দারের গরু করিম সর্দারের ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার

ঝামেলার সূত্রপাত হয়। দ্রুতই সেটি দুই গ্রামের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়। লেখকের বর্ণনায় :

> [...] দুই চোখে আগুন জ্বেলে অজগরের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে আহত গোরুসহ বাড়ীর দিকে ছুটে চলে গেলো আসগর। ঘরের বারান্দার আড়া থেকে লেজা-ঢাল নামিয়ে উঠোনে লাফিয়ে পড়লো। তারপর নুয়ে মাটির দিকে চেয়ে ডান হাত মুখের কাছে দ্রুত কাঁপিয়ে আ-আ করে একদমে এক প্রচণ্ড ডাক তুলে, ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে খাড়া হয়ে জেলাবোর্ডের পথের দিকে ছুটে গেল। সে ডাক শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলো মধ্যাহ্নের পাঁচআনি। জোয়ান পুরুষেরা উদ্যত কানে দিক-নিশানা করে হাতের কাছে লেজা-সড়কী যে যা পেলো তাই নিয়ে ছুটে বেরুলো। অনেকদিন পরে ষাট সত্তর জোড়া পায়ের তলায় জেলাবোর্ডের পথের ধুলো উড়লো। পাঁচআনির বাল-বনিতা ঝি-বউদের রক্তস্রোত হিম হয়ে এলো তাদের আকাশ-ফাটানো গাজী-গাজী ধ্বনিতে নিষ্কম্প ভয়ে। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ৮৫)

দুর্ভাগ্যক্রমে কৈলাস সাহা বাড়িতে না থাকায় এবার আর এই বিবাদ থামানোর কেউ ছিল না। জেলা বোর্ডের সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে প্রথমে চললো গালিগালাজের তুবড়ি, তারপরই শুরু হয়ে গেল পুরোদস্তুর 'যুদ্ধ'; যার পরিণতিতে করিম সর্দারের ছেলে 'স্বাস্থ্যসবল সুদর্শন নওজোয়ান' ছেলে জামাল আহত হয় এবং তার করুণ মৃত্যু ঘটে।

ভূসম্পত্তির অধিকার নিয়েই গ্রামের অধিকাংশ বিবাদের সূচনা হয়, যার রেশ থেকে যায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। 'বাঁদর' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেরামত আলী ও প্রতিবেশী সিকান্দরও বংশানুক্রমিক শত্রুতায় আক্রান্ত, যার উৎস জায়গা-জমি নিয়ে বিবাদ। 'তারা গত হবার পর ঘটনা আর গড়ায়নি, কিন্তু উভয়পক্ষ থেকেই কথা বন্ধ, বন্ধ সামাজিকতাও।' এক পর্যায়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। কেরামত আলীর নববিবাহিত বধূর প্রতি কুনজর পড়ে সিকান্দরের। এজন্য কৌশল হিসেবে কেরামতের মন জয়ের চেষ্টা করে সে, আর টোপ হিসেবে ব্যবহার করে জমিজমাকে। অবার গ্রামীণ সমাজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুটো শ্রেণির মধ্যেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতও পরিলক্ষিত হয়। 'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের প্রতিনিধি জমিদার দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর সাথে গ্রামের উঠতি মাতবর সখানাথ ও তার পুত্র রমানাথের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে বিরাজমান শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। রমানাথ ও তার পিতা জমিদারির জোয়াল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে সাধারণ মানুষকে, আর এ থেকেই জমিদার দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে তাদের। জমিদারশ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার বিপুল পার্থক্য ধরা পড়ে সখানাথের নিম্নোক্ত খেদোক্তিতে :

> তারা যে চাষা এটা তো নোতুন কথা নয়। ওরা জমিদার, ওদের সুখদুঃখ হাসি-কান্নার সাথে তাদের আসমান-জমিন ফারাক। ওরা এক জাত তারা অন্য। তাদের সর্বনাশেই তো ওদের পৌষমাস। এই তো রীতি। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১৪১)

সাধারণ মানুষের শ্রমে-ঘামেই রচিত হয় শাসকদের ক্ষমতার ভিত্তি। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে এই সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না তারা; তাদের চোখে এসব মানুষ কেবল ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়িমাত্র। আর এ কারণেই, ক্ষমতাবানদের দাসত্ববৃত্তিই হয়ে দাঁড়ায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোর একমাত্র কাজ।

গ্রামীণ লোকাচার ও সংস্কার

শহরের তুলনায় গ্রামের সমাজ-সংস্কৃতি এবং লোকাচার ভিন্ন রকম। বিশেষ করে উৎসবে পার্বণে শহরের মানুষের উদযাপনের সঙ্গে গ্রামের মানুষের উদযাপনের মাত্রা এবং প্রকৃতিগত

পার্থক্য রয়েছে। আবার গ্রামাঞ্চলেও লোকাচারের ভিন্নতা রয়েছে যা প্রকৃতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। গবেষকের ভাষায়—

> মানব-সংস্কৃতির যে-কোনো অংশের মত, লোকসংস্কারও ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক প্রভাবের আওতায় পড়ে। সমতলভূমিতে যে লোকসংস্কার গড়ে ওঠে, পাহাড়ী অঞ্চলে তা অচল। উপজাতিসমূহের মধ্যেও লোকসংস্কার ভিন্ন ভিন্ন হয়। [...] কিন্তু অনেক সময় এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের, বা এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশের, এমনকি এক মহাদেশের মানুষ অন্য মহাদেশের লোকসংস্কারকে গ্রহণ করে এবং তা নিজেদের মত করে পরিবর্তিত করে নেয়। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৭০)

পল্লি জনগোষ্ঠীর লোকাচারের মধ্যে এক ধরনের সহজাত সৌন্দর্য আছে, এতে নেই আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি। পল্লি প্রকৃতি যেমন উদার ও উন্মুক্ত, পল্লিবাসীর জীবানাচারও তেমনি উদার। সময়প্রবাহে তাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়া লাগলেও গ্রামীণ লোকাচারের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও প্রায় অটুটই আছে। বাংলাদেশে স্থানভেদে লোকাচারের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবই লক্ষণীয়। 'এই ভূখণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের জাতিগোষ্ঠীর লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে নানা প্রথা-পার্বণ, আচার-উৎসব গড়ে উঠেছে' (ওয়াকিল, ২০০৭ : ৩১৭)। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রাচুর্য না থাকলেও ছিল স্বস্তি, আর ছিল অফুরন্ত অবসর। অবসর জীবনে বিনোদনের উপাদান হিসেবে নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা যাত্রাপালা-পাঁচালি, কথকতা-গান আর নাচের উৎসবের আয়োজন হতো। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে যেসব লোকাচারের প্রচলন দেখা যায় সেগুলো সাধারণত গ্রামীণ মানুষদের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকাকেন্দ্রিক। যেমন : মানুষের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, ধর্মীয় আচার, রোগ-ব্যাধি এবং পেশা সংক্রান্ত নানাপ্রকার লোকাচার। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পেও গ্রামীণ লোকাচারের নানা অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে।

নবান্নের সময় গ্রামের প্রতিটি ঘরে ধানকাটা, ধান মাড়াইসহ নানারকম কাজের ব্যস্ততা শুরু হয়। অনেক সময় রাতভর কাজ করে মানুষ। সারাদিন মাঠ থেকে ধান কেটে এনে সন্ধ্যার পর গৃহস্থ, মুনিষ, ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই মিলে বাড়ির উঠোনে কাজ করে। তাদের টানা কাজের ক্লান্তি কিছুটা দূর হয় কারো মুখে পালা-পুঁথি গান বা গল্প শুনে। অনাবিল আনন্দ নিয়ে তারা সবাই মিলে কাজ করে। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে এরকমই এক আনন্দমুখর নবান্ন উৎসবের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'মুনিষ'দের সাথে নিয়ে বাড়ির মানুষদের রাতভর ধান মাড়ানো, সেই সাথে আড্ডা ও খোশগল্পের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় এ গল্পে। একপাশে পানের বাটা নিয়ে বসেছে বাড়ির মেয়েরা, সেখান থেকে পান আসছে কর্মরত মানুষগুলোর কাছে। এভাবেই নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে লেখকের বর্ণনায়।

বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেক উপাদানই প্রকৃতিজাত বা প্রকৃতিনির্ভর। বছরভর প্রকৃতির অঙ্গনে ঘটে চলা নানা পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নানা প্রথা আর রীতিনীতি অনুসরণ করতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের। 'বস্তুত লোকাচারগুলি হলো এ দেশবাসীর আজন্মলব্ধ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অঙ্গ। মানবজীবন নানা আশঙ্কা ও ভীতি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তা ইত্যাদি অভিব্যক্তির মধ্যে আবর্তিত হয়। এর সঙ্গে রয়েছে দৈবশক্তির সহাবস্থান (ওয়াকিল, ২০০০ : ৩১৭)।' দরিদ্র, অসহায়, নিরক্ষর মানুষরা তাদের জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিজনিত ভয় ও শঙ্কা থেকে লৌকিক, অলৌকিক, নৈসর্গিক শক্তিসমূহকে সমীহ ও তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কৃষিপ্রধান বাংলার মাটি উর্বর ও কৃষির উপযোগী হলেও কখনো কখনো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির কারণে চাষাবাদ ও ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়। এরকম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আশায় মানুষের দৈবিক বিশ্বাস ও

বৈষয়িক কল্যাণ কামনা থেকেই নানা আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব। 'অনেক দিনের আশা' গল্পগ্রন্থের 'মৌসুম' গল্পে টানা অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহানির আশঙ্কা থেকে বৃষ্টির জন্য নানা রীতি-রেওয়াজ পালন করে গ্রামের কৃষকরা। লেখকের বর্ণনায় :

> শুরু হয় জলের জন্য কতো রকম কান্নাকাটি। ধূমধাম ক'রে এই সেদিন নীলপূজো করেছে, এবার মানে পীরের দরগায় সিন্নি, জনে জনে মানত করে, বাড়ি বাড়ি কীর্তন দেয়, এমনকি মৌলবী ডেকে দল বেঁধে শুকনো ক্ষেতে নেমে মিলাদও পড়ে। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১৩৮-১৩৯)

অনাবৃষ্টির সময় যেমন, তেমনি আবার আকস্মিক নানা বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে মিলাদ পড়ানো, দরগায় সিন্নি দেওয়া ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান পালন করে গ্রামের মানুষ। 'মূলধন' (*শাহেরবানু*) গল্পের দরিদ্র কৃষক মেনাজের জীবনের বেঁচে থাকার অবলম্বন 'মনু' নামের একটি গরু। হঠাৎ গ্রামে মহামারী আকারে দেখা দেয় গো-মড়ক। এ অবস্থায় সন্তানতুল্য মনুকে হারানোর শঙ্কায় মেনাজ পাগলপ্রায়। মনুর কল্যাণ কামনায় তাই মেনাজ মিলাদের আয়োজন করে।

পল্লিবাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা শহরের তুলনায় অনেক নাজুক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, যা গ্রামের স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে আরো সঙ্গীন করে তুলেছে। গ্রামের মানুষ আবহমানকাল ধরেই ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ইত্যাদি লৌকিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় আস্থাশীল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পল্লি অঞ্চলের মানুষ এসব চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল। 'লোক-চিকিৎসার মূলে আছে অজ্ঞানতা-প্রসূত নানা প্রকার লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার' (ওয়াকিল, ২০০০ : ১৬৯)। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে গুটিবসন্তের কারণে গ্রামীণ জীবনে সৃষ্ট আশঙ্কা ও অস্থিরতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষিশ্রমিক সাদেকের গায়ে 'বসন্তের স্ফোটক' দেখা দিলে তার নিয়োগকর্তা কাসেম খাঁ সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু বসন্তের রোগীর প্রতি কাসেম খাঁর এই আন্তরিক আচরণ গ্রামের মানুষের ক্ষোভ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিণতিতে—

> কাসেমের বাড়ীতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেলো। হিতৈষীরা দূর থেকে উপদেশ ছুঁড়তে লাগলেন–ও রোগ বড়ো সাংঘাতিক, কাসেম খাঁ! ওরে সরাও, নইলে গ্রাম উজাড় অইয়া যাইবে। কেউ কেউ বললেন–তুমি যা হয় একটা কিছু করো, নইলে পুলিশে খবর দিমু–গুটিঘরে লইয়া যাও।[২] (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ৬৪-৬৫)

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে অসুস্থ একজন মানুষের সেবা-শুশ্রূষা তো দূরের কথা, বরং সমাজের কাছে সে অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হয় যা তাকে মানসিকভাবে আরো দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া গুটিঘরে নেয়ার যে প্রক্রিয়া সেটিও অত্যন্ত অমানবিক, যা রোগীর রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে তাকে আরো শোচনীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়।

নগরসভ্যতার প্রভাব

গ্রামনির্ভর বাংলার সমাজজীবনে নগরসভ্যতার প্রভাব ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সুবাদে নাগরিক জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য যেমন গ্রামজীবনে প্রবেশ করেছে, তেমনি নগরের আকর্ষণে গ্রামত্যাগের একটি প্রবণতাও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কাজের খোঁজে কিংবা মন্বন্তর ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও গ্রামের মানুষ বিপুল সংখ্যায় শহরমুখী হয়েছে। তবে শহর যে সবসময়ই তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত স্বস্তি এনে দিতে পেরেছে তা বলা যাবে না। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে গ্রাম ও শহরের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নানাভাবে ধরা পড়েছে।

ক্রমবিকাশমান নগরসভ্যতার প্রভাবে গ্রামের নিস্তরঙ্গ শান্তিময় জীবন নানা নেতিবাচকভাবে প্রভাবের শিকার হওয়ার বিষয়টিকেই মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। মন্বন্তরের প্রভাবে গ্রামে অন্নাভাব দেখা দিলে পরিবার পরিজন নিয়ে নিরুপায় হয়ে শহরে ছুটে যায় গ্রামের মানুষ। সেখানকার লঙ্গরখানাগুলোই তখন হয়ে দাঁড়ায় তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। এভাবে সাময়িক ক্ষুধানিবৃত্তি ঘটলেও শহরে স্থায়ীভাবে মাথা গোঁজার সুযোগ অনেকেরই কপালে জোটে না। বাধ্য হয়ে ফের গ্রামের দিকেই যাত্রা করতে হয় তাদের। সেখানে এসে পুনরায় আগের জীবনে ফিরে যাওয়া অনেকের জন্যই হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য, যা কারো কারো জীবনে মর্মান্তিক পরিণতিও ঘটায়। 'ক্ষুধা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের আমেনা দুর্ভিক্ষের সময় সপরিবারে শহরে চলে যায়। সেখানে তার স্বামী ও পুত্র দুজনেরই মৃত্যু ঘটে বসন্তরোগে। সর্বস্ব হারিয়ে হতাশ, বিষণ্ন আমেনা ফিরে আসে গ্রামে। ভেবেছিল আগের মতই ধান ভেনে, ঝরা-ধান কুড়িয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করবে। কিন্তু দেখা গেল, নগরসভ্যতার প্রভাবে এখানেও তার জন্য হতাশাজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিকাজে যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবহারের কারণে এখন আর আমেনার মতো কৃষিশ্রমিকদের কোনো চাহিদা নেই। গল্পের একটি বর্ণনাংশ :

> কিন্তু যে বাড়িতে বরাবর ধান ভানিত, সেখানে গিয়া শুনিল যে তাহারা যতোটা সম্ভব নিজেরা এবং বাকিটা ঝালকাটির কলে ভানাইতেছে, সুতরাং এবারে তাহাদের কোনো লোকের প্রয়োজন নাই। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১১০)

একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল 'পৌষস্বপ্ন' গল্পের মকুও। সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় স্বামী-সন্তান নিয়ে শহরে গিয়েছিল সে। সেখানে গিয়ে অকালে স্বামীকে হারিয়ে গ্রামে এসে সে দেখল, যন্ত্রের দাপটে তার চেনা জীবিকাই এখন হুমকির সম্মুখীন। যেখানে সে ধান ভানত সেই সর্দারবাড়ির বড়োবউয়ের ভাষ্যে পরিবর্তিত সময়েরই চিত্র ফুটে উঠেছে —'আমাদের সব ধান এবার কলে ভানাচ্ছে। [...] তাতে খরচা অনেক কম পড়ে। ধান ভানার জন্য এবার আর কাউকে রাখবোনা।' (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ২৮)

পুঁই ডালিমের কাব্য গল্পগ্রন্থের 'লালবাত্তি' ও 'কায়-কারবার' শীর্ষক দুটি গল্পে পল্লি জীবনে নগরায়নের প্রভাবে গ্রামীণ জীবনের বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'কায়-কারবার' গল্পে আজাহার মল্লিক নামে এক চড়নদার গ্রামে আসে হোগলা ও ছন কিনে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার এই প্রস্তাবে অধিকাংশ গ্রামবাসীই মনঃক্ষুণ্ন হয়। তাদের কেউ কেউ এটি নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে না। আইনদ্দি নামে এক গ্রামবাসীর তির্যক মন্তব্য—'মাছ গেছে, সাপ গেছে, গেছে ব্যাঙ বান্দর, এইবার ঘাস ধরিয়াও টান পড়ছে। কেন, ঐ শহর-বন্দরের মানুষে এখন বুঝি ঘাসও খাইতে শুরু করছে?' শহরবাসীর বাণিজ্যিক লালসার কারণে গ্রামের চিরায়ত ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তাড়া করে কাউকে কাউকে। ধনু নামে এক বয়োবৃদ্ধের উক্তিতে এই আশঙ্কা প্রতিফলিত হয় :

> দেশ হইতে একে একে কলাটা-মুলাটা গেছে, এইটা গেছে সেইটা গেছে, এখন যেটুকু আছে এই দুই মুঠ ঘাস তার বদলায় কী পাওন যাইবে সেইটাও আগে বুঝিয়া লওন দরকার [...] হাটে বাজারে বান্দর সাপ গলুই ব্যাঙ কী মাছের খরিদ্দারদের ভিড় তো লাগিয়াই আছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখেন একটা গাছও চোখে পড়া ভার। কাঠের ব্যাপারিদের যাওয়া-আসা তবু কমে নাই। সেই যুদ্ধের কালে কী সাপ্লাইর নাম করিয়া সব উঠাইয়া লইয়া যাইতে শুরু করছিলো। কিন্তুক কায়-কারবারের বিষয় আমরা তো তেমন বুঝি সুঝিনা, তাই ভালো দামও ভাগ্যে জোটে না। (শামসুদ্‌দীন, ১৩৯৪ : ৬৮)

দারিদ্র্যের প্রকোপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত গ্রামবাসীর কাছে শহর হচ্ছে ইচ্ছেপূরণের এক স্বর্ণালি বন্দর। এ কারণে শহরের জীবন সম্বন্ধে তাদের মনে অনেক অনিশ্চয়তা আর সংশয়

থাকলেও শহর তাদেরকে চুম্বকের মতোই আকৃষ্ট করে। দরিদ্র কৃষক মুজফ্ফর ও তার স্ত্রীর কথোপকথনে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়—

> : মানুষ তো মানুষ। এখন মাটিও দেখি গাঁও গেরাম থেকিয়া উজার হইয়া যাইতে আছে। হুকায় মনের সুখে টান দিতে দিতে মুজফ্ফর বললো: হইবেই তো। শহর জিনিসটা কী কোনো ক্ষুদ্দুর ব্যাপার-স্যাপার। সেই খানেই তো রাজ-রাজত্ব, শরাফতি-উন্নতি। (শামসুদ্দীন, ১৩৯৪ : ৫২)

আবার একই সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরমুখী এই অন্তহীন স্রোতের পরিণতি নিয়েও আশঙ্কায় ভোগে তারা, যা মুজফ্ফরের স্ত্রীর উক্তিতে পরিস্ফুট হয়—

> ছোটকালে তো খাল ঝিলের মাছের উপর মালিকানার কথা শুনি নাই। এখন তার মাছ যায় শহরে, গাছপালা কাটিয়া কাঠ-লাকড়িও যায় শহরে, আনাজ-তরকারি, ফল, ফলারি তো যায়ই। এখন চতুর্দিক কাটিয়া কুটিয়া সবই ঐ শহরে নিয়া উঠাইলে একদিন মনে কয় ঐ শহর চারদিকে সাগর লইয়া একটি চরের মতোই ভাসিয়া থাকবে। (শামসুদ্দীন, ১৩৯৪ : ৫২)

উপকূল-সন্নিহিত গ্রামীণ জনজীবনের দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতাকে গল্পকারের নির্মোহতা ও স্বাপ্নিকের আবেগ দিয়ে বর্ণনা করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধমান প্রান্তবাসী মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রাম, সংকট ও সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন ছোটগল্পের ক্যানভাসে। এ জীবন কাছ থেকে দেখা তাঁর, এ মানুষগুলো তাঁর পরমাত্মীয়। প্রকৃতির ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে কঠোর পরিশ্রমে তারা বসতি গেড়েছে এ অঞ্চলে। একদিকে ঝড় ও বন্যা, খরা ও নদীভাঙন—এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তারা টিকে আছে। অন্যদিকে ক্ষমতা ও সম্পদলোভী সমাজপতিদের দৌরাত্ম্যে তারা বিপর্যস্ত, কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে এ মানুষগুলোই ফুঁসে ওঠে, সর্বশক্তিতে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। শামসুদ্দীন আবুল কালাম এঁদেরই গল্প বলেছেন শিল্পিত মমতায়। তাদের জীবনের কোনো অনুষঙ্গই তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে বাদ যায়নি। মূলত গ্রামীণ জীবনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-লোকসংস্কৃতিজাত বহুমাত্রিক পরিচয় রূপায়িত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের শিল্পিত ক্যানভাসে।

টীকা

১. Commonwealth War Graves Commission Annual Report 2013-2014. Archived 4 November 2015 at the Wayback Machine.,

২. সূত্র: https://issuu.com/wargravescommission/docs/cwgc_annual_report_ 2013-14_lr_final

সহায়কপঞ্জি

আকিমুন রহমান (১৯৯৩)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ* (১৯২০-৫০)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল হাফিজ (১৯৭৫)। *লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ*। মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], ঢাকা।

ভুঁইয়া ইকবাল (সম্পা., ১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*। আহমেদ রফিক, 'মানিক-উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনচিত্র', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ (২০০৭)। *লোকসংস্কৃতি (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭)*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

টি. স্কারলেট এপ্সটেইন ও রোজমেরি এ ওয়াটস (সম্পা., ১৯৮১)। *দ্য এন্ডলেস ডে : সাম কেস ম্যাটেরিয়ালস অন এশিয়ান রুরাল উইমেন*। পারগামন প্রেস, ইউএসএ, গ্রেট বৃটেন কানাডা

অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স ও জার্মানি। (বাংলাদেশ অংশের রচয়িতা ঝর্ণা নাথ [মহীবুল আজিজ প্রণীত *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ: ১৯৪৭-১৯৭১*, ২০০২, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা)

রওনক জাহান (১৯৭২)। *পাকিস্তান : ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস। (মহিবুল আজিজ প্রণীত *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ: ১৯৪৭-১৯৭১*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯৪৫)। *অনেক দিনের আশা*। ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা।

(১৯৫৫)। *দুই হৃদয়ের তীর*। ঢাকা।

(১৯৫৩)। *পথ জানা নাই*। প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ঢাকা।

(১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)। *পুঁই ডালিমের কাব্য*। মুক্তধারা, ঢাকা।

(১৯৮৭)। *মজা গাঙের গান*। মুক্তধারা, ঢাকা।

(১৯৪৫)। *শাহের বানু*। নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা।

স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা., ২০০০)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

'স্ত্রীশিক্ষা' : রবীন্দ্র সমকাল ও রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি

খায়রুন নিসা*

[সারসংক্ষেপ : উনিশ-শতকে বাংলায় নবজাগরণকালে নারীর মহিমা শিক্ষিত বাঙালিকে মোহিত করলেও নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মতানৈক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই দ্বিধা থেকে মুক্ত ছিলেন না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বাঙালি নারীজীবনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্র নারীচেতনা ছিল তারই অভিঘাতের ফল। নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট, আধুনিক ও অগ্রসৃয়মান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়; যদিও পরিণত বয়সে তাঁর নারীচেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট, সাহিত্যিক ভাবনামণ্ডিত, কবিত্বপূর্ণ ও রোমান্টিক। স্বীয় সাহিত্যকর্মে নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের স্ববিরোধ পরিলক্ষিত হলেও 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি নিজ মতকে স্পষ্ট করেছেন। সেখানে তিনি সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করেছেন। আলোচ্যমান প্রবন্ধটিতে নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ই কেবল পাওয়া যায় না বরং, তিনি নারীকে সভ্যতা বিকাশের প্রধান সোপান হিসেবে দেখে নারীর শিক্ষা ও ভব্যতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি প্রয়াস রয়েছে।]

এক

শিল্প সাহিত্যের জগৎ ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভারতবর্ষের মানুষের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনের কাজ পরিচালনার সময় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেন শিক্ষা বিস্তারের উপর, যার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে। সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে যে সংকটগুলো উপস্থিত হয়েছিল তার কারণ বিশ্লেষণ করে উত্তরণের পথনির্দেশ করেছেন একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত কি না—এই বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছিল। এই বিতর্কে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারসহ আরও অনেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন। রামমোহন রায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় নারীদের শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরেন। নারীরা যে কখনো কখনো পণ্যের চেয়েও বেশি সস্তা এবং অবমূল্যায়িত সেই বিষয়টি সমাজে উপস্থাপন করেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁর সময়কালে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয় নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে আজীবন তাদের দাসত্ব করে যেতে হবে। তাই বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কখনো কখনো সরকারি সহায়তায় মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁদের সমসাময়িক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

স্ত্রীশিক্ষাকে সাদরে সম্ভাষণ জানাতে পারেননি। এমনকি উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকেও শিক্ষিত এবং উচ্চবিত্ত মহলের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানাতে পারেননি। অন্যদিকে স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন জানালেও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষিত সমাজ দ্বিধান্বিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো নবজাগরণের অনির্বচনীয় স্তম্ভ বাঙালির বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনে অভাবনীয় গুরুত্ব রাখলেও তাঁর দীর্ঘ জীবনের বেশ কাল ধরে এই দ্বিধা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই রবীন্দ্র চিন্তায় বারবার ফিরে এসেছে সে দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তবুও নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যে পাই। রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ নারীকে কল্পনা করেছেন অন্তরের মানস-সুন্দরীর মতো। তাই রবীন্দ্র নারীচেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট এবং সাহিত্যিক ভাবমণ্ডিত। মূলত রামমোহন-বিদাসাগর-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বাঙালি নারী জীবনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্র নারীচেতনা তারই অভিঘাতের ফল। নারীস্বাধীনতা এবং নারীভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর পরও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি মনে হয় রয়েই গিয়েছিল। অনেক পাঠকের কাছে তাঁর উপন্যাস-গল্পে নারীর প্রতি রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের স্ব-বিরোধটি ধরা পড়ে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে একজন সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-সংস্কারক হিসেবে। স্ত্রীশিক্ষার যে অপরিসীম গুরুত্ব সেটি স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। নারীকে মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এরপরও নারীস্বাধীনতা এবং নারীশিক্ষার বিষয়ে কখনও কখনও তাঁর দ্বিমুখী আচরণ লক্ষ করা গিয়েছিল। এবং সেখান থেকে তিনি তাঁর পরিণত বয়সে ঘুরে দাঁড়ান ইতিবাচকভাবে। এজন্য রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় নারীশিক্ষার বিষয়টি আসে অবধারিতভাবেই। এখানে একটি কথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য, রবীন্দ্র নারীভাবনার মতো রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনাও তাঁর কবিমন এবং জীবনদর্শন প্রসূত।

দুই

উনিশ শতকের প্রথমদিকে যখন নারীশিক্ষার বিষয়টি শিক্ষিত সভ্য মহলে সবার সামনে আসে তখন সবার মনে নারীশিক্ষার আসলেই প্রয়োজন আছে কি না সেটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নারীশিক্ষার বিষয়টি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির কাছেও কিছুটা অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর ঠেকে। নব্যশিক্ষিত ভারতীয় বাঙালির কাছেই যদি বিষয়টি এমন দ্বিধার বিষয় হয় তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা আরোও প্রশ্নবোধক চিহ্নের উদ্রেককারী নিশ্চয়। এই অবস্থায় নারীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে যদি সে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে যায়, কন্যা সন্তানকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসলে যদি সমাজচ্যুত হতে হয়, যদি বংশ-মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—এরকম হাজারো প্রশ্নের সূচনার ফলে সংশয়ের ঘোরে পড়েন শিক্ষিত বাঙালি। মেয়েদের মাথায়ও যে চিন্তাশক্তির ক্ষমতা আছে সেটি মেনে নিতে অনেক সময় গড়িয়ে যায়। ফলে রক্ষণশীল সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উনিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত নারীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন ধরনের সুযোগ পাননি। খ্রিস্টান মিশনারীদের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার সূচনা হয়। ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে মূলত মিশনারিরা বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। এদের মধ্যে নারী শিক্ষা একটি। রবার্ট মে নামে একজন মিশনারি সর্বপ্রথম ১৮১৮ সালে চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মারা যাবার পর মিশনারিরা 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' তৈরি করেন যা পরবর্তীতে 'ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি'

নামে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ১৮২১ সালে মিস মেরি আন কুক প্রথমে স্কুল সোসাইটির অসহযোগিতা পেলেও 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র সহযোগিতায় বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেগুলোতে প্রায় ২৭৭ জন ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পায়। তার বালিকা বিদ্যালয়গুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায়। মিস কুক ১৮২১ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত নারী শিক্ষার প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যেহেতু খ্রিষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা প্রসারের ভেতরের কারণটি ছিল ধর্মপ্রচার করা তাই তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে অনেক ধর্মীয় বিষয় কৌশলে শেখাতে থাকেন তারা। এই সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হবার পর হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল থেকে শুরু করে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুরাও সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলেন। আগে থেকেই যেখানে সমাজচ্যুত হবার ভয় তাদের মধ্যে ছিল সেখানে ধর্মনাশের বিষয়টিও যোগ হয়। ফলে স্পষ্টতই মিশনারিদের স্কুলগুলো জনপ্রিয়তা হারায় এবং তাদের নারীশিক্ষা কার্যক্রম ব্যর্থই হয়। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেন :

> বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য করিয়াছিল। এমনকি ১৮৩৪ সালে আডম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ওইসকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডিস সোসাইটির সভ্য মহোদয়গণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল। (শিবনাথ, ২০১৭ : ১৬০)

ধর্মনাশের ভয়ে অনেক শিক্ষিত অভিজাত হিন্দু নিজেদের কন্যাকে মিশনারি স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। তারপরও কিছু প্রগতিশীল হিন্দু সভ্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ধর্ম এবং সামাজিক মর্যাদা দুটোই যেন ঠিক থাকে—এই চিন্তা মাথায় রেখে বাড়িতে শিক্ষক নিয়োগ করে অনেক অভিজাত পরিবার তাদের স্ত্রী-কন্যাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই সুযোগটা সার্বজনীন হয়নি, কারণ কেবল অভিজাত এবং উচ্চবিত্তরাই তাদের স্ত্রী-কন্যাদের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে উনিশ-শতকের নারীরা হিন্দু রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইংরেজদের ধর্মীয় রাজনীতির কারণে উনিশ-শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত সহজভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি।

ভারতবর্ষে প্রকৃত অর্থে নারীশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন। ১৮৪৮ সালের ৭মে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' নামে তিনি একটি স্কুল চালু করেন যেখানে সত্যিকার অর্থে নারীদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। তার উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ আরও অনেক দেশীয় সভ্য নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তাকে সাহায্য করেছেন। বিটনের 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' এর প্রথম দুজন ছাত্রী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয় কুন্দমালা ও ভূবনমালা। এ প্রসঙ্গে চিত্রা দেব বলেছেন :

> দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে স্কুলটি স্থাপন করেন ভারত হিতৈষী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। স্কুলটি প্রথমে খোলা হয়েছিল রাজা দক্ষিণারঞ্জনের সুখিয়া স্ট্রিটের বাড়ির বৈঠকখানায়। [...] এই স্কুলের প্রথম দুটি ছাত্রী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই মেয়ে কুন্দমালা ও ভুবনমালা। মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্যে তাঁকে নিজের গ্রামে সমাজচ্যুত হতে হয়। ওই দুজনের সঙ্গে আরও উনিশটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হন। (চিত্রা, ২০২১ : ১২-১৩)

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি এই স্কুলকে দান করেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সরকার এই স্কুলের নাম তাঁর নামে নামাঙ্কিত করেন। 'হিন্দু ফিমেল কলেজ' যথার্থ অর্থেই নারী শিক্ষার জোয়ার এনেছিল। ঠাকুর বাড়ির মতো অভিজাত বাড়ির কন্যারাও বেথুন প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ফিমেল স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তৎকালীন কলকাতার বহু নারীদের রোল মডেল ছিলেন ঠাকুরবাড়ির নারীরা। ফলে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের দেখা দেখি কলকাতার অনেক সভ্য এবং অভিজাত ঘরের মেয়েরাও এই স্কুলে ভর্তি হন। ঘর থেকে বের হয়ে মেয়েদের পড়াশুনা করার বিষয়টি অনেকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার যেমন সমাজচ্যুত হয়েছিলেন তেমনি আরও অনেক মেয়েদের অভিভাবকও নানারকম হুমকি এবং কটুক্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন। যে সব পত্র-পত্রিকা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলত তারাও নারীস্বাধীনতা এবং নারীশিক্ষা নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। উনিশ শতকের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরগুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর*-এ নারীশিক্ষার পক্ষে কথা বলেছিলেন অনেকেই। নারীরা যখন সত্যিকার অর্থে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল মুক্তির আলোতে, সেটিকে কিন্তু ইতিবাচকভাবে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি ঈশ্বরগুপ্তও বেথুন কলেজের মেয়েদের ব্যঙ্গ করে 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় লিখেছেন :

আগে মেয়েগুলো, ছিলো ভালো,
ব্রত-ধর্ম্ম কর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" লিখে বিবি সেজে,
বিলেতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ-সেজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আরকি খাবে।
ও ভাই! আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবে দেখতে পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥ (হাই ও পাশা, ২০১২ : ১৮০)

এই কবিতার মর্মার্থ যদি উদ্ধার করি তাহলে এটি স্পষ্ট হয় যে ঈশ্বরগুপ্ত নারীস্বাধীনতার বিষয়টিকে ইতিবাচক ভাবে নিতে পারেননি। অন্য অভিজাত এবং সাধারণ হিন্দু সভ্যদের মতো তিনিও নিশ্চিত ছিলেন যে, নারীরা ঘরের বাহিরে বের হয়ে আসলে ধর্ম-কর্ম থেকে তারা বিচ্যুত হবে। সংসার ধর্মেও তারা অমনোযোগী হয়ে যাবে। সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে তারা আর আগের মতো পরোয়া করবে না। এভাবে নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে বেথুন স্কুল থেকে 'বেথুন কলেজে' পরিণত হয়। এর ফলে উনিশ-শতকের নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার আরও অনেকখানি উন্মোচিত হয়। বেথুন কলেজের অনেক ছাত্রীই তাদের কর্মের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নারীদের মধ্যে প্রথম স্নাতক পাশ করেন এবং প্রথম দক্ষিণ

এশীয় মহিলা ডাক্তার ছিলেন। চন্দ্রমুখী বসু দক্ষিণ এশীয় নারী হিসেবে প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং কামিনী রায় মহিলা কবি ও সমাজসেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

উনিশ-শতকে নারীশিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সমাজসংস্কারের কাজে আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নারীশিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকার কারণে সরকারি সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন লেখায় ইতিবাচক দিকগুলো নির্দেশ করে সাধারণ মানুষকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তিনি আগ্রহী করেছিলেন। শুধু তাই নয় বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য যুক্তিসহ কারণ উপস্থাপন করেছেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুদিন পর্যন্ত বেথুন কলেজে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়াও নারীশিক্ষার প্রসারে অনেক অভিজাত এবং শিক্ষিত বাঙালি এগিয়ে এসেছেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে। উনিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসারে কিছু সংবাদপত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *বামাবোধিনী*, *সোমপ্রকাশ*, *সমাচার দর্পন*, *সম্বাদ কৌমুদী* প্রভৃতি পত্রিকা নারীদের বিভিন্ন লেখা নিয়মিত ছাপাত। এই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে উনিশ-শতকের বেশ কজন নারী সাহিত্যিকের দেখা পাই। সেই তালিকাও নেহায়েৎ ছোট নয়। তাঁদের অনেক লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। রাসসুন্দরী দাসী, সারদাসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, কৃষ্ণভবিনী দাসী, নিস্তারিনী দেবী, কামিনী রায়, সুদক্ষিণা সেন, বিবি তাহেরন নেসা, শরৎকুমারী দেব, ইন্দিরা দেবী, মানকুমারী বসু, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণকামিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলাদেবী চৌধুরাণীসহ আরও অনেক নারী লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্র সমকালে উল্লেখযোগ্যভাবে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বেড়ে ওঠেছেন অভিজাত একটি পরিবারে যেখানে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধনে আলাদা একটি জগৎ ছিল। যার ফলে উনিশ শতকের নারীজাগরণেও ঠাকুর বাড়ির বউ এবং মেয়েদের অনেকখানি অবদান ছিল। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানদানন্দিনীর (১৮৫০-১৯৪১) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মাত্র আট বছর বয়সে ঠাকুর পরিবারের মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাঁর সমকালে ভারতবর্ষের নারীরা অবরোধ প্রথার মধ্যেই বাস করছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা জ্ঞানদানন্দিনীর জীবনকে আমূল পাল্টে দেয়। প্রগতিশীল চিন্তার ধারক সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে ভারতবর্ষের নারীদের রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে কেবল তাঁর উপযুক্ত বধূ হিসেবে তৈরি করার জন্য শিক্ষিত করে তুলতে চাননি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরও মহৎ। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ হিসেবে তাঁর স্ত্রী নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখুক, সমস্ত ভারতীয় নারীদের জন্য শিক্ষা, সংস্কার ও আধুনিকতার মাইলফলক হয়ে উঠুক। এই পথটি মোটেও সহজসাধ্য ছিল না তার জন্য, কারণ তখন পর্যন্ত কঠিন অবরোধের মধ্যে ভারতের প্রায় প্রতিটি নারীকে জীবন যাপন করতে হতো। তিনি স্বামীর উৎসাহ এবং প্রণোদনায় পুরাতন নিয়ম ভেঙে নূতন পথের দিশা দেখালেন ভারতের নারীদের। অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে গিয়ে থাকার সুযোগও পেয়েছিলেন তিনি। এর ফলে শাশুড়িসহ পরিবারের অনেক সদস্যের সঙ্গে মনোমালিন্যও সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন লন্ডনে অবস্থান করছিলেন তখন চিঠির মাধ্যমে ভাই হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে স্ত্রীর পড়াশুনার খোঁজ নিতেন। জ্ঞানদাকে ইংরেজি শেখানোর দায়িত্বও পড়েছিল হেমেন্দ্রনাথের ওপর। ১৮৭৭ সালের মে মাসে

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তিন ছেলে-মেয়েসহ বিলেত যাত্রা করেন। তাঁর পূর্বেও দুই-চারজন নারী বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তবুও জ্ঞানদার বিলেত গমন তার সকল অবরোধের অবসান ঘটিয়েছিল। মূলত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদারপন্থী চিন্তা-ভাবনার কারণে তা সম্ভবপর হয়েছিল। "মহর্ষি পরিবারে নারী জাতির উন্নতিকল্পে ক্রমশ যে সকল ব্যবস্থা স্বীকৃত হতে লাগল তার প্রবর্তনের মূলে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন" (পুলিন, ২০১২ : ২০৪)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপর দুই ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ির নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় বেশ ভূমিকা রেখেছিলেন। মহর্ষি-কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্য-সাধনাকে ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়ির *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যুর পর *ভারতী* সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তারই কন্যাদ্বয় সরলা দেবী এবং হিরন্ময়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী পড়াশুনা শেষ করে ছাব্বিশ বছর বয়সে এবং ভাগ্নি সরলা বিয়ে করেন তেত্রিশ বছর বয়সে। সরলা দেবী ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সর্বোপরি এ সকল বিষয় অবলোকন করেই চিত্রা দেব মন্তব্য করেন :

> সুতরাং অসংখ্য বাধা নিষেধের গণ্ডি পার হয়েই মেয়েদের এমনকি ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল। সহজে হয়নি। প্রথম দিকে এ বাড়ির মেয়ে এবং বউয়েদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ শক্তির পরিচয় রেখে গিয়েছেন, কিন্তু যাঁদের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, পড়বার কারণও নেই, তাঁদের ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। চলবার বাঁধা-পথ তাঁরা পাননি, পথ তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল। (চিত্রা, ২০১৪ : ২)

সুতরাং বলা যায় যে, উনিশ শতকের নারী আন্দোলন সত্যেন্দ্রনাথের দান এবং এটি প্রধানত তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই বিস্তার লাভ করেছে। অর্থাৎ "উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রধান একটি কেন্দ্র দেবেন্দ্র ভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদ্‌যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এককালে অনেকখানি পুষ্টি লাভ করেছে" (পুলিন, ২০১২ : ২০৪)। তবে একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাসন্তানেরা ঠাকুরবাড়ির সন্তান হয়েও ইন্দিরা-সরলার মতো এগিয়ে যেতে পারেননি। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিনটি মেয়েকেই বাল্যবিবাহ দিয়েছেন। বাল্যবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের ফলে যে সামাজিক অবক্ষয় তা নিয়ে তিনি লিখেছেনও বিস্তর, কিন্তু নিজ কন্যাদের ক্ষেত্রেই তা রক্ষা করতে পারেননি। তিনি যখন অর্থকষ্টে ছিলেন তখনও পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন কৃষি বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য। সেই হিসেবে কন্যাদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি। ফলে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেবার বিষয়টিকে নিয়ে অনেকেই তাঁকে ঠাট্টা পরিহাস করেছেন। কারণ "শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য 'স্ত্রী-স্বাধীনতার দল' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাঁরা বাল্য বিবাহের বিপক্ষে, স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে সংগঠিত হয়েছিলেন"। (সুদক্ষিণা, ২০১৫ : ৮)

এই বিষয়গুলো খেয়াল করলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি তাহলে স্ত্রী স্বাধীনতা বা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে তেমন আমলে নেননি? সত্যিকার অর্থে পরবর্তীতে এটি তাঁর সামনে প্রশ্ন হয়েই দাঁড়ায়। তাহলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রক্ষণশীল মনোভাবের ছিলেন? তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন মৃণাল, অনিলা, বিমলা, ইলা, বিনোদিনী, সোহিনীর মতো চরিত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন এই

মন্তব্যটিও তাঁর উপর আমরা চাপিয়ে দিতে পারি না। তাহলে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়টি তিনি কীভাবে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন সেটি পর্যালোচনার চেষ্টা করবো।

তিন

একজন সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষের মানসিক দাসত্ব মোচন করতে হলে শিক্ষার বিস্তার এবং সংস্কার অত্যাবশ্যক। তখন ভারতবর্ষে শিক্ষিত সমাজের আনাগোনা ছিল না বিষয়টি মোটেও এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেন, ভারতবর্ষে যে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির উৎপত্তি হয়েছিল তাদের বেশিরভাগই ঔপনিবেশিক দাসত্বপ্রবণ মন-মানসিকতার। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ইংরেজ মিশনারিরা ভারতের শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেখানে তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়ানো। ফলে তাদের শিক্ষাবিস্তারের পেছনে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল। মিশনারি স্কুলগুলোতে খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসরণ করে অনেক নিয়ম নীতি পালন করা হতো। কিন্তু এসব মিশনারি স্কুল থেকে শিক্ষার সারবস্তু অনেক ছাত্রই উদ্ধার করতে পারত না। ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ছোটবেলাতেই আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে পাঠশালায় যাবার জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের শেষ ছিল না। দাদা এবং ভাগ্নে সত্যেন্দ্রনাথের স্কুলে যাওয়া দেখে অনুযোগ করতেন তিনি। তখন তাঁর গৃহশিক্ষক তাঁকে চপেটাঘাত করেন। *জীবনস্মৃতিতে* লিখেছেন :

> যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন স্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নেই, কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ১৪)

তার মানে শিশু রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষাপ্রণালি আকৃষ্ট করতে পারেনি। সেখান থেকে তিনি কি শিখেছিলেন তা তাঁর মনে নেই কিন্তু সেখানে যে শক্ত শাসন প্রণালি ছিল সেটি তাঁর স্পষ্টত মনে আছে।

শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯)। এখানে ভারতবর্ষের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। বালক রবীন্দ্রনাথকে কেন বিদ্যালয় আকৃষ্ট করতে পারেনি সেই বিষয়টি আমরা এখানে উপলব্ধি করতে পারব :

> স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিলাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না। (শোয়াইব, ২০১২ : ১৩)

'বিজাতীয় ভাষা'য় মুখস্থ শক্তির মাধ্যমে শিশুরা পড়াশুনা শুরু করে এবং না বুঝে শুধু কলের পুতুলের মতো ইংরেজি বলতে থাকে। এখানে না হয় ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ, না হয় নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে। আরেকটি গুরুতর বিষয় হচ্ছে, যে সকল মাস্টারমশাইরা পড়ান তাদের নিজেদেরই ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যের জ্ঞান একেবারেই সীমিত। তারা ভালো

ইংরেজিও জানেন না, ভালো বাংলাও জানেন না। এই অবস্থায় ছাত্রের কি করুণ দশা হতে পারে তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও বলেন যে, এই ইংরেজি ভাষাটা যেহেতু বিদেশিদের ভাষা, বিজাতিদের ভাষা; সেহেতু আমরা একে যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারিনা। তাই পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ লিখলেও, বক্তৃতায় ব্যবহার করলেও জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেটির কোনও প্রয়োগ আমরা করতে পারি না। এভাবেই ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার গোঁজামিল আর হেরফের তুলে ধরেছেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। নিজের অপ্রাপ্তির জায়গা থেকেই হয়তো পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মেধা, মনন এবং প্রজ্ঞায় শান্তিনিকেতনে এক অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। বিলাসিতাহীন, অনাড়ম্বর এবং দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে জ্ঞানের সাধনা-ই ছিল এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা যদি বালক রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতেই পারত তাহলে শ্রীনিকেতন বা শান্তিনিকেতনের স্বপ্ন হয়তো তিনি দেখতেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য শিক্ষা বা জ্ঞানের বিরোধী কখনোই ছিলেন না, তিনি শুধু চেয়েছিলেন অর্জিত শিক্ষা যেন প্রায়োগিক হয়, জীবনে সেটির যথাযথ ব্যবহার যেন করা যায়, শিক্ষা যেন অকেজো কোনও বস্তু হয়ে পড়ে না থাকে। খুব অল্প বয়সেই শিক্ষাভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিকত্ব ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন :

> বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি মুখস্ত করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের রুচির উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮৯ : ৬১)

বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বাহন ইংরেজি হওয়ার কারণে মূলত এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ছাত্ররা। একে তো বিদেশি ভাষা, তার উপর আবার কঠিন শাসনতন্ত্র ছাত্রদের সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখত। ফলে অচিরেই মুক্তচিন্তার সুযোগ এবং কল্পনাশক্তি নষ্ট হয়ে যেত ছাত্রদের। তাই ভারতবর্ষে যদি যথাযথ বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করতে হয় তবে মাতৃভাষা-ই যে হবে তার সবচেয়ে বড় বাহন সেই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে স্পষ্টত আমাদের ছাত্রদের ঝরে পড়ার কারণ নির্দেশ করে তা থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। 'বিলাতি বিদ্যা' যে কখনও আমাদের নিজেদের 'ভিতরের সামগ্রী' হয়ে ওঠে না; তা 'সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে'—এই সত্যটিকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্ব নির্দেশ করে এক্ষেত্রে জাপানের কথা উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন :

> অথচ, জাপনি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি না। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না। সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে। (শোয়াইব, ২০১২ : ৭৪)

এজন্য দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি মিডিয়ামের পাশাপাশি বাংলায়ও যেন বিদ্যাশিক্ষার পথ খোলা রাখা হয় তার প্রতি যুক্তি প্রদান করেছেন।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে ঔপনিবেশিক ছাঁচে তৈরি এবং তার ক্ষতিকারক অনেকগুলো দিকও রয়েছে সেগুলো রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তায় ধরা পড়েছিল। ১৮৮০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পেছনে অনেক বড় একট উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসকদের। তারা নামমাত্র শিক্ষিত কেরানি শ্রেণি তৈরি করার জন্য এবং ভারতবর্ষে তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'কেরানি' শ্রেণি দাসত্ব প্রবণ মন-মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠেছিল যা এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। নামমাত্র শিক্ষাগ্রহণ করে সার্টিফিকেটধারী হয়ে চাকরি পাওয়াই যাদের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। 'অসন্তোষের কারণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়টি স্পষ্টত তুলে ধরেছেন। বৃটিশ রাজশক্তি তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেন তাতে তাদের প্রয়োজন যথাযথভাবেই মিটে যাচ্ছিল। কিন্তু সমস্যা তখনই হলো যখন ছাত্রের সংখ্যা বাড়ল কিন্তু কর্মসংস্থানের সংখ্যা তাল দিয়ে বাড়ল না। তাই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কর্তৃক আরোপিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন :

> যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকায় সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হলে এই সম্মন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারের অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পরি। (শোয়াইব, ২০১২ : ৮৭)

এই ব্যর্থতার কারণ ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা। বিষয়টি তখনই সমাধানের আলো দেখবে যখন আমরা বৃটিশদের দেয়া ছাঁচে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আমাদের ভারতবর্ষের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব। নইলে এই চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থার ফল *তোতা-কাহিনী'র* তোতা পাখির মতোই হবে।

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং পশ্চাৎপদতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা সংস্কারকের ভূমিকায় আসেন। তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য এমন শিক্ষক খোঁজ করছিলেন যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। শান্তিনিকেতনে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন করে পাঠক্রম চলত। ঠাকুর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ওপরই সবচেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন তিনি, এমনকি সফলও হয়েছেন। গ্রন্থগত বিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য কারিগরি শিক্ষাও তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই নিজের সকল কাজ করতেন। তিনি মুচি ও ছুতারের কাজও নিজে করেছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ভাবিত তখন ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার বিষয়টি আর কোনওভাবেই উপেক্ষিত থাকেনি। তবে নারী শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা কিছুটা ভিন্ন ছিল। নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার বিষয়টিতে তিনি উদার ছিলেন এবং এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কবি ও দার্শনিক সুলভ। ফলে অন্যান্য তাত্ত্বিকদের সঙ্গে মতের সামঞ্জস্যতার পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাভাবনাই স্পষ্টত লক্ষণীয় হয়েছে।

চার

শ্রীমতি লীলা মিত্রের একটি পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন তাতে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টি সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সমকালীন

আলোচনার প্রেক্ষিতে লীলামিত্র স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এবং বিপক্ষে পুরুষদের অবস্থান উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত জানতে চেয়েছেন। লীলামিত্র এই চিঠিতে বেশ কয়েক শ্রেণির পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, একদল পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ধারক স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টিকে তাদের জন্য হুমকি স্বরূপ বিবেচনা করেছেন। উনিশ শতকীয় চিন্তাভাবনার অন্যতম বিষয় ছিল পুরুষের আধিপত্য এবং নারী কর্তৃক সে আধিপত্যকে মেনে নেওয়া। এজন্য পুরুষরা কখনই চাইত না নারীরা শিক্ষিত হোক।

দ্বিতীয়ত, লীলামিত্র আরেক দল পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন যারা স্ত্রীদেরকে শুধু নিজেদের উপযুক্ত করে তোলার জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এখানে নারীমুক্তির জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন বা মানুষ হিসেবে যে নারীর বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নিজেদের পারিবারিক সুখের ওপর।

মূলত এই দুই শ্রেণির পুরুষের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কেউই নারীকে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে দেখছে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জায়গায় নিজের অবস্থানটি স্পষ্ট করেছেন। নারীকে মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। আর যদি সে মানুষ হিসেবে পুরুষের সমান মর্যাদা পান তাহলে তো তার শিক্ষাটাও মৌলিক অধিকারের পর্যায়েই পড়ে। আমরা পূর্বেই উনিশ শতকের নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। সেই প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তখনকার পুরুষরা নিজেদের জন্য শিক্ষিত স্ত্রীর কথা ভাবতেই পারতেন না। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি যখন আলোচিত তখন তাদের মনে এই বিষয়টি আসে যে, স্ত্রী-কন্যা শিক্ষিত হলে তাদের ধর্মনাশের আশঙ্কা থাকবে। স্ত্রীরা স্বামী-সন্তানের সেবা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তাদের সংসারধর্ম সঠিকভাবে পালন হবে না। ঈশ্বরগুপ্তের 'দুর্ভিক্ষ' কবিতাটি এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। চারপাশে যখন নারীশিক্ষার জোয়ার আসছে তখন অনেক শিক্ষিত পুরুষ অনিরাপত্তায় ভুগেছে। সার্বজনীন শিক্ষার চিন্তা যেখানে করা হতো না সেখানে নারীশিক্ষার বিষয়টি আরও পরে আসে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে মন্তব্য করেন—

> যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোক প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৬)

অর্থাৎ শিক্ষিতদের অনেক বড় একটা অংশই সাধারণ জনগণকে শিক্ষার বাইরে রাখতে চান। নারীকেও শিক্ষার বাইরে রাখার কারণও এখানে স্পষ্ট। তাদের মতে, মেয়েদের জন্ম পুরুষের সেবা করার জন্য, তাদের সন্তান ধারণ করার জন্য এবং ধর্ম-কর্ম করার জন্য। তাদের মতে, 'মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র'। এই কথাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বীকার করেন :

> বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন। এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম

> আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। স্কুল-মাস্টার কিংবা টেকসটবুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাধা দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেই জন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি-বা কান্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৬)

অর্থাৎ গঠনগত দিক থেকে মেয়েরা যে পুরুষ জাতি থেকে আলাদা সে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানেন। কিন্তু কট্টরপন্থী অনেক নারীতাত্ত্বিক বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন—যেহেতু নারী এবং পুরুষ তারা একে অন্যের থেকে আলাদা, সেক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রও আলাদা হবে। তৎকালীন নারীতাত্ত্বিকরা নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ সে দৃষ্টিতে নারীকে দেখেননি। তিনি নারীকে দেখেছেন স্ত্রী, কন্যা অথবা ভগিনী হিসেবে। যেহেতু নারীও মানুষ সেহেতু সেও শিক্ষারভাগ পাবে। এখানে নারীকে বঞ্চিত করা মানে ঈশ্বরকেও অবমাননা করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন—সন্তান জন্ম দেয়া, স্নেহ করা, কারও স্ত্রী হওয়া দাসীত্বের পর্যায়ে পড়ে না। এখানেই কট্টরপন্থী নারীতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন:

> আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৭)

রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীকে দেখেছেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর নারীরা স্বভাবকোমল এবং স্নেহপরায়ণ। ফলে নারীতাত্ত্বিকদের নারীচিন্তার সঙ্গে অবধারিতভাবেই তাঁর নারীচিন্তার একটা সংঘাত বাধে। মা হওয়া, স্ত্রী হওয়া নারীর জন্য কখনই অপমানজনক হতে পারে না; বরং তা নারীর জন্য সম্মানজনক।

বিপত্তি তখনই বাধে যখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর সম্মানের প্রশ্নটি আসে। সেই বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগোচরে থাকেনি। মেয়েদের স্বভাব কোমল আচরণকে বিশেষ করে ভারতবর্ষের পুরুষরা দুর্বলতা হিসেবে দেখে। মেয়েরা সংসার করবে, সন্তানের জননী হবে এই বিষয়টিকে তারা অনিবার্য মনে করেছে। মোটকথা, মেয়েরা পরিবারের কাছে দায়ে পড়েই আত্মসমর্পণ করছে। তাই তাদের প্রতি অবিচার করা স্বার্থপর পুরুষের কাছে কোনও বিষয়ই নয়। এই সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে দুঃখবোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারীশিক্ষার বিষয়টি যখন আলোচনার তুঙ্গে তখন নারীস্বাধীনতার বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কারণ, যদি স্ত্রী-কন্যাদের শিক্ষিত করতে হয়, তবে তাদের উপর যে অবরোধ প্রথা চাপিয়ে দেয়া আছে সেটিকে আগে প্রত্যাহার করতে হবে। এজন্য নারীকে নিয়ে আরও ভাবতে হবে এবং এই ভাবনার সংকীর্ণ জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিজেকে মুক্ত করেছেন। সমালোচকের মতে—

> নারীজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার শেষতম পরিচয়স্থল 'স্ত্রীর পত্র' গল্প। তিনি এক সময় বিশ্বাস করতেন, নারী জীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে ('শকুন্তলা','কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'/*প্রাচীন সাহিত্য*)। বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এ বিশ্বাস বজায় ছিল। তারপর এলো দুই নারী তত্ত্ব। নারীর দুই রূপ—প্রেয়সী ও জননী—তিনি দেখতে চেয়েছেন। প্রথমটার উদাহরণ আনন্দময়ী (*গোরা*) বা রাসমণি (রাসমনির ছেলে)। দ্বিতীয়টার উদাহরণ *বলাকার* 'দুই

> নারী' কবিতা, উর্মিলা ও শর্মিলা (দুই বোন)। তারপর এলো নারীত্বের তত্ত্ব—যে তত্ত্বের ব্যক্তিরূপ মৃণাল (স্ত্রীর পত্র) অনিলা (পয়লা নম্বর), কুমুদিনী (যোগাযোগ), সোহিনী (ল্যাবরেটরি)। সমাজ, শাস্ত্র ও পুরুষের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এইসব নারী চরিত্রে দেখা যায়। (অরুণকুমার, ২০১১ : ৭৪)

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'স্ত্রীর পত্রের' রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য আমাদের চোখে সুস্পষ্ট। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালকে সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষিত নারী হিসেবে। শুধু স্ত্রীর পত্রের মৃণাল নয়, এর আগেও অসংখ্য শিক্ষিত নারীচরিত্র তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে যোগ করেছেন। মৃণালের মাধ্যমে হয়তো এতদিনের না-বলা কথায় স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ কোনভাবেই মৃণালের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন :

> সবুজপত্রে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নারায়ণ মাসিকপত্রে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তীব্র প্রতিবাদ করেন। নরায়ণ-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্রের' প্যারোডি 'মৃণালের কথা'। (অরুণকুমার, ২০১১ : ৭৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থক এর চেয়ে বড় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। শুধু শিক্ষা বা স্বাধীনতা নয়, নারী যে কবিও হতে পারে সেটি তিনি মৃণালের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন :

> আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্যার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যা কিছু তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেই খানে আমার মুক্তি; সেইখে আমি আমি। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৭ : ৪৯৯)

নারীর নিজস্ব পরিসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবেই সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে। একই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন তিনি। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য শান্তিনিকেতনে ব্যক্তিগত উদ্যোগও নিয়েছেন তিনি। কিন্তু রোম্যান্টিক কবি এবং সাহিত্যিক হওয়ার কারণে অন্যান্য তাত্ত্বিক, লেখক বা সংস্কারকের সঙ্গে কিছুটা সংঘর্ষ কখনও কখনও ঘটেছে। তাই আমরা রবীন্দ্র নারীভাবনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো রবীন্দ্র জীবনদর্শন থেকে। এ সবকিছুর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতা, নাটক, গান, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, ভাষণ এবং অবশ্যই তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি বুঝে নিলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন :

> ক. মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী? (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৬)
>
> খ. পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই অনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা

প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৭)

গ. কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৮)

এসব বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা উপলব্ধি করি রবীন্দ্র জীবনদর্শনের গভীরতর দিক—যার প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, গান, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, ভাষণ এবং অবশ্যই তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের দুটি মূল বিষয় হলো মুক্তি ও আনন্দ। তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকে এ-দুই বিষয়ে বিস্তৃত জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হতে স্বতন্ত্র' বলে 'তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র'। এই সত্যটিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন না করলেই স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্র-দর্শন স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। নারীরা সন্তান-ধারণ ও প্রতিপালন করে। স্নেহ-প্রেম তাদের মজ্জাগত। সে-কারণেই "মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে" (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৭ : ২৮৮)। মেয়েদের আনুগত্য স্বভাবজাত, দুর্বলতা বা অক্ষমতা নয়। এই আনুগত্যকে জগৎ-সংসারের সকল মানুষ প্রাণভরে স্বীকার করে, যারা করে না তারা অকৃতজ্ঞ। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় মেয়েরা শিক্ষিত হলেও কখনও পুরুষের নিরাপত্তা কমে না, সন্তানের প্রতি তাদের স্নেহও বহাল থাকে। তাই যারা এই দোহাই দিয়ে স্ত্রীশিক্ষাকে অসমর্থন জানায় তারা আত্মপ্রবঞ্চকও বটে।

পাঁচ

ঊনিশ শতকের উপনিবেশিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষা এবং সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নারীচিন্তা ছিল চিরন্তন। তিনি নারীকে দেখেছেন মানবীরূপে, যে-নারীর মধ্যে মায়া, মমতা, মাতৃত্ব এবং সহনশীলতা থাকবে। নারীর এই ক্ষেত্রগুলো তো পুরুষ পরিপূর্ণ করতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, বরং তিনি বলেছেন—"মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাবে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব প্রকৃতিকেই দুর্বল করি, একথা বলাই বাহুল্য" (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ২৮৬)। মন্তব্যটি নারী-পুরুষ উভয়কে উদ্দেশ্য করেই বলা। সেদিক থেকে জীবনের একটা সময়ে হয়তো রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু পরিণত বয়সে এসে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই স্ত্রীশিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই নয় শিক্ষাপ্রণালিতে মেয়ে-পুরুষে বিভেদকে বিধাতাকে অমান্য করার সমতুল্য ভেবেছেন। বরং মেয়েদের 'মেয়ে হিসেবে' গড়ে তোলার জন্য 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা'র চেয়ে 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; আর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষার কথা বলেছেন। কেননা, যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকের দ্বিমত। কিন্তু রবীন্দ্র জীবনদর্শনের দিক থেকে তা যথার্থ হিসেবে আমরা মনে করি।

সহায়কপঞ্জি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১১)। *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান (সম্পা., ২০১২)। *রবীন্দ্রনাথ : এই সময়ে*। আবুল মোমেন 'মানবের বিকাশ ও রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ', প্রথমা, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০০০)। *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চিত্রা দেব (২০১৪)। *ঠাকুর বাড়ির আনন্দমহল*। আনন্দ মহল পাবলিশার্স, কলকাতা।

মনজুর আহমেদ (সম্পা., ২০১৫)। *সাপ্তাহিক আজকাল*। সুদক্ষিণা ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা'। নিউ ইয়র্ক।

মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা., ২০১২)। *ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৭)। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (খণ্ড-১৬)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

(২০০৭)। *গল্পগুচ্ছ*। প্রতীক, ঢাকা।

(২০১২)। *জীবনস্মৃতি*। সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

শিবনাথ শাস্ত্রী (২০১৭)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

শোয়াইব জিবরান (সম্পা., ২০১২)। *রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র*। সংবেদ, ঢাকা।

সুশান্ত সরকার (২০১১)। *রবীন্দ্রভাবনার পঞ্চ প্রান্তর*। শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (২০১১)। *রবীন্দ্রনাথ, অধরা মাধুরী*। শুদ্ধস্বর,ঢাকা।

রবীন্দ্রসংগীতে কালের বিবর্তন : প্রসঙ্গ কথা ও ভাব

দেবশ্রী দোলন*

[সারসংক্ষেপ : সাহিত্য ও সংগীত ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন যুগপৎ স্রষ্টা। সমগ্র জীবনের সকল রচনার মধ্যে সংগীতকে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ সকল সংগীতে তিনি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবানুযায়ী কথা বসিয়েছেন। সেসকল গানে কখনও প্রকাশ পেয়েছে কৈশোরক অনুভূতি আবার কখনও প্রকাশ পেয়েছে পরিণত চিন্তা-চেতনা। বয়সের ধারা অনুযায়ী ঈশ্বরকে কখনও উপলব্ধি করেছেন পরমাত্মা রূপে, কখনও বন্ধু রূপে আবার কখনও জীবনদেবতারূপে। এ ধরনের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর রচনাকালকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। আর এ সকল পর্বে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ পর্যায়ের গানের পাশাপাশি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে বয়সানুক্রমিক রচনাশৈলীর পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্বে যেভাবে তিনি এ সকল পর্যায়ের গান রচনা করেছেন, মধ্য বয়সের গানে দেখা যায় তার ভিন্ন রূপ, আবার পরিণত বয়সের গান রচনায় দেখা যায় কথার ভাবগাম্ভীর্য। সবমিলিয়ে পর্যায় ও বয়স অনুযায়ী ভাবাবেগের পরিবর্তন সুপরিস্ফুট হয়েছে কবির রচনায়। তারই সুবিস্তৃত পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।]

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য-শাখার মধ্যে সংগীতই সেই সোনারকাঠি যার স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকুমারী চকিতে চোখ মেলে চায়। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণ এবং ক্রমবিকাশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, ঠাকুরবাড়িকেন্দ্রিক সমকালীন সাহিত্য ও শিল্পের পটভূমি এবং সর্বোপরি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শৈশবের প্রথম ছন্দসচেতন দিনগুলি থেকে জীবনের শেষ প্রহরগুলি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর কাছে কখনো কপটতা করেননি, আর তারই প্রতিদানস্বরূপ কাব্যলক্ষ্মী চরণ রাখেন তাঁর সুরের কমলটির উপর। যেখানে সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সীমার মধ্যে অসীম অনির্বচনীয়ের চকিত রহস্যস্ফুরণ প্রত্যক্ষ অনুভব করাই গীতস্রষ্টারূপে তাঁর সাধনাতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত রচনাজীবনে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবধারার গান রচনা করেছেন। তাঁর চব্বিশ বছরের অনুভূতির সঙ্গে যোগসাযুজ্য রচনা করেছেন আশি বছরের ভাবনার। প্রথমদিকে যেখানে ঈশ্বরভাবনা প্রকাশ পেয়েছে ব্রহ্মভাবনার সাথে, মধ্যবয়সে সেই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে আধ্যাত্মিকতায়। অন্যদিকে, শেষ বয়সের ঈশ্বরভাবনা প্রকাশ করেছেন আত্মিকতায় ও মননে। যেখানে ঈশ্বর আরাধনার গানে পূজা নয়, প্রেমের আধিক্যই লক্ষ্য করা যায়। এভাবেই তিনি তাঁর বিভিন্ন গানে বয়সের সাথে সাথে পরিণত অনুভূতির প্রকাশ করেছেন।

প্রথম বয়স

কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসভূমি গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পরিবেশ এবং বহিরাগত সুধীজনের সান্নিধ্যে। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ দুটি বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের পরিবারকে কেন্দ্র করে। একটি হচ্ছে ব্রাহ্ম দার্শনিক আন্দোলন, অন্যটি স্বাদেশিকতা। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে লালিত ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণারূপে ব্রহ্মসংগীতের প্রচলন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা

*প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

রামমোহন রায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল সকল মানুষের জন্য একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক মিলনমঞ্চ রচনা। তাঁর সেই চেতনাকে বিশ্বজনীন রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অজস্র ভাবনা ও অনুভবের ছোঁয়ায় এক বিস্ময়কর রচনাকাণ্ড গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রীতির এ সকল গান ব্রহ্মসংগীত নামেও প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে *গীতবিতানে* সংকলনের সময় এই গানকে পূজা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ের একটি গানের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

> সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা
> মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ০৫)

এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ 'গুরু' বলতে পরম ঈশ্বরের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি এই পূজা পর্যায়কে বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যার মধ্যে 'গান' নামক একটি উপপর্যায় আছে। সেখানে 'গুরু' বলতে একমাত্র পরম আরাধ্য প্রভুকেই বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক প্রবৃত্তিতে এমন সকল গানেই প্রভুর এই রূপটিকে বিমূর্ত হিসেবে বোঝানো হয়েছে।

পূজার পরেই আসে প্রেম। কবিভাবনায় ঈশ্বর ও মানবের যে যুগলরূপের সহাবস্থান বারেবারেই ঘটেছে, প্রেম পর্যায়ের গানগুলির বিশ্লেষণে সে স্বরূপটি স্বতোৎঘাটিত হবে। কেননা, প্রাণে জাগ্রত প্রেমই মানুষকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনার প্রাথমিক পর্ব একান্তই রোম্যান্টিক, আনন্দ-বিষাদ মগ্নতায় আচ্ছন্ন।

এই পর্বের গানগুলো মূলত ব্যক্তিচিত্তের ভাব ও ভাবনার, বেদনা ও আনন্দের গান। এ বেদনা প্রধানত অচরিতার্থ প্রেমিক অথবা প্রেমিকার চিত্তবেদনা। তবে এ গান আনন্দে উজ্জ্বল নয়, প্রাণ কাপাঁনো উচ্ছল নয়, বরং বেদনার্ত অসীম বিরহের ভাণ্ডার থেকে কণায় কণায় পরিপূর্ণ। অন্যদিকে কবির মনে অকারণ বিরহ গুঞ্জরিত, তাই কিশোর কবির হাতেই রচিত হল—

> কিছুই তো হল না,
> সেই সব সেই সব সেই হাহাকার রব
> সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ৫৩৩)

এই অপূর্ণতার বেদনা একান্তই রোম্যান্টিক। *সন্ধ্যা সংগীত*, *কড়ি ও কোমল* পর্বের রবীন্দ্রনাথ কারণহীন বিষাদে মগ্ন। *মায়ার খেলায়* প্রেম ভাবনার স্বরূপ কিছুটা স্পষ্ট হলেও সেখানেও অসমাপ্তির দাহ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"মধুর হুতাশে মধুর দহন, নিত নব অনুরাগে" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ২৭৭)। যেখানে যৌবনদীপ্ত শান্তার প্রেম অস্থির এবং বেদনাক্লিষ্ট, তবুও এখানেই ভালোবাসার স্থিতিশীলরূপ নজরে আসে।

প্রতীক্ষারত কল্যাণধর্মী প্রেমের এরূপ চিত্রপটই রঙে, রূপে, ভাবে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার গানে বেশি দেখা যায়। এসময়কার তেমনই কিছু গান হল—

> ক. 'দুজনে দেখা হল, মধুযামিনীরে'
> খ. 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'
> গ. 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ২১৭-৬১২)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আশৈশব প্রকৃতি প্রেমিক। বাল্যকাল থেকেই 'ভৃত্যরাজতন্ত্রের' আওতায় কবি ছিলেন বদ্ধ। তবে মুক্ত প্রকৃতির উদার আকর্ষণ প্রতিক্ষণে তিনি অনুভব করতেন। *জীবনস্মৃতি*, *আমার ছেলেবেলা* প্রভৃতি গ্রন্থে কবির প্রকৃতি তন্ময়তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি নিয়ে লিখিত গানকে ঋতুসংগীতও বলা হয়। গানেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বন্দনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বিশ্বপ্রকৃতির নানা পর্যায়ে যখন সেই আনন্দ ছন্দ প্রকাশিত হয় নানা রূপে, নানাভাবে, মানুষের হৃদয় আপনা থেকেই তখন তাতে সাড়া দেয়। প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথের

প্রকৃতি বন্দনা কিছুটা বিক্ষিপ্ত আকারে দেখা যায়। পরবর্তীতে সাজাদপুর, শিলাইদহের প্রকৃতি শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশ কবির প্রকৃতি ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

পনেরো-ষোল বছর বয়স থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যত গান রচনা করেন তার মধ্যে খাঁটি ঋতুসংগীত ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এ সময় তিনি ঋতুর রূপবৈচিত্র্যের সাথে মিল রেখে রাগেরও ব্যবহার করেছেন। তাঁর বর্ষার গানে যেমন দেখা যায় মল্লারের ঝলকানি অন্যদিকে বসন্তের গানে দেখা যায় বাহারের রূপলাবণ্য। আবার কখনো বসন্ত ও শরতের সম্মিলনে প্রকাশ পায় যোগিয়া-বিভাসের মিশ্রণ।

কথার বিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সংগীত রচনার প্রথম যুগে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। আর তাই প্রাথমিক যুগের কোন স্বদেশি গান জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিতও করেনি। হিন্দুমেলার যুগে ১৮৬৭ সালে বাংলাদেশ তখন স্বদেশি উত্তেজনায় উত্তাল। এর ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পযায়ে তাঁর অংশগ্রহণ দেখা যায়। সঞ্জীবনী সভা উপলক্ষে ১৮৭৭ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' প্রথম স্বদেশি গান। এ সময় কবির বয়স ছিল ১৮ বছর। জানা যায়—'তোমারি তরে সঁপিনু' গানটিও এসময়কার রচনা। রবীন্দ্রনাথের এ সকল দেশাত্মবোধক সংগীত প্রথম বয়সের উত্তেজনার স্বাক্ষর বহন করে। এই সমকালীন পটভূমির কিছু গান—

ক. 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'
খ. 'আমায় বোলো না, গাহিতে বোলোনা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৭৫-১৮২)

রবীন্দ্রনাথের পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ ছাড়াও অন্যান্য ধারারও বেশ কিছু গান তিনি এ বয়সে রচনা করেছেন। তবে মাত্র ১৯ বছর বয়সে রচিত প্রেম পর্যায়ের গানে যে বৈচিত্র্য তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে ঈশ্বরপ্রেমের মূর্তপ্রতিমা ফুটে উঠেছে। গানটি হলো—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৮ : ২৮৬)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ঈশ্বরকে এক ও একমাত্র মনে করে তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মনে করতেন জীবনের চালিত পথে তিনিই একমাত্র অবলম্বন। তবে তাঁর এই পর্বের গানগুলিতে নিজস্ব ভাব ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট যে রচনাগুলি ঐচ্ছিক ও আত্মপ্রয়োজনেই রচিত। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কোন সাংগীতিক নীতিগত ধারা তৈরি না হলেও তিনি যে পুরো দস্তুর গীতিকার ও সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তা স্পষ্ট প্রতীয়মান। আর তা তখনই দৃশ্যমান হয় যখন তিনি তাঁর রচনাতে পাশাপাশি দুটো ধারা একই সাথে বয়ে নিয়ে চলে। একটি হচ্ছে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারার অনুরূপে রূপদান অন্যটি ইউরোপীয় সুরের চলনে গান রচনা। যেহেতু পারিবারিক পরিবেশ অনুকূলে ছিল তাই রবীন্দ্রনাথের কান ও প্রাণ হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের রসে পরিপূর্ণ ছিল। তাই এই সময়ের বেশিরভাগ গানই শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর ছন্দের আদলে রচিত হয়েছিল। আবার এর মধ্যে বেশিরভাগ গান হিন্দি ভাঙা সুরে ও রচনা করা হয়েছে। ধারণা করা যায়, হিন্দি গানের সুর সংগ্রহ করেই এ পর্বের ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পাঙ্গের গান রচনা করা হয়েছে। যার ফলে কালোয়াতি গানের একটি নির্দিষ্ট প্রথানুগ ধারায় তাঁর এ বয়সের গানগুলো স্থান পেয়েছে। এই বয়সে রচিত তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীতের ভাঙা গানগুলোর কিছ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

ভাঙা গান	**মূল গান**
শুভ্র আসনে বিরাজো	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন

আছ অন্তরে চিরদিন কৈসে অব ধর ধীর
নব আনন্দে জাগো অধর ধরে বনবাঁশরী
এ কী এ সুন্দর শোভা বাজুরে মন্দর বাজু
এ পরবাসে কে রবে হায় ও মিঞা বেজনুওয়ালে (করুণাময়, ১৩৯৯ : ৫৫-৬৫)

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে রচনা ধারার এক অন্যতম জোয়ার দেখা যায়। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইউরোপীয় সুরের চলনকে বাংলায় ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। ১৮৮১ সালে সর্বপ্রথম রচনা করেন গীতিনাট্য *বাল্মীকি প্রতিভা*। যার মূল ভাব ছিল ঈশ্বরে আনুগত্য। ডাকাত প্রধানের ঈশ্বরে ভক্তি প্রতিষ্ঠার যে গল্প তা-ই প্রতিভাত হয়েছে এ গীতিনাট্যে। ১৮৮২-তে *কালমৃগয়া* ও ১৮৮৮-তে *মায়ার খেলা* গীতিনাট্য দুটি রচনা করে তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। এসকল গীতিনাট্যে কাহিনি ও চরিত্রের যে অসামান্য বুনন তা রচনার ভাবকে আরও মূর্তিমান করে তুলেছে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক রচনার মধ্যে *ভানুসিংহের পদাবলী* অন্যতম। এখানেও কবি কথা ও সুরের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করেছেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত মোট ২০টি পদের মধ্যে ৯টি পদে ভাঙা কীর্তনের সুর বসিয়ে প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন পদাবলির অনুসরণে সাজানো হয়েছে।

মধ্যবয়স

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকালই এক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরীক্ষণের মধ্যে কেটেছে। তাঁর রচিত গানগুলো ভিন্ন ভিন্ন বয়সে পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। সেরকমই জীবনের দ্বিতীয় পর্ব যা মধ্যবয়সে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনায় নানান চিন্তার প্রকাশ, বিচিত্র ভাবনার সংযোজন হয়েছে। এখানে কবির আরাধ্য দেবতা অনেক আন্তরিক। কেবল যে ভক্ত ভগবানের প্রতীক্ষাতে ব্যাকুল তাই-ই নয়, ভগবানও ভক্তের সঙ্গে মিলিত হতে ব্যগ্র। মহাসংগীতের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের অপার লীলা অনুভব করেন। সেই লীলায় তিনি অংশ নিয়ে নিজেকে পরমের কাছে সমর্পণ করেন। এমন ঈশ্বরভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন কিছু অসামান্য গান। যেখানে বাণীতে পরম প্রভু দেখা দিচ্ছেন 'বন্ধু' হিসেবে। *গীতাঞ্জলি* (১৯১৩), *গীতিমাল্য* (১৯১৪) ও *গীতালি*-র গানগুলোতে তিনি ঈশ্বরের এরূপ 'বন্ধু' রূপকে উদ্ভাসিত করেছেন অনন্য আলোয়। এভাবেই দেখা যায় তিনি ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়েছেন। সুরের মধ্যে ঐশ্বরিক জীবনোপলব্ধির নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার অমৃত নির্যাস রূপ পেয়েছে তাঁর সকল পূজার গানে। তাই কবি গেয়েছেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু পরকে করিলে ভাই (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১০৭)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালে বহু জায়গায় গিয়েছেন, তবে জমিদারি সূত্রে তাঁর বাংলায় আসা তাঁর রচনায় বিশেষ বৈচিত্র্য যোগ করে। মধ্য বয়সে তিনি বেশ কয়েকবার শিলাইদহ-সাজাদপুর আসেন যা তাঁর পূজা পর্যায়ের গানে নতুন মাত্রা যোগ করে। পূজার অনেক গানে বাউলদের ভাবদর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাউলরা ঈশ্বরকে যে ভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনিও তাঁর বেশ কিছু গানে তেমন ভাবার্থই প্রকাশ করেছেন। আর এই সাধনায় কবিগুরু যে একমত হয়েছেন তা স্পষ্টরূপেই বোঝা যায়। যেমন—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তাই সকল খানে
আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৫১)

কবির এ বয়সের গানে আধ্যাত্মচেতনার পাশাপাশি সংশয়, বেদনা, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, বিরহ-মিলন সবকিছুই ধরা পড়েছে। ঈশ্বর এখানে কেবলমাত্র আনন্দ রসঘনরূপেই আবির্ভূত হন না। তিনি গভীর অন্ধকারে দুঃখরাতের রাজা হয়েও আসেন। তাই কবির এ সময়কার কিছু গান এরূপ—

ক. 'সন্ধ্যা হল গো ওমা'
খ. 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে'
গ. 'এই লভিনু সঙ্গ তব'
ঘ. 'তোমায় নতুন করে পাবো বলে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৮-১৪২)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সের প্রেমভাবনার প্রথম দিকে কিছু কিছু গানে রয়েছে বিষাদময়তার ধারাবাহিকতা। এ সময়কার গানে দেখা যায় বাতাসে কেবলই স্বপ্ন চয়ন করে চলেছেন কবি। এ বয়সেই তিনি রেখে গেছেন প্রেমের অকৃপণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ পর্বেই রূপাশ্রিত প্রেমভাবনা অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। একদিকে কবি তাঁর ভাবনাকে রূপের বাঁধনে না বেঁধে, ভালোবাসার অসংখ্য বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। অন্যদিকে নির্মল আনন্দ-অনুভবে প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাণের খেলায় লীলা রসেও মগ্ন হয়েছেন। প্রেমের ক্ষণচাপল্য এবং অস্থিরতা গানগুলির অবয়বে ছড়ানো কিন্তু বিরহ-মিলনের মধ্যে কবিচিত্তের অধীরতা, ব্যাকুল আর্তি ধরা পড়েছে। তবে লক্ষ করা যায়, এ বিরহতে প্রেম ও পূজা উভয়ই বিরাজমান। এ সময়ের কিছু গানের ধরন দেখলেই কবিচিত্তের ভাবনা ফুটে ওঠে—

ক. 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'
খ. 'আমি তোমার প্রেমে হবো সবার কলঙ্কভাগী'
গ. 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না'
ঘ. 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৮-১৪২)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি পর্যায়ের গানের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ৪০ বছর বেশ সময় দিয়েছেন। এ সময়ে তাঁর লিখিত ঋতু সংগীত সংখ্যায় অনেক। বলা যায়, তিনি এ সময়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের রূপকল্পের সংযোগ স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলিতে এ সম্পর্কে বলেন—

> নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল, স্থল, আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন, ষড়ঋতু আপন পুষ্প পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্বচাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪২ : ৫৯)

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ জোর দিয়ে গান রচনা করেছেন। তবে সুরযোজনায় ব্যতিক্রম দেখা যেত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর বৃক্ষ-লতা-শস্যপূর্ণ প্রান্তর-গ্রাম-আকাশ-বাতাস-মাঠ ও ভরা নদীর কোলে অনেক সময় কাটিয়েছেন। এভাবেই কবির প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপনের সাধনা চলতে লাগল। সেই সময় প্রকৃতি তাঁর মনে যে রসের সঞ্চার করেছিল তার প্রকাশ দেখা গেল সাতচল্লিশ বছর বয়সে লেখা *শারদোৎসব* নাটিকার গানগুলিতে। *শারদোৎসবের* মতো সুন্দর ঋতুর গান আগে আর পাওয়া যায়নি। এই গানেই প্রকাশ পেল যে, ঋতুর সঙ্গে একটি আন্তরিক যোগস্থাপনা সূচনা তিনি করতে পেরেছেন। যেমন—

মেঘ বিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ২৭৪)

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে রচিত বাউল সুরাশ্রিত দেশাত্মবোধক গানে ভাবের এক অন্য ধারা-ই সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ বয়সে স্বদেশি-সংগীতের তথা স্বাদেশিকতার উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯০৫ সালে এই পটভূমিতেই স্বদেশি-সংগীতের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। এই গানগুলি কেবল জনপ্রিয়ই নয়, দেশপ্রেমের সাময়িক আবেদন নিবেদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে গানগুলির কাব্যমূল্য পৌঁছে যাচ্ছে সর্বদেশে, সর্বকালে। কেবল এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ পর্যায়ের সবচেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যবয়সে স্বদেশি-সংগীত ধারায় বাউলসুরকে বা লোকসুরকে প্রাধান্য নিয়েই বেশিরভাগ গান রচনা করেছেন। এ সকল স্বদেশি-সংগীতের কথা বা গানের বাণী অত্যন্ত সাবলীল ও সর্বজনবোধ্য করে তৈরি করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের উদ্বুদ্ধকরণে রচিত গান অনেকটাই সাড়া জাগিয়েছিল সেসময়। এ পর্বে রচিত এমন কিছু গান হলো—

ক. 'এবার তোর মরা গাঙে'
খ. 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'
গ. 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৭৪-১৮১)

সংগীত রচনার এ পর্যায়ে তিনি গানের ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষণেও আগ্রহী হয়েছিলেন। ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চতাল প্রভৃতি তালগুলোও তাঁর এ বয়সের রচনা। এছাড়া এই সময়কার রচনাতেও তাঁর অল্পসংখ্যক হিন্দি ভাঙা গান লক্ষ করা যায়। কিন্তু ১৯২৫-এর পরে তাঁর এ ধরনের আর কোন রচনা লক্ষ করা যায়নি। এছাড়া *নৈবেদ্য*, *অচলায়তন*, *খেয়া*, *চৈতালী*, *উৎসর্গ* প্রভৃতি গ্রন্থের গানগুলিও রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার রচনা।

পরিণত বয়স

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে বা রচনার শেষ পর্বে তাঁর সৃষ্টিতে এসেছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হয়েছে আরও পরিণত। তাই তো এই সময়কার গানকে বলা হয় পরিণত বয়সের গান। এই বয়সে রবীন্দ্রনাথ পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ প্রভৃতি পর্যায়ে আরও বেশি পরিণত গান উপহার দিয়েছেন। এই পর্বই কবির ঈশ্বর আরাধনার শেষ পর্ব। রবীন্দ্র ভাবনায় প্রশান্তির স্নিগ্ধতা। আসন্ন মৃত্যুর সুস্থির আলোয় কবি সেই পরম প্রিয়তমের আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে সেই অপরূপ ঈশ্বর, জীবননির্ভর বন্ধু দণ্ডায়মান। সে সময়কার বা তার পরবর্তী গানে কথার অর্থ মূলত একই। এ সময়কার গানে পূজা নয়, প্রেমের আধিক্য লক্ষ্য করা যেত। এ বয়সে তিনি প্রেম ও পূজার পার্থক্য বুঝতে পেরেছিলেন। অধ্যাত্মবোধটাকে তিনি অধিকতর আত্মিক ও মনের মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। পূজা পর্যায়ের 'বন্ধু' উপবিভাগের পর তিনি ক্রমান্বয়ে 'প্রার্থনা' উপশিরোনামে গানের সংকলন করেছেন। তবে *গীতাঞ্জলির* প্রথম গানটিকে তিনি প্রার্থনা সংগীত না বলে 'বিবিধ' উপশিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গানটি হচ্ছে—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৩৬)। এরপর ক্রমান্বয়ে দুঃখ, বিরহ, উৎসব প্রভৃতি উপশিরোনামের পর আনন্দ উপশিরোনামে সংকলিত হয়েছে ২৫টি গান। কবি বলেছেন, অন্তহীন আনন্দে তাঁর অঙ্গ গড়া। তাঁর প্রতি অণু-পরমাণু আলোর সঙ্গ পেয়েছে। আনন্দ ও আলোর সঙ্গে থেকে আসছে প্রেম। প্রেমে-প্রাণে-গানে-গন্ধে-আলোকে-পুলকে মিলেই জীবন। যে জীবন নিত্য দিন অমৃতে স্নাত বলে কবি বিশ্বাস করেছেন। তাঁর রচনায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে গান আছে। আর আমি-তুমি সম্পর্কের প্রশ্নটি এসেছে সেখান থেকেই। কবি বলেন—

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ৯৮)

আমি তুমি সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ এটি। এটি ঈশ্বরের সাথে আমি তুমি দর্শনভাবনার একটি ব্যতিক্রমী রচনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্যায়ের সংকলনের এক পর্যায়ে বাউল উপপর্যায়ও তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতায় বাউলবাদ নানা মাত্রায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। ঔপনিষদিক ক্ল্যাসিকাল দর্শনের সঙ্গে লৌকিক বাউল দর্শনকে মিশিয়ে তিনি আপনদর্শনচিন্তা নির্মাণ করেন। এরপর 'পথ' ও 'শেষ' উপশিরোনামে তিনি গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ গানে ঘোষণা করেছেন, তিনি দাঁড়াতে চান তেমন স্থানে যেখানে সকল পন্থা এসে মিলেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্যায়ের গানের সংকলন ও উপস্থাপন শেষ করলেন। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব হলো যে, এর কেন্দ্রস্থলে এক সর্বজনীন, সর্বকালীন ঈশ্বরকে স্থাপন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষকে মেলাতে চেয়েছেন। সেই মিলনসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে কাজ করছেন তাঁর পরমেশ্বর। গানে গানে তিনি সব মানুষকে মিলিয়ে দেন। বিশ্বের এর বিস্ময়কর অধিষ্ঠান এই পূজা পর্যায়ের গান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে প্রেম পর্যায়ের গানে ভালোবাসার অশেষ বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দ্বারদেশে উপনীত কবির হাত থেকে *মহুয়ার* মতো প্রেমকাব্য *শেষের কবিতা*র মতো উপন্যাস পাওয়া গেছে। প্রেম এখানে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা' উন্মত্ততা নয় জীবন-রসিক কবি প্রেমের রূপ ও রাগের নিত্য নবীনতায় প্রাণপ্রাচুর্যে এখানে স্থিত, কবি স্বীকৃত মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে অনুসরণযোগ্য।

> প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ বারবার চেষ্টা করেছি গানে, আশাকরি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ১৭২)

প্রেম এখানে পূর্ণিমা নিশীথের বিলাস বিভ্রমকারী জ্যোৎস্না সঙ্গিনী নয়। ভালোবাসা এখানে কঠিন মোহাবেশমুক্ত। তবু জয়ের আনন্দে বিচ্ছেদের রোমান্টিক বেদনা জেগে ওঠে। চিরপথিক কবি ভালবাসার শাশ্বত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন চলার ছন্দে। তাই কবির ভাবনায় আসন্ন বিদায়ের সুর অনুরণিত। কবির এ বয়সের গানগুলো এরকম—

ক. 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা'
খ. 'কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে'
গ. 'কবে তুমি আসবে বলে'
ঘ. 'আমি কান পেতে রই'
ঙ. 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৫০-৩৫৩)

রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রেমের গান আছে যেখানে বক্তা পুরুষ, আবার অনেক প্রেমের গান আছে যেখানে বক্তা নারী। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার রূপটি প্রধানত মূর্ত নয়, অমূর্ত। সমগ্র প্রেরণাই যেন বক্তার বোধকে গভীরভাবে সৃজন করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার গান, আত্মবোধের গান, অমলিন শুভ্রতা সন্ধানী কবির আত্মসচেতনতা। কবি এভাবেই প্রেমের গানে সর্বপ্রকার অনুভবে পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে।

১৩২৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ ২০ বছরের আরম্ভ। অর্থাৎ তিনি ষাট বছর বয়সে পা রাখলেন। ঋতুর গানের দিক থেকে এই সময়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে

তাঁর এই ২০ বছরব্যাপী সাধনার প্রকৃত পরিচয় এখনই প্রকাশ পেল। অথবা বলা যায়, এ সময় থেকেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সার্থক পরিণতি দেখা গেল। এখন থেকেই রচনা করতে লাগলেন গ্রীষ্ম ও হেমন্তের গান। এই প্রথম তারা প্রবেশের অধিকার পেল।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে বাংলার ষড়ঋতুর লীলার মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির যে অভ্যন্তর ছন্দটি বিকশিত হয়ে উঠেছে তাকে আমরা নিবিড় করে পাই। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বর্ষামঙ্গল, ফাল্গুনী, শারদোৎসব, শেষবর্ষণ, বসন্তোৎসব, ঋতুরঙ্গ প্রভৃতি ঋতু উৎসবে। তাঁর রচিত অজস্র গান আমাদের মধ্যে সেই বোধকেই তীব্র করে তুলেছে যে, মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি একটি অখণ্ড সূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথের রচিত ষড়ঋতুর কিছু গান উদাহরণস্বরূপ দেয়া হলো—

গ্রীষ্ম- i. 'নাই রস নাই'
ii. 'বৈশাখ হে মৌনীতাপস'
বর্ষা- i. 'আমি কী গান গাব যে'
ii. 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'
শরৎ- i. 'শরতে আজ কোন্ অতিথি'
ii. 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়'
হেমন্ত- i. 'হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে'
ii. 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী'
শীত- i. 'শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন'
ii. 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'
বসন্ত- i. 'আজি বসন্ত জাগ্রতদ্বারে'
ii. 'আজ খেলা ভাঙার খেলা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ৩০১-৩৬১)

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনার আলোচনার শেষে প্রাপ্ত সূত্রগুলি হলো—প্রকৃতিপ্রেমে রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত রোম্যান্টিক। ১৩২৮ থেকে জীবনের শেষ ২০ বছরে প্রকৃতির অপরিসীম লীলারসে মুগ্ধ কবিমানস। প্রকৃতির এক প্রাণময়-সত্তার উপলব্ধি সম্ভবত শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রায় ধরা পড়েছে। শেষ পর্বে তাই সর্বাধিক রচিত হয়েছে প্রকৃতির গান।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে স্বদেশ পর্যায়ের গান একটি নব উদ্দীপনার জোয়ার তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা ও উন্মাদনার পরে কবি যেসব স্বদেশি-সংগীত রচনা করেন, তার বেশিরভাগই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত। গানগুলির আবেদন এক্ষেত্রেও সার্বজনীন ও সর্বকালীন। তবে এ সময় স্বদেশচেতনার প্রবাহ কিছুটা কম ছিল। তবে এ সময়কার গানে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববোধ তুলে ধরেছেন। যেমন—

ক. 'এ ভারতে রাখো'
খ. 'ও আমার দেশের মাটি'
গ. 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'
ঘ. 'খরবায়ু বয় বেগে'
ঙ. 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৭৩-৩৯৪)

রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার গানে কাব্যাংশে ছন্দের বন্ধনমুক্তি ও সহজগতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বলা যায়, শেষ ২০ বছরে তাঁর রচিত যাবতীয় কাব্য রচনাতে তিনি গদ্যধারাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এর ফলে গানের কথার কাব্যবৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট আকারে ধরা পড়ে। এধরনের কিছু গান হলো—

ক. 'ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী'
খ. 'আজি কোন সুরে বাঁধিব'

গ. 'ওরে জাগায়ো না'
ঘ. 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হলো' (অমল, ১৯৭১ : ১২৮)

এছাড়াও রবীন্দ্ররচনার এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে—*চিত্রাঙ্গদা*, *চণ্ডালিকা* ও *শ্যামা* নৃত্যনাট্যসমূহ। জীবনের প্রথমভাগে রচিত গীতিনাট্যের সাথে এর পার্থক্য হল সংলাপ ও নৃত্য। অর্থাৎ গীতিনাট্যে একটি নাট্যকাহিনিকে গানের মাধ্যমে সংলাপবদ্ধ করা হয় আর নৃত্যনাট্যে নেপথ্যের গানের সাথে চরিত্রগুলির নৃত্য একসাথে মঞ্চায়ন করা হয়। বলা যায়, এই নৃত্যব্যঞ্জনাতে কাহিনি তার প্রকাশের ভাষা পায়। এছাড়াও তাঁর এ সময়কার রচনার মধ্যে *তাসের দেশ*, *বর্ষামঙ্গল*, *ডাকঘর* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র-জীবনের সংগীত-রচনার মূল উপজীব্য ছিল কথা ও ভাবের সমন্বয় সাধন। তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় যেমন ছিল কৈশোরক প্রজ্ঞা, মধ্য ও শেষ জীবনের রচনাতেও ছিল ধারাবাহিক বন্ধনমুক্তির কথা যা তাঁর কাব্যে, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে সর্বত্রই ধরা পড়েছে। ঈশ্বর যেমন তাঁর জীবনে কখনো বন্ধু, কখনো সখা আবার কখনো প্রিয়তমরূপে ধরা দিয়েছেন তেমনি কখনো তাঁর গুরু অথবা কখনো জীবনদেবতারূপেও ধারণ করেছেন। প্রকৃতি ও স্বদেশ পর্যায়ের গানেও তার স্বীয় ভাবের ব্যত্যয় চোখে পড়ে না। এই বন্ধনমুক্ত মানবাত্মার জয়গান তাঁর সকল ধারার সংগীতেরই অন্যতম ভাষা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এরূপ রচনা দ্বারা আজও স্বমহিমায় সমুজ্জল ও ভাস্বর।

সহায়কপঞ্জি

অমল মুখোপাধ্যায় (২০০১)। *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
(২০১২)। *রবীন্দ্রসংগীতকলা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
গৌরী ভট্টাচার্য্য (২০০৭)। *রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন স্তর*। মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯৫)। *গীতবিতান*। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
(২০০৮)। *গীতবিতান*। শুভম্, কলকাতা।
(২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (নবম খণ্ড)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।
(১৩৭৩)। *সংগীতচিন্তা* (সুর ও সংগতি)। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।
(১৩৪২)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিচিত্র প্রবন্ধ (কেকাধ্বনি)। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।
সন্‌জীদা খাতুন (১৯৯৯)। *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* : ব্রাত্যজনের কথাশিল্প

মোছা. চারমিন সুলতানা*

[সারসংক্ষেপ : নিভৃতচারী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার মর্মমূলে প্রোথিত রয়েছে বাংলার অপরূপ নিসর্গসৌন্দর্য এবং প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে যেভাবে একীভূত করে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যকর্মে উপস্থাপন করেছেন, তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। বাংলা অঞ্চলের বাইরের, তথা বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দিগন্ত-প্রসারিত আরণ্যপ্রকৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট জনপদের মানুষকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছেন তাঁর অন্যতম কালজয়ী উপন্যাস *আরণ্যক*। নির্জন অরণ্যের কোলে লালিত, আমাদের চেনা-পরিচিত জীবন-পরিসর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র লোকায়ত জীবনাচারে অভ্যস্ত, তথাকথিত 'সভ্য' সমাজের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জীবনচর্চাকারী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও সরলতাপূর্ণ এক গতিশীল ব্রাত্যজীবনের ছবি অসামান্য শিল্পসুষমায় ভাষারূপ দিয়েছেন এ-উপন্যাসে। বৃহৎ-বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন বিহারের পূর্ণিয়া-ভাগলপুরের অন্তর্গত লবটুলিয়া-বইহারের আরণ্যক মানুষের জীবনযাপন নিয়ে রচিত *আরণ্যক* বিভূতিভূষণের ঔপন্যাসিক সত্তাকে দিয়েছে কালোত্তর মহিমা। এ-উপন্যাসের পট-পরিসরে অঙ্কিত ব্রাত্য ও বঞ্চিত মানুষদের জীবনকথা বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক। এ বিষয়টির ওপরই আলোকসম্পাত করা হয়েছে এ-প্রবন্ধে।]

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) তাঁর *আরণ্যক* উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে প্রধানত শ্রমজীবী 'গাঙ্গোতা' সম্প্রদায়ের জীবনকথা রূপায়িত করেছেন। এক কালে গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো 'গাঙ্গোতা' জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ এবং 'গঙ্গা' নাম থেকেই এ-জাতিগোষ্ঠীর নামকরণ 'গাঙ্গোতা' করা হয়।[১] 'গাঙ্গোতা' বিহারের একটি জাতিগোষ্ঠী। প্রধানত বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও মুঙ্গের অঞ্চলে এদের বসবাস। এক তথ্যানুযায়ী ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের ভাগলপুরে ৪৯,২২৬ জন, পূর্ণিয়ায় ১২,৭০২ জন এবং মুঙ্গেরে ৮,৭৫৭ জন গাঙ্গোতা জাতিভুক্ত মানুষ বাস করতো (Risley, 1891 : 269)। *আরণ্যক* উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ভাগলপুর অঞ্চলের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দুর্গম অরণ্যে বসবাসকারী গাঙ্গোতা জাতিগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা, উৎসব-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, আচার-বিশ্বাস, রীতি-প্রথা, ধর্ম-কর্ম, অর্থনীতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম-বিরহ তথা জীবনযাত্রার সামগ্রিক ইতিবৃত্ত। গাঙ্গোতা ছাড়াও দোষাদ, ছত্রী, চাষা-কলোয়ার, মৈথিল ব্রাহ্মণ, বাঙালি, রাজপুত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগ্রামশীল মানুষের জীবনকথা উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজপুত মহাজন রাসবিহারী সিং, স্বার্থান্বেষী মহাজন নন্দলাল ওঝা এবং সরল বিশ্বাসী মহাজন ধাওতাল সাহু ব্যতীত এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই হতদরিদ্র সহায়সম্বলহীন। চাষাবাদ, পশুপালন, শিকার, কয়লা বিক্রি, কাটুনি মজুরসহ নানাবিধ শ্রমভিত্তিক পেশার সাথে যুক্ত থেকে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। নিরন্তর পরিশ্রম ও সংগ্রামশীলতাই এদের জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি। জীবন-

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবিকার তাগিদ, অস্তিত্ব-রক্ষার লড়াই ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে সবাই সদাব্যস্ত থাকলেও উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই স্বমহিমায় ভাস্বর, জীবন-যাপন ও জীবন-বিশ্বাসে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তাদের কেউ বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব হয়ে গেলেও লেখাপড়ার চর্চা ছাড়ে না, আগ্রহ দেখায় না শ্রমজীবনে; কেউ শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও টোলে পড়ানোর পৈতৃক পেশা ছেড়ে শ্রমজীবী কোনো পেশায় প্রবেশ করবে না; কেউ প্রকৃতিপ্রেমিক, বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বীজ জঙ্গলে পুঁতে রাখে; কেউ সরল বিশ্বাসী মহাজন, টাকা ধার দিয়ে তা উসুলের জন্য কাউকে তাগিদ দেয় না; কেউ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা, সর্বস্ব হারিয়ে শিকার ও গোচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে; কেউ মহাজন, কেউ মুহুরি, কেউ সিপাহি, কেউ দরিদ্র স্কুলমাস্টার, কেউ চিকিৎসক, কেউ কবি-দার্শনিক, কেউ নৃত্যশিল্পী, জাতিতে গাঙ্গোতা, দোষাদ, রাজপুত, বাঙালি, মৈথিল ব্রাহ্মণ কিংবা ছত্রী—এমন বিচিত্র শ্রেণি ও পেশার হলেও এদের সকলেই বিশ্বাস করে বিভিন্ন আরণ্যলোকাচারে। বিশ্বাস করে বন্য মহিষের জাগ্রত দেবতা 'টাঁড়বারো' কিংবা 'ডামাবাণু' নামের নির্জন জঙ্গলে থাকা জিন-পরিদের। জীবন-যাপন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মাচরণ, উৎসব-পার্বণ ও আচার-বিশ্বাসে *আরণ্যকে*র মানুষের জীবনাচারে রয়েছে গভীর সাযুজ্য—যা এ উপন্যাসে প্রতিফলিত ব্রাত্যজীবনের পরিচয় বহন করে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> এই আরণ্য রাজসভার সভাসদ্‌গুলি নামে ও কার্যে, ব্যবহারে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রতিবেশের সহিত এক সুরে বাঁধা—উদার, অনাসক্ত নিস্পৃহতার ভাবমণ্ডলবেষ্টিত। কবি বেঙ্কটেশ্বর, অধ্যাপক মটুকনাথ, উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্, সৌন্দর্যপিয়াসী যুগলপ্রসাদ, সাঁওতাল-রাজা দোবরু পান্না ও তাহার প্রপৌত্রী, নিজ সরল পবিত্র হৃদয়ের খাঁটি আভিজাত্যে গৌরবময়ী তরুণী ভানুমতী, স্বভাবশিল্পী, নৃত্যবিশারদ ধাতুরিয়া—সকলের উপরেই আরণ্য মহিমার রাজচ্ছত্র প্রসারিত। [...] এমন কি বাঙালী ডাক্তার রাখালবাবুর বিধাবা স্ত্রী, বিহার-প্রবাসী দরিদ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ধ্রুবা, জবা—ইহারাও বাঙালী সমাজের বহুশতাব্দীর সাধনালব্ধ সংস্কার হারাইয়া এই অরণ্যসমাজের আভিজাত্যগৌরবহীন, শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছে। (শ্রীকুমার, ১৯৯৬ : ৬১৪-৬১৫)

আরণ্যক উপন্যাসে বিধৃত এ স্বতন্ত্রস্বভাবী আরণ্যপ্রকৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট মানুষের জীবনাচার স্বাভাবিকভাবেই গভীর বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিকর্ম *আরণ্যক* নিয়ে যাঁরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রুশতী সেন, গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, কিশলয় ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, গিয়াস শামীম, গৌতম কুমার দাস প্রমুখ সমালোচক ও গবেষকের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে রুশতী সেন, গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, কিশলয় ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে *আরণ্যক* উপন্যাসে বিধৃত বিবিধ বিষয় নিয়ে সাধারণ আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে, গবেষক রণজিৎ কুমার সমাদ্দার *আরণ্যক*-এ উঠে আসা সাঁওতাল যুদ্ধ-প্রসঙ্গের সাথে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্যকর্মে বিধৃত সাঁওতাল গণযুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন; গবেষক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যক*-এর ভাষার বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করেছেন; গবেষক গিয়াস শামীম আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে *আরণ্যক*-এর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং গবেষক গৌতম কুমার দাস *আরণ্যক*-এর গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ জনপদের ভাষা চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যক* বিষয়ে যে 'শৌর্য্যপূর্ণ গতিশীল ব্রাত্যজীবনে'র কথা উল্লেখ করেছেন, সে প্রসঙ্গে আরও অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। তারই প্রয়াস চালানো হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

দুই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র-আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, সেই *পথের পাঁচালী*'র পুরো পথই প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত এবং প্রকৃতি-সংলগ্ন মানুষের জীবনাখ্যানের সারাৎসার। *অপরাজিত* (১৯৩২) ও *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৫) উপন্যাসেও বাংলার চিরচেনা প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য এবং প্রকৃতি-সংলগ্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবনের সাহজিক সারল্যের এক অপূর্ব মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে। তাঁর *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসও কেবল আরণ্যপ্রকৃতির বর্ণনা নয়, অরণ্যসংশ্লিষ্ট মানুষের জীবন-সংগ্রামের এক অসামান্য রূপায়ণ। এ উপন্যাসের পট-পরিসর গড়ে উঠেছে বাংলা অঞ্চলের বাইরের, তথা বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দিগন্তপ্রসারিত আরণ্যপ্রকৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট জনপদের মানুষকে কেন্দ্র করে। তাদের জীবন-সংগ্রামকে ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপন করলেও *আরণ্যক* সর্বাংশে ঔপন্যাসিকের কল্পলোক উৎসারিত নয়। বিভূতিভূষণ তাঁর পরিদৃশ্যমান বাস্তবজগৎ থেকে আহরণ করেছেন *আরণ্যকে*র আখ্যানভাগ। এ-সম্পর্কে স্বয়ং ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিতপক্ক জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, 'আরণ্যক' সেই কল্পনালোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২)[২]

বস্তুত, ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের 'অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার' হিসেবে যোগ দিয়ে ভাগলপুর যান বিভূতিভূষণ। তবে তাঁর কাজ ভাগলপুরে ছিল না। তাঁকে যেতে হয় আরও প্রায় পনেরো ক্রোশ দূরে, 'উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর, পুবে ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহার আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত' বিস্তৃত জঙ্গল মহালের 'জঙ্গল আবাদ, জমির বিলি বন্দোবস্ত, তহসিলের তহবিল ঠিক রাখা, মাইলের পর মাইল ঘোড়ার পিঠে ঘুরে ঘুরে মহালে তদারকি' করাসহ বিবিধ কাজ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ-জীবনীকার কিশলয় ঠাকুর লিখেছেন :

> ইংরাজি উনিশ শ' চব্বিশের জানুয়ারির শেষে, শীত-সন্ধ্যায় ভাগলপুরে এসে নামলেন বিভূতিভূষণ জঙ্গল মহালের কাজ নিয়ে। প্রথমে এসে উঠলেন ভাগলপুর শহরে রমানাথ ঘোষের সদর কাছারি 'বড়বাসা'য়। শহরের একপ্রান্তে মোগসর পল্লী, সেখানকার বুড়ানাথ রোডের উপর জঙ্গল মহালের সদর কাছারি দোতলা পাকাবাড়ি এই 'বড়বাসা'। [...] তবে [...] তাঁকে যেতে হবে নগরী ছাড়িয়ে প্রায় পনের ক্রোশ দূর থেকে যে জঙ্গল মহাল শুরু হয়েছে, সেইখানে। বুড়ানাথ রোডের দোতলা পাকাবাড়ি নয়, সেখানে জঙ্গলের অভ্যন্তরে খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়ালের কাছারিতে থাকতে হবে। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর, পুবে ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহার আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত এই জঙ্গল মহাল। দিক্-দিশেহারা অরণ্য-প্রান্তর, দূর-বিসর্পী শৈলশ্রেণী, জনাই ক্ষেত, মকাই ক্ষেত, চিনাঘাসের দানাভোজী সাঁওতাল আর নানা দেহাতী মানুষ। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে। (কিশলয়, ১৯৫৮ : ৯৯)

'সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে'র সেই জঙ্গল মহালের কর্ম-অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন তাঁর এই অমর সৃষ্টি *আরণ্যক*। ১৯২৯-এ 'খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনসটিটিউশন'-এ 'বাঙলা শিক্ষক' হিসেবে যোগদানের (কিশলয়, ১৯৫৮ : ১১৫) পূর্বপর্যন্ত প্রায় চার বছর বিভূতিভূষণ জঙ্গলমহালের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত

জঙ্গলমহালের সেই কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতারই শিল্পরূপ *আরণ্যক*। তবে *আরণ্যক* ১৯২৮/১৯২৯-এর তাৎক্ষণিক রচনা নয়, জঙ্গলমহালের কর্মজীবন শেষ হওয়ার প্রায় এক দশক পরে এ স্মৃতিকথাধর্মী উপন্যাস লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ। *আরণ্যক* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯-এ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *মাসিক প্রবাসী* পত্রিকায় কার্তিক ১৩৪৪ সংখ্যা থেকে ফাল্গুন ১৩৪৫ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে *আরণ্যক* প্রকাশ হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করে—'কাত্যায়নী বুক স্টল, ২০৩, বিধান সরণী, কলিকাতা [...] চৈত্র ১৩৪৫, ইং ১৯৩৯' (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪৭৮)। দীর্ঘ সময় বিরতি দিয়ে *আরণ্যক* লিখলেও জঙ্গলমহাল অবলম্বনে একটি উপন্যাস রচনার আকাঙ্ক্ষা বিভূতিভূষণের মনে ১৯২৮ থেকেই সক্রিয় ছিল। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর দিনলিপি *স্মৃতির রেখায়* ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ তারিখে লিখেছেন :

> এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটি কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জ্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জ্জনতা ভেদ ক'রে সে সুড়ি-পথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়ি-পথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি—এইসব। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪১৭)

নির্জন অরণ্যের কোলে লালিত 'এই জঙ্গল জীবনে'র 'দারিদ্র্য, সরলতা'পূর্ণ যে 'ব্রাত্য জীবনের ছবি' চিত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছিলেন, তার এক অত্যাশ্চার্য শিল্পভাষ্য *আরণ্যক*। আভিধানিক অর্থে 'ব্রাত্য' বলতে 'পতিত; সংস্কারহীন; ব্রতভ্রষ্ট' (এনামুল হক, ২০১১ : ৯১৩) তথা 'শাস্ত্রসম্মত আচারের বদলে লৌকিক আচার পালনকারী' (মুরশিদ, ২০১৪ : ২১৯৩) জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। 'ব্রাত্য' সম্পর্কে সমালোচক বিমল চক্রবর্তী লিখেছেন—"যারা ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্মের বাইরে ছিলেন বহুদিন বা এখনও রয়ে গেছেন। [...] বহুর মধ্যে যারা ঐক্য উপলব্ধি করতে পারেনি, বিচিত্রের মধ্যে যারা ঐক্যস্থাপন করতে পারেনি তারাই ব্রাত্য" (বিমল, ২০১২ : ১১৯)। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মানুষের বিচিত্র যে জীবনাচার, সে জীবনাচারের সাথে যারা ঐক্যস্থাপন করতে পারেনি, জীবনযাপন-বৈশিষ্ট্যে যারা মূলধারার জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তারাই ব্রাত্য। 'ব্রাত্য' জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গবেষক অশ্বিনী কুমার দাস লিখেছেন :

> আর্যসমাজে যে দলের মর্যাদা কম ছিল সেই দলকেই প্রথমে 'ব্রাত্য' বলা হত। পরে গায়ত্রহীন ব্রাহ্মণদেরই শুধু বলা হয়েছে 'ব্রাত্য'। আরো পরে সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা আর্যসংস্কৃতিচ্যুত হয়ে 'ব্রাত্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই ব্যাপক অর্থে আর্যসংস্কৃতি থেকে শুধু চ্যুত নয়, যাদের সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, সেইসব বর্ণ বা জাতিকেও 'ব্রাত্য' বলা চলে। (অশ্বিনী, ২০০৯ : ৯)

বস্তুত, আমাদের চেনা-পরিচিত সামাজিক-ধর্মীয়-অর্থনৈতিক-পারিবারিক জীবন-পরিসরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকায়ত জীবনাচারে অভ্যস্ত, তথাকথিত 'সভ্য' সমাজের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জীবনচর্চাকারী জনগোষ্ঠীকেই 'ব্রাত্য' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। *আরণ্যক* উপন্যাসে ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দুর্গম অরণ্যের আশ্রয়ে লালিত এমন এক জনজীবনের আখ্যান রূপায়িত হয়েছে, যে জীবন-পরিসর বাঙালির চেনা-পরিচিত সামাজিক জীবন-পরিসর থেকে একেবারেই আলাদা, যা 'ব্রাত্য' জীবনেরই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় :

> এ উপন্যাসে বাঙলা দেশ নেই, তার সামাজিক, পারিবারিক কোন পরিচিত পরিবেশের চিহ্নমাত্র এখানে চোখে পড়ে না। দিক্‌দিগন্তব্যাপী নির্জন অরণ্য-সমাবৃত এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রহস্য-

> নিবিড় যাযাবর জীবন-পরিবেশ। বাঙলা দেশ থেকে মাত্র কয়েক শ' মাইল দূরে রহস্যময় অপরিচিত জগৎ আছে—যেখানে আজও সেই অতিপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আদিম পৃথিবী ও জীবন-পরিবেশ বেঁচে রয়েছে,—এই আশ্চর্য উপলব্ধি বিভূতিভূষণের আগে আর কেউ আমাদের কাছে বহন ক'রে আনেননি। (গোপিকানাথ, ১৯৫৯ : ১১৩)

আরণ্যকে বিধৃত চরিত্রসমূহের কলকাতা শহর সম্পর্কে অজ্ঞতা উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে লক্ষ করা যায়। যেমন : গনু মাহাতো কলকাতা শহর দেখেনি, ভাগলপুরে একবার গিয়ে গাড়ি দেখে অবাক হয়েছে, ঘোড়া ছাড়া গাড়ি চলতে দেখা তার কাছে তাজ্জব মনে হয়; কবি-দার্শনিক রাজু পাঁড়ের বিশ্বাস 'শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা', 'সেখানে গেলে কারও জাত থাকে না, সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইস', ডাক্তারসাহেব টাকা কম দেয়ায় রোগীর পা কেটে ফেলে প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণা; সাঁওতাল রাজকুমারী ভানুমতী জীবনে কখনও কোনো শহর দেখেনি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত আমাদের চেনা-পরিচিত সমাজ থেকে আলাদা এক সমাজকেই নির্দেশ করে। *আরণ্যক* উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে যে জীবনের চালচিত্র শিল্পরূপ দেয়া হয়েছে, সে জীবন যে বাস্তবিকপক্ষেই ব্রাত্য জীবনের বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত, সে-সম্পর্কে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণের জবানিতে স্বয়ং ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> এইসব যাযাবর গৃহস্থজীবন বড় বিচিত্র। কথা বলিয়া দেখিয়াছি ইহাদের সঙ্গে, সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন—সমাজ নাই, সংসার নাই, ভিটার মায়া নাই। নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া, বনে শৈলশ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জ্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে, কাল সেখানে। ইহাদের প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু সবই আমার কাছে নূতন ও অদ্ভুত। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭১-৭২)

বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে ব্রাত্য তথা অন্ত্যজ জীবনের শিল্পভাষ্য লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদে*ও ব্রাত্য তথা সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের পরিচয় মেলে। বেশির ভাগ চর্যাগানেই ডোম-ডোমনী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক প্রভৃতি ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে। ডোম, নিষাদ, শবর এরা গ্রামের বাইরে উঁচু জায়গায় বাস করে, ব্রাহ্মণরা এদের স্পর্শও করে না। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর বড়ু চণ্ডীদাসসহ অন্যান্য কবিগণ, মঙ্গলকাব্যের কবিগণ, *মৈমনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মেও প্রান্ত্যজ মানুষের প্রতি গভীর দরদ লক্ষ করা যায়। আধুনিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্যিকের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটকেও ব্রাত্য তথা অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জীবনাচারের নানাবিধ চালচিত্র ভাষারূপ লাভ করেছে। মানবিক জীবনবোধ-উৎসারিত লেখকরা গভীর মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় ভালোবাসায় আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজের চারপাশে অবস্থান-করা স্বতন্ত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, রূপকথা-উপকথা, জীবন-সংগ্রাম, আচার-বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, জীবন-জীবিকা, দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হতাশা-বেদনা, সংকীর্ণতা-ঔদার্য, প্রেম-বিরহ তথা সামগ্রিক জীবনানুষঙ্গকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। উল্লেখ্য যে, উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাস যেকোনও জীবনাখ্যান অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। বাঙালি ঔপন্যাসিকরা বিভিন্ন ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর জীবনেতিহাস রূপদানে তাঁদের সেই সুযোগকে যে হাতছাড়া করেননি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *আরণ্যকে* (১৯৩৯) বিধৃত ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দুর্গম অরণ্যের কোলে লালিত ব্রাত্য জীবনকথা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়* (১৯৪৬) রাঢ়-অঞ্চলের কোপাই নদী-তীরবর্তী বাঁশবাদি গ্রামের কাহার সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র, *নাগিনী কন্যার কাহিনী*তে (১৯৫২) রাঢ়-অঞ্চলের হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের উপকথা-নিয়ন্ত্রিত জীবনকথা এবং সাঁওতাল জীবন ও ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬) উপন্যাসে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা,

সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬০) *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (১৯৫১) উপন্যাসে বিহারের জিরানিয়ার অন্তর্গত তাৎমাটুলি-ধাঙড়টুলি-বিসকান্ধা অঞ্চলের অন্ত্যজ ধাঙড় ও তাৎমা সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য, অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) উপন্যাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস-তীরবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন-সংগ্রাম; সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) *গঙ্গা* (১৯৪৭) উপন্যাসে গঙ্গা-তীরবর্তী মাছমারা সম্প্রদায়ের জীবনযুদ্ধ এবং রিজিয়া রহমানের (১৯৩৯-২০১৯) *একাল চিরকাল* (১৯৮৪) উপন্যাসে উত্তর বাংলার দিনাজপুর অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনি ও জীবন-পরিণামের আখ্যানবৃত্তে উপস্থাপিত বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রাত্য জীবনচিত্র তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এসব উপন্যাসে প্রতিফলিত স্বতন্ত্র-স্বভাবী ব্রাত্য জীবনের শৈল্পিক সৌন্দর্য খুব সহজেই পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে।

তিন

আরণ্যকে অরণ্য-প্রকৃতির অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনা ও ব্রাত্যজীবনের নানারূপ চালচিত্রের পরিচয় মেলে কেন্দ্রীয়-চরিত্র সত্যচরণের জবানিতে। সে *আরণ্যক* আখ্যানের কথক। সত্যচরণ স্বয়ং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের প্রতিনিধি-চরিত্র। বিভূতিভূষণ ঠিক যেভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনে চাকরিসূত্রে বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গলমহালে গিয়েছিলেন, সত্যচরণও অনুরূপভাবেই ভাগলপুরের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের অরণ্যে গমন করে। কথক সত্যচরণের উত্তম পুরুষের জবানিতে তার জীবনে ঘটে-যাওয়া অরণ্য-জীবনের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে উপন্যাস-আখ্যান শুরু হয়। একদা ভাগলপুরের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের জঙ্গলমহলে ছয় বছরের যে কর্মজীবন সম্পন্ন করেছে সত্যচরণ, পনেরো-ষোলো বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও সে সেই স্মৃতি ভুলতে পারে না। সেই জঙ্গলমহালের স্মৃতি প্রতিমুহূর্তে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় নির্জন অরণ্যের নিসর্গ সৌন্দর্যের কথা এবং সেই অরণ্যের বিস্তীর্ণ জঙ্গলে পরিচিত হওয়া অগণিত মানুষের জীবন-যাপনের কথা। অরণ্যে লালিত সে-সব মানুষের জীবন আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের জীবন-যাপনের প্রকৃতি-পদ্ধতি থেকে একেবারেই আলাদা। *আরণ্যকে* সেই 'ব্রাত্য জীবনের কথা' জানানোই সত্যচরণের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সত্যচরণের ভাষায় :

> কত অতিদরিদ্র বালকবালিকা, নরনারী কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। [...] ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি [...]। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৩)

উপন্যাসের 'প্রথম পরিচ্ছেদ'-এ দেখা যায়, সত্যচরণ বিএ পাস করে বেকার অবস্থায় চাকরি খুঁজছে কলকাতার এক মেসে থেকে। কিন্তু অনেক ঘুরেও কোনও চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে না। এদিকে মেসের ম্যানেজারও পাওনা টাকা পাওয়ার জন্য অস্থির করে তুলছে। এমন এক পরিস্থিতিতে একদিন সতীশ নামে এক পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয় সত্যচরণের। সতীশ তাকে নিয়ে যায় আর এক বন্ধু অবিনাশের গানের জলসায়, যে ময়মনসিংহের কোনও এক জমিদারের ছেলে। পরদিন বন্ধু অবিনাশের বাড়িতে গেলে কথায় কথায় অবিনাশ সত্যচরণকে তাদের জঙ্গলমহালে চাকরির প্রস্তাব দেয়।

> অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মত একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরী পেতে দেরী হবে না অবিশ্যি। [...] আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি

> বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে? (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৭)

অনেকটা সত্যচরণের মতোই কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের 'অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার' হিসেবে যোগ দেয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণও :

> সিদ্ধেশ্বরবাবুও কিছুদিন ধরে ভাবছিলেন একটা কথা। সুপারিনটেনডেনট সারদাকান্ত চক্রবর্তীর চিঠিগুলি ইদানীং তাঁকে উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে। ক্রমাগত আয় হ্রাস পাচ্ছে। কোথায় যেন পুকুরচুরি হচ্ছে মহালে। সুপারিনটেনডেনট সারদাবাবু একজন বিশ্বস্ত সহকারী চান। যোগ্য বেতন দিতে সিদ্ধেশ্বরবাবু রাজি। তাই বলে যোগ্য আর সৎ লোক তো চাইলেই জোটে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেতে রাজি হবেন কি বিভূতিভূষণ? অতি সাবধানে প্রস্তাবটা করতেই যেন তা লুফে নিলেন তিনি। মাইনে আরও বেশি—পঞ্চাশ টাকা। সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, আপনি আমাদের ভাগলপুর জঙ্গল মহালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেলে আমার একটা মুশকিল আসান হয়। (কিশলয়, ১৯৫৮ : ৯৯)

সত্যচরণ যেখানে কলকাতায় দিনের পর দিন চেষ্টা করেও চাকরি জোটাতে পারছিল না, সেই পরিস্থিতিতে বন্ধু অবিনাশের পক্ষ থেকে চাকরির এমন সুযোগ বিভূতিভূষণের মতো সেও হাতছাড়া করে না। 'ম্যানেজার'-এর চাকরি নিয়ে এক শীতের বিকালে জঙ্গল-মহালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় সত্যচরণ। গরুর গাড়িতে চড়ে সারারাত পনেরো-ষোলো ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে পরদিন বেলা দশটার সময় জঙ্গল-মহালের কাছারিতে পৌঁছায়। কাছারির সিপাহি মুনেশ্বর সিং অতিশয় দরিদ্র লোক। সে সত্যচরণের কাছে একটি 'লোহার কড়া' কিনে দেয়ার আর্জি জানায়। কী হবে লোহার কড়াই দিয়ে জানতে চাইলে মুনেশ্বর সিং বলে :

> একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১১)

মুনেশ্বর সিংয়ের কথা শুনে সত্যচরণ অবাক হয়ে যায়। একটি লোহার কড়াই যে এত গুণের এবং তার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে এটা তার কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগে। সে শুনেছিল যে, এ অঞ্চলের লোক বড় গরিব। কিন্তু ছ আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটলে স্বর্গ হাতে পায় এবং তারা যে এতটা গরিব, এই প্রথম সে তা বুঝতে পারে। মুনেশ্বর সিংয়ের এমন দরিদ্রতার কথা ভেবে তার মায়া হয়। কেবল সিপাহি মুনেশ্বর সিং নয়, *আরণ্যকের* অরণ্যঘেরা প্রতিবেশের প্রায় সকল চরিত্রের জীবন-বাস্তবতাই এমন করুণ। দিনে তিনবেলা দূরে থাক, মাসে কিংবা বছরান্তে একবেলা ভাত খেতে পাওয়া এ অঞ্চলের অরণ্যবাসী মানুষের জন্য রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার! কাছারিতে নতুন ম্যানেজার বাবু এসেছে, তার জন্য ভাত রান্না হবে, সেখানে গেলে একটু ভাত পাওয়া যেতে পারে, এমন প্রত্যাশায় বিনা-নিমন্ত্রণে অনেকে কাছারিতে এসে ভিড় করে।

> পাটোয়ারী বলিল—না হুজুর। ওরা খাবার লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ দু-দিন ধরে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের ওই রকম অভ্যেস। আরও অনেকে বোধ হয় কাল আসবে। [...] হুজুর, এরা বড় গরীব, ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান

> বিবেচনা করে। আপনি আসছেন, ভাত খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে। দেখুন না আরও কত আসে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪)

এ অঞ্চলের মানুষের এমন দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন ও আরণ্যপ্রতিবেশ সত্যচরণের কাছে বড় অদ্ভুত লাগে—"যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি" (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪)। চিরপরিচিত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই আরণ্যপ্রতিবেশের রহস্যময় জীবনধারার সাথে জড়িয়ে সত্যচরণ এই ব্রাত্যজীবনের নানা অনুষঙ্গের সাথে পরিচিত হয়।

গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসসূত্রে 'গঙ্গা' নাম থেকে 'গাঙ্গোতা' জাতিগোষ্ঠীর নামকরণ করা হলেও ত্রিশ বছর পূর্বে গঙ্গায় বিলীন হওয়া জমি পুনরায় চর হিসেবে জেগে উঠলে সেই জমিতে পুরাতন প্রজা হিসেবে তাদের কোনো অধিকার মেলে না। সত্যচরণকে 'ম্যানেজার' হিসেবে চাকরি দিয়ে জঙ্গলমহালে পাঠানো হয়েছিল মূলত জঙ্গল-মহালের জমি ইজারা দেওয়ার জন্য। যে জমি ইজারা দেওয়ার জন্য সত্যচরণকে পাঠানো হয়েছিল, সেই জমি ত্রিশ বছর পূর্বে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছিল। নদীগর্ভে দশ বছর বিলীন থাকার পর চর জেগে ধীরে ধীরে অরণ্যে পরিণত হয় সে অঞ্চল। কিন্তু নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পূর্বে যারা প্রজা হিসেবে ছিল, জমি গঙ্গায় চলে যাওয়ায় অন্যত্র গিয়ে বাস করছিল, সেই পুরাতন প্রজাদের জমিদার পুনরায় জমি দিতে চান না। জমিদাররা মোটা সেলামি ও বর্ধিত হারে খাজনার লোভে নতুন প্রজাদের কাছেই জমি ইজারা দিতে আগ্রহী। ফলে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতিদরিদ্র পুরোনো প্রজাদের বঞ্চিত হতে হয়। সত্যচরণের ভাষায় :

> এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্ব্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল—বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে—কিন্তু যাহারা পিতৃপিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এই সব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন না। মোটা সেলামী ও বর্দ্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দ্যোবস্ত করিতে চান। অথচ যে-সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতিদরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারা বার বার অনুরোধ-উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২-১৩)

জমিদারদের এমন শোষণের শিকার হয় এ অঞ্চলের গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতিদরিদ্র মানুষেরা। এ অঞ্চলের সকল গাঙ্গোতা-দোষাদ-ছত্রীদের যে নতুন করে জমি ইজারা নেওয়ার সমর্থ ছিল, তা নয়; কিন্তু যাদের সে সমর্থ ছিল, তাদেরও বঞ্চিত হতে হয়েছিল। কেবল জমিদারদের বঞ্চনা নয়, শোষক-মহাজনদের নানারকমের অত্যাচার-শোষণেরও শিকার হতে হয় এ অঞ্চলের গরিব প্রজাদের। কুচক্রী মহাজন নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা এবং ভয়ংকর স্বভাবের মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের অত্যাচারে সদা তটস্থ থাকতে হয় এ অঞ্চলের গরিব প্রজাবর্গকে। গরিব প্রজাদের রক্ত চুষেই বড়লোক হয়েছে এরা। কেবল গরিব প্রজা নয়, অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন লোকও কিছু বলতে সাহস করে না রাসবিহারী সিংয়ের অত্যাচারের প্রতিবাদে। দুর্দান্ত লাঠিয়াল-বাহিনী দিয়ে মারধর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করাতে সে বিশেষ পটু। তার অস্ত্রাগারে সংরক্ষিত অগুনতি লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ারসহ বিবিধ অস্ত্র প্রজাদের শাসনার্থেই ব্যবহার করে সে। কোনো লোক কোনোভাবে তার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে, রাজবিহারী সিংয়ের এমন মনে হলে ওই লোকের আর রক্ষা নেই। নিজের আবাদ-করা জমির ফসল তো নিবেই, অন্যের আবাদ-করা জমির ফসল দখল করতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির মাধ্যমে এ অঞ্চলে 'লাঠি যার, ফসল তার' প্রবাদপ্রতিম অন্যায়-শাসন প্রতিষ্ঠা করে রাসবিহারী সিং। রাজপুত রাসবিহারী সিং, ছটু সিং, গজার সিংকে আবার সাহায্য করে অপর মহাজন নন্দলাল

ওঝা গোলাওয়ালা। খাসমহলের সার্কেল অফিসার, ম্যানেজার, পুলিশ সকলেই রাসবিহারীর হাতে থাকায় কাউকেই গ্রাহ্য করে না সে। সত্যচরণের ভাষায় :

> রাসবিহারী সিং-ই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরীব গৃহস্থ প্রজা থরহরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকও কিছু বলতে সাহস করে না, কেননা রাসবিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দ্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিসও নাকি রাজবিহারীর হাতে আছে। খাসমহলের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় সে কাহাকে গ্রাহ্য করিবে এ জঙ্গলের মধ্যে? (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৬৬-৬৭)

জমিদার-মহাজনদের শোষণ-বঞ্চনার শিকার এ অঞ্চলের দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলকেই বিভিন্ন শ্রমনির্ভর পেশার (যেমন- চাষাবাদ, পশুপালন, শিকার, কয়লা বিক্রি, কাটুনি মজুর প্রভৃতি) মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। চাষাবাদ বলতে এ অঞ্চলে মকাই, কলাই, গম, ভুট্টা, খেড়ী প্রভৃতির চাষ হয়। ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নেই বলে এ অঞ্চলে ধান একেবারেই হয় না।

> আমাদের মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়—ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশী হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশী নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশী, গম তাহার অর্দ্ধেক। [...] ধান একেবারেই হয় না—ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭৭)

পশুপালন এ অঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পেশা। অবারিত অরণ্য থাকার কারণে অরণ্যে গরু-মহিষ পালন করে অনেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। লবটুলিয়া জঙ্গলের প্রায় বড় একটা অংশ প্রতি বছর গোয়ালাদের গরু-মহিষ চরানোর জন্য খাজনায় দেওয়া হয়। চাষাবাদ-পশুপালন ছাড়াও পশুপাখি শিকার, কয়লা বিক্রি ও কাটুনি মজুর হিসেবে কাজ করে এ অঞ্চলের অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। যখন বিভিন্ন ফসল কাটার সময় আসে তখন কাটুনি মজুররা সেই অঞ্চলের ফসল কাটার জন্য। ফসল কেটে তারা ফসলের একটা অংশ মজুরি হিসেবে পায়। পূর্ণিয়া, তরাই, জয়ন্তীর পাহাড়ি-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর থেকে গাঙ্গোতা-ছত্রী-ভূমিহার জনগোষ্ঠীর অনেকেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কাটুনি মজুর হিসেবে কাজ করার জন্য আসে। ফসল কাটা হয়ে গেলে চলে যায়।

> নক্‌ছেদী বলিল—ধান তো এদেশে হয় না—ওখানে হয়। ধান কাটার কাজ শেষ হলে আবার যাব গম কাটতে মুঙ্গের জেলায়। গমের কাজ শেষ হতে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়বে। তখন আবার খেড়ী কাটা শুরু হবে আপনাদেরই এখানে। তার পর কিছুদিন ছুটি। শ্রাবণ-ভাদ্রে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর-পূর্ণিয়া অঞ্চলে কার্ত্তিকশাল ধান। আমরা সারা বছর এই রকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে যে সময়ে যে ফসল, সেখানে যাই। নইলে খাব কি? ((বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১০২-১০৩)

এছাড়াও যখন কোনও কাজ থাকে না, তখন কেউ কেউ কেবল জীবিকার প্রয়োজনে সামান্য উপার্জনের আশায় নাচের দল তৈরি করে নাচ দেখানোর জন্য এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে ঘুরে তারা 'হো হো নাচ', 'ছক্কর-বাজি নাচ' ও 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ দেখায়। নাচের কিছু জানুক বা না-জানুন কেবল দুমুঠো খাবারের আশায় প্রায় সব ধরনের, সব বয়সের লোককে সে নাচের দলে এসে যুক্ত হতে দেখা যায় (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪৮)। বস্তুত, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনাতিপাত করে এ অঞ্চলের মানুষেরা। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদটা তাদের কাছে সব থেকে জরুরি। আর জীবন বাঁচানোর জন্যই বিভিন্ন পেশার কাজ করে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যায় এ অঞ্চলের মানুষ।

দারিদ্র্য ও অর্থকষ্টের কারণে উপযুক্ত বয়স পার হয়ে গেলেও বিয়ে করতে পারেনি গনোরী তেওয়ারী। কোনো পিতাই এই চালচুলোহীন দরিদ্র স্কুল মাস্টারকে কন্যা সম্প্রদান করতে চায় না। তাই নিজ গাঁয়ের পছন্দের মেয়েটির সাথে বিয়ে ঠিকঠাক হলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে যায় তার। মেয়েটিকে তার মনে ধরেছিল, কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে সংসার করার সৌভাগ্য তার হয়নি।

মাঝে মাঝে নানা রকমের প্রাকৃতির দুর্যোগ ও বন্য প্রাণীর আক্রমণের শিকার হতে হয় এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে। কখনও বাঘের উৎপাত বেড়ে যায়। যেমন : ফুলকিয়া বইহারে একদিন গভীর রাতে ঘুমানোর সময় খুপড়ি থেকে বাঘ এসে একটা শিশুকে ধরে নিয়ে যায়, পরে সত্যচরণসহ অন্যরা গিয়ে সেখানে বাঘের পায়ের থাবাও দেখতে পায়; তার ঠিক তিনদিন পর সন্ধ্যার সময় বনের কাছ থেকে একটা রাখালকে বাঘে নিয়ে যায় ইত্যাদি। কখনও কখনও বন্য মহিষ ও শূকরের উপদ্রব বেড়ে যায়। কখনওবা গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় দাবানল বা জলকষ্টের মতো 'বিভীষিকাময়' প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গ্রীষ্মকালে উত্তরে আজমাবাদ হতে দক্ষিণে কিষণপুর, পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গলের সব খাল, ডোবা, কুণ্ডী (বড় জলাশয়) শুকিয়ে গেলে চারদিকে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। একদিকে জলকষ্ট, অন্যদিকে শুরু হয় দাবানল। গ্রীষ্মকালে বনাঞ্চলে একবার আগুন ধরে গেলে মাইলের পর মাইল দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জীবনকে ভয়াবহ সঙ্কটে ফেলে দেয়। এমনি নানা রকমের প্রাকৃতির দুর্যোগের সাথে নিয়ত লড়াই করেই বাঁচতে হয় *আরণ্যকের* জনগোষ্ঠীকে।

খাবার হিসেবে এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, খেড়ী বা শ্যামাঘাসের দানা, বাথুয়া শাক, মটরশাক, বন্য গুড়মী ফুল, চীনা ঘাসের বীজ প্রভৃতি সিদ্ধ, ভাজা বা লবণ দিয়ে কাঁচা খেয়েই জীবন নির্বাহ করে। গনু মাহাতোর ভাষায় :

> হুজুর, দোকানে জিনিস কেনবার মত পয়সা কি আমাদের আছে, না আমরা বাঙালী বাবুদের মতো ভাত খেতে পাই? [...] খেড়ীর দানা সিদ্ধ, আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, আর একটু লুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, লুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে—লতানে গাছ, ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়; সে সময় এক মাস এ-অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২০)

বস্তুত, অরণ্যভূমি বলে এখানে ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি না-থাকায় ভাত এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ 'কালেভদ্রে' খেতে পারে। ফলে ভাত খাওয়াটা এদের কাছে শখের বা বিলাসিতার মতো একটা ব্যাপার হিসেবে গণ্য। তবে একেবারে সবাই যে ভাত জোটাতে পারে না, তা নয়। "ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহাসী সিং আর নন্দলাল পাঁড়ে [ওঝা] খায় দুবেলা" (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২০)। উল্লেখ্য যে, ভাতের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হলেও নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিংদের খাবার-ব্যবস্থা ও খাবার পরিবেশনার পদ্ধতি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। মহাজন নন্দলাল ওঝার আমন্ত্রণে তার বাড়িতে গেলে সত্যচরণকে খেতে দেওয়া হয় :

> প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা—সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতীর কানে মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবারের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২২)

বৈচিত্র্যপূর্ণ ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজনের দেখা মেলে মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতেও :

> ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া কিন্তু তাক্ লাগিল। এত কি একজনে খাইতে পারে? হাতীর কানের মত বৃহদাকার পুরী খান-পনের, খুরিতে নানা রকম তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপো, চাটনি,

> পাঁপর। আমার তো এ চার বেলার খোরাক। রাসবিহারী সিং নাকি একা এর দ্বিগুণ আহার্য্য উদরস্থ করিয়া থাকে একবারে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৬৯)

জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার সত্যচরণের জন্য প্রাচুর্যপূর্ণ খাবারের আয়োজন করলেও একই অনুষ্ঠানে আসা সাধারণ গাঙ্গোতা প্রজাদের জন্য মহাজন রাসবিহারী সিং ব্যবস্থা করে চীনা ঘাসের ভাজা দানা ও দই। তাও কোনো খাবার পরিবেশনের পাত্রে নয়, উঠানে পাতা বিছিয়ে তাতেই সরবরাহ করা হয় সে খাবার। দরিদ্র প্রজারা সেই দই ও চীনা ঘাসের ভাজাই মুখে হাসি নিয়ে খায়। খাদ্যসঙ্কট *আরণ্যক* উপন্যাসে বিধৃত সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের সমস্যা। কেবল খাবারের বন্দোবস্ত না-করতে পারার কারণে ম্যানেজার সত্যচরণের পাতের উচ্ছিষ্ট নিয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর প্রত্যাশায় অসহায় বিধবা নারী কুন্তা প্রতিদিন এসে অপেক্ষা করে থাকে।

নানা রকমের লোকবিশ্বাসে *আরণ্যকের* জীবন স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। অরণ্যে জীবনযাপন করতে গিয়ে তারা প্রায় সকলেই বন্য মহিষের দেবতা 'টাঁড়বারো'কে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা, বনের মধ্যে চলতে গিয়ে যখন কোনো বন্য মহিষের দল বিপদে পড়ে, তখন বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারো এসে আসন্ন বিপদ থেকে মহিষগুলোকে রক্ষা করে। ছুটু সিং তার দলবল নিয়ে বন্য মহিষ শিকারের জন্য একবার মহিষের চলাচলের পথে বড় গর্ত খুঁড়ে রাখে। তাদের পরিকল্পনা ছিল, বন্য মহিষ এসে যখন সেই গর্তে পড়বে, অমনি তারা আড়াল থেকে বেড়িয়ে গর্তে পড়া মহিষটি শিকার করবে। কিন্তু মহিষের দল গর্তের কাছাকাছি এসে পড়লে রহস্যজনকভাবে টাঁড়বারো এসে মহিষের দলের সামনে হাত উঁচু করে দাঁড়ায় এবং মহিষের দল অন্য দিকে চলে যায়। এভাবে মহিষের দেবতা টাঁড়বারো আসন্ন বিপদের হাত থেকে বন্য মহিষের দলকে রক্ষা করে। দশরথ ঝাণ্ডাওলার ভাষায় :

> গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এগিয়ে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্ত্তের ধারে, গর্ত্তের দশহাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্ত্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতেও এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৯৮)

টাঁড়বারোর গল্প কেবল দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার বানানো আখ্যান নয়, এ অঞ্চলের মানুষের লোকবিশ্বাসের অংশ। গনু মাহাতোও একবার সত্যচরণকে টাঁড়বারোর অভিজ্ঞতা জানিয়েছিল। লবটুলিয়ার পাটোয়ারীও ছোটবেলা থেকে অনেকবার টাঁড়বারোর গল্প শুনেছে। এমনকি সাঁওতাল-রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দ্দীও টাঁড়বারোতে বিশ্বাস করে :

> রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্ব্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২২)

টাঁড়বারোর মতোই মায়াবিনী বনদেবী বা জিন-পরিতে বিশ্বাস করে *আরণ্যকের* অরণ্যে লালিত লোকজন। তাদের ধারণা, গভীর জ্যোৎস্নারাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন দলবেঁধে সরস্বতী কুণ্ডীর (জলাশয়) জলে 'হুরী-পরীরা' নেমে আসে স্নান করতে। তারা কাপড় খুলে ডাঙায় পাথরের উপর রেখে জলে স্নান করতে নামে। কখনওবা জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্ম-ফুলের মতো জেগে আছে। তবে সে-সময় কেউ

পরিদের দেখে ফেললে পরীরা তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। আমীন রঘুবর প্রসাদ পরিদের হাতে মৃত্যুবরণকারী হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং-এর মৃত্যুর বর্ণনা দেন এভাবে :

> [...] হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৮৩)

মায়াবিনী বনদেবীরা কখনও কখনও নির্জন অরণ্যে খুপরি করে থাকা মানুষের খুপরিতে গভীর রাতে বিভিন্ন রূপ ধরে আসতো। কখনও আসতো 'সাদা কুকুর' কখনওবা 'সাদা ধোয়া শাড়ী' পরিহিত কম বয়সী মেয়ের রূপ ধরে। এমনকি প্রায় একই সময়ে রামচন্দ্র আমীন 'সাদা কুকুর' হিসেবে দেখলেও আসরফি টিণ্ডেল 'মেয়ে' মানুষের রূপে দেখতে পায়। রামচন্দ্র আমীনের সাথে কথোপকথনের বিষয়টি এভাবে সত্যচরণকে জানায় আসরফি টিণ্ডেল :

> উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে? আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল। উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেদায়বি? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুর রাতে? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নীচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৫০-৫১)

মেয়ে মানুষের রূপ ধরে চলে যাওয়ার পরে আসরফি টিণ্ডেল পিছু পিছু গিয়ে পায়ের ছাপ দেখার চেষ্টা করেও কোনও পায়ের ছাপ দেখতে পায় না। আবার কখনও খুঁজতে গিয়ে একগাছা কালো কুচকুচে নরম চুল খুঁজে পায়। এমন সব রহস্যময় ঘটনার পরে এক রকম উন্মাদ হয়ে যায় রামচন্দ্র আমীন। বোমাইবুরুর জঙ্গলে দেখতে পাওয়া এই রহস্যময়ী জিন-পরিদের স্থানীয়ভাবে 'ডামাবাণু' বলে। 'মেয়ে' রূপ ধরে আসা জিন-পরি দেখতে পায় বোমাইবুরুর জঙ্গলে জমি ইজারা নিয়ে গরু-মহিষ চরাতে আসা বৃদ্ধ এবং তার যুবক ছেলেও। বৃদ্ধ প্রথমে ভেবেছিল তার যুবক ছেলে হয়তো বিগড়ে যাচ্ছে কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়ে। বৃদ্ধ ছেলেকে নিয়ে কাছারিতে এসে সত্যচরণের কাছে ছেলের নামে বিচারও দিয়েছিল। কিন্তু অলৌকিকভাবে সেই জিন-পরির হাতেই [?] জীবন চলে যায় সেই যুবক ছেলের। সত্যচরণের ভাষায় :

> গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাকে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ-জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। [...] মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোন-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছেই একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ, নরম বালিমাটির উপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৫৪-৫৫)

এমনি বিচিত্র অলৌকিক বিশ্বাস, লোক-সংস্কার, লৌকিক মিথ ও অতি-প্রাকৃত ঘটনা, 'উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথরের গল্প, 'আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা' প্রভৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ *আরণ্যকের* ব্রাত্যজীবন।

আরণ্যকের ব্রাত্যজীবনকে বিশিষ্টতা দিয়েছে এ অঞ্চলের মানুষের পালন-করা বিভিন্ন লোকউৎসব। পুণ্যাহ, 'ছট্-পরবে'র উৎসব, হোলির উৎসব, ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব, কড়ারী তিনটাঙার হোলির মেলা, ফসল কাটারি মেলাসহ বিভিন্ন রকমের মেলা হয় এখানে। সাধারণত জমিদারি প্রথায় বছরের সূচনায় প্রজার নিকট থেকে খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান করা হলেও এ অঞ্চলে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হয় 'আষাঢ় মাসে'। জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার সত্যচরণ কাছারিতে পুণ্যাহের আয়োজন করে। আষাঢ় মাসের বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেক দূরের পথ

পাড়ি দিয়ে দরিদ্র গাঙ্গোতা-দোষাদ জনসাধারণ সামান্য খাবারের প্রত্যাশায় কাছারিতে উপস্থিত হয়। পুণ্যাহ'র দিনে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় 'চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু'। অতি সাধারণ সে খাবার খেতেই কাছারিতে মানুষের উপ্‌চে পড়া ভীড় :

> দুপুর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিলে লাগিল, এমন মুশকিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না। দলের মধ্যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিয়াছে, কাছারির দপ্তরখানায় তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিলাম, পুরুষেরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৩২)

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব মূলত শ্রীকৃষ্ণের অনুসারীদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। শ্রাবণ মাসে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না এ উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে সাঁওতাল রাজ-পরিবারের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বহুদিনের চর্চা। এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে যুবক-যুবতীরা অনেক আনন্দ করে। ঝুলনের দিন সন্ধ্যার পূর্বে একদল তরুণ-তরুণীসহ সকলে একটা প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করে পাহাড়ের দিকে যায়। পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে আবার কিছুটা পথ উঠে একটা সমতল স্থানে মিলিত হয়। সেখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছের নিচে 'প্রায় ত্রিশটি কিশোর তরুণী' গাছটিকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। একদল যুবক সেই তরুণীদের সঙ্গে মাদল বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুরতে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত নৃত্য-গান আনন্দ করে বাড়ি ফিরে যায় তারা। সত্যিই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সে আয়োজন :

> সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একদল তরুণ-তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল—তাহাদের পিছু পিছু আমরাও গেলাম—সে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা। [...] কিছুদূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছ—গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। রাজা দোবরু বলিলেন—এই গাছ অনেক কালের পুরোনো—আমি ছেলেবেলা থেকে দেখ আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে। [...] আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪১)

হোলির উৎসব এ অঞ্চলের মানুষের, বিশেষ করে রাজপুতদের একটি প্রধান উৎসব। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে রাজপুত মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে হোলির উৎসব আয়োজিত হয়। রাসবিহারী সিংয়ের বহু গাঙ্গোতা ও রাতপুত প্রজা সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। দরিদ্র প্রজা, যাদের পক্ষে ভালো কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তারা মলিন ছেঁড়া কাপড় পরেই 'আবীর ও রঙ' মাখানো ও হোলি খেলতে চলে আসে। হোলির জন্য সত্যচরণের সামনে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা, মিছরিখণ্ড, এক ছড়া ফুলের মালাসহ একটা বড় থালা এগিয়ে দেয়া হয়। রাসবিহারী সিং সত্যচরণের কপালে কিছু আবির মাখিয়ে দিলে সত্যচরণও রাসবিহারী সিংয়ের কপালো কিছু আবির মাখিয়ে দেয়। রাজপুতদের হোলি উৎসব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সত্যচরণ তার সামনে এগিয়ে দেওয়া থালায় রাখা টাকা দেখে বুঝতে পারে না যে, তার কী করা উচিত! তখন রাসবিহারী সিং জানায়, থালায় দেওয়া টাকা মূলত সত্যচরণকে নজরানা হিসেবে দেয়া হয়েছে। সত্যচরণ তখন নিজের পকেট থেকে আরও কিছু টাকা বের করে থালায় রাখা টাকার সাথে মিশিয়ে সবাইকে সেই টাকা দিয়ে মিষ্টিমুখ করাতে বলে (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৬৮)। হোলির উৎসবে আরও নানা রকমের নাচ-

গানেরও ব্যবস্থা করা হয়। নাটুয়া শিল্পী ধাতুরিয়াকে চার আনা পয়সা মজুরি দিয়ে আনা হয় অর্ধেক রাত পর্যন্ত নাচ ও গানের জন্য।

এ অঞ্চলের আরও একটি বিশেষত্বপূর্ণ উৎসব 'ছট্-পরবে'র উৎসব। সাধারণত হিন্দু বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী কার্তিক মাসের ষষ্ঠ তিথিকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন টোলা (পাড়া/পল্লি) হতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরে দলে দলে গান গাইতে গাইতে কল্‌বলিয়া নদীতে 'ছট্' ভাসাতে যায়। সারাদিন টোলাজুড়ে নানা-রকম উৎসব চলতে থাকে। সন্ধ্যায় প্রায় সব বাড়িতেই বিভিন্ন রকমের পিঠা বানানো হয়। ছট্-পরবের উৎসবে টোলার সকল লোক বিশেষ ধরনের পোশাক 'ফর্সা ধুতি' ও 'মেরজাই'[৩] পরিধান করে। এ উৎসবে সারারাত চলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খাওয়া-দাওয়া আর নাচগান, হাসি ও বাজনার ধুম।

> কার্ত্তিক মাসে ছট্-পরব এদেশের বড় উৎসব। বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ী পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কলবলিয়া নদীতে ছট্ ভাসাইতে চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্-পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি কলরব, মেয়েদের গান— [...] কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসবদীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭৯)

'মেলা' এ অঞ্চলের উৎসব-অনুষ্ঠানের একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। এখানে নানা উপলক্ষ্যে সময়ে সময়ে মেলা বসে; যেমন– কড়ারী তিনটাঙার মেলা, অখিলকুচার মেলা কিংবা ফসল কাটার সময় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ফসল কাটারি মেলা প্রভৃতি। তবে এসব মেলার মধ্যে সবথেকে বিশেষত্বপূর্ণ মেলা হচ্ছে কড়ারী তিনটাঙার হোলির মেলা। বেশ বড় পরিসরে গ্রামের মাঠে এ মেলা হয়। মেলায় দূরের ও কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে, যেমন– মহিষারডি, কড়ারী, তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি স্থান থেকে লোকজন আসে। তরুণীরা চুলে পিয়াল ফুল ও রাঙা ধাতুপফুল গুঁজে কিংবা মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকিয়ে সেজেগুঁজে মেলায় আসে, আড্ডা দেয়, বিভিন্ন কিছু যেমন- পুঁতির দানার মালা, সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না প্রভৃতি ক্রয় করে। ছেলে মেয়েরা মেলা থেকে তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা খাজা কিনে খায়। মেলায় বইয়ের একটি দোকানে চটের থলের ওপর হিন্দী *গোলেবকাউলী*, *লায়লা-মজনু*, *বেতাল পঁচিশী*, *প্রেমসাগর* প্রভৃতি নানা রকমের বই নিয়ে বসলেও তেমন কেউ বই কেনে না। মেলার পাশে এক জায়গায় লোকজন দলবেঁধে রান্না করে খায়, যাদের জন্য আবার মেলার এক অংশে বিভিন্ন তরিতরকারির বাজার বসে, যেখানে কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুঁটকী কুচো চিংড়ী ও নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম, কাঁচা পেঁপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফুল, পেয়ারা ও বুনো শিম বিক্রয় হয়। উল্লেখ্য যে, "লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য" (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪১)। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের ফসল যখন কাটা হয়, মানুষের কাছে যখন ফসল কিংবা টাকা থাকে, তখন ফসল কাটাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ফসল কাটারি মেলা হয় এ অঞ্চলে। কখনও কখনও অসাধু কিছু মানুষ নানারকমের লটারি, লাঠি খেলার নামে বিভিন্ন জুয়াখেলার আয়োজন করে সরল ছেলেমেয়েদের অর্থ হাতিয়ে নেয়। এমনি এক জুয়াখেলায় দুই ভাই এক বোনের অর্থ নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা উঠে এসেছে এভাবে :

> [...] কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়, যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়। বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে একবারও লাঠিতে ফাঁস বাধাইতে পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪৬)

আরণ্যক উপন্যাসে ঔপন্যাসিক লোকায়ত প্রেমের কয়েকটি উপাখ্যান তুলে ধরেছেন, যা থেকে দুর্গম অরণ্যভূমির সরল মানুষদের হৃদয়ভাবনার সাথে পরিচিত হওয়া যায়। ভূঁইহার বামুন জয়পাল কুমারের নিঃসঙ্গতা যে কোনও পাঠকের মনকেই ভাবিয়ে তোলে। পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। স্ত্রী-কন্যা সবই তার ছিল। কিন্তু স্ত্রী-কন্যাকে হারিয়ে এখন সে এই বনে এসে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে; এখানে একা থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কোথাও যায়ও না, কিছু করেও না। জীবন সম্পর্কে সে এতোটা নিস্পৃহ হয়ে গেছে যে, এখন আর কিছুই খারাপ লাগে না তার। যেন ব্যক্তি বিভূতিভূষণের নিঃসঙ্গতা ধারণ করে এ অরণ্যে বসবাস করছে জয়পাল কুমার।

রাজু পাঁড়ের যৌবনে প্রেম হয়েছিল তার স্ত্রী সরযুর সাথে। রাজুর বয়স যখন আঠারো ও সরযুর বয়স চৌদ্দ বছর, তখন উত্তর-ধরমপুরের শ্যামলালটোলাতে সরযুর বাবার টোলে রাজু দিনকতক ব্যাকরণ পড়তে যায়। সে-সময়ই সরযুর প্রেমে পড়ে যায় রাজু। ছট্ পরবের উৎসবের দিন সরযুর সাথে রাজুর প্রেমালাপ, সরযুর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব এবং তার পর বিয়ে—বায়ান্ন বছর বয়সী রাজু পাঁড়ের মুখে বর্ণিত সেই প্রেমাখ্যানের স্মৃতিচারণ সত্যিই চমৎকার। রাজু পাঁড়ের প্রেমস্মৃতি :

> আমি বললাম—সরযু, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ, আমার লেখাপড়া হবে না জানি, কেন মিছে কষ্ট পাই, ভাবছি টোল ছেড়ে চলে যাব এ মাসের শেষেই। সরযু কেঁদে ফেললে। বললে—বাবাকে বলো না কেন? সরযুর কান্না দেখে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। এমনি হয়ত যে কথা কখনও আমার অধ্যাপককে বলতে পারতাম না, তাই বলে ফেললাম একদিন। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২৬)

কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ তার প্রিয়তমা স্ত্রী রুক্মাকে নিয়ে বেশ সুখেই সংসার করছে। কিন্তু কবিতার মাধ্যমে সে একটি গ্রাম্য প্রেম-কাহিনি শোনায় সত্যচরণকে। ছোট্ট একটি খালের এ-পারের মাঠে এক তরুণ যুবক বসে ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত এবং খালের ওপারের ঘাটে একটি মেয়ে নিত্য কলসি-কাঁখে জল ভরতে আসতো। মেয়েটি আসলে ছেলেটার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শিস দিয়ে গান করা, ছাগল গরু তাড়ানো, মাঝে-মধ্যে চোখাচোখি হলে মেয়েটির লজ্জায় লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়া প্রভৃতি প্রেমের সুখস্মৃতি এখনও যুবকটি ভুলতে পারে না। একসময় মেয়েটি হারিয়ে গেলেও যুবকের মধ্যে সেই প্রেমস্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করে। কবিতার মাধ্যমে বর্ণিত এ গ্রাম্য প্রেমের গল্প যে কবি বেঙ্কটেশ্বরের নিজের শৈশব জীবনের গল্প, যে প্রেমের স্মৃতি বহু বছর পরেও কবিকে তাড়িত করছে, সত্যচরণ সহজেই তা বুঝতে পারে। সত্যচরণের ভাষায় :

> কবি-প্রিয়ার নাম রুক্মা, কারণ ঐ নামে কবি একটি কবিতা লিখিয়াছে, পূর্ব্বে আমাকে তাহা শুনাইয়াছিল। ভাবিলাম এমন গুণবতী, সুরূপা রুক্মাকে পাইয়াও কি কবির বাল্যের সে দুঃখ আজও দূর হয় নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৩৪)

বলিষ্ঠ প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা *আরণ্যক* উপন্যাসের দেবী সিং রাজপুতের বিধবা স্ত্রী কুন্তা। এক সময়ের মহাজন দেবী সিং বাবুগিরি ও অযথা অর্থ ব্যয় করে এবং নিজের জাতভাই রাসবিহারী সিংয়ের সাথে মোকদ্দমা করে নিঃস্ব হয়ে মৃত্যুবরণ করলে কুন্তার জীবনের নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভোগ। অনেক কষ্ট, দুঃখ-দৈন্য, হেনস্থা, অপমান স্বীকার করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করলেও রাসবিহারী সিংয়ের কুপ্রস্তাবে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দেয় না সে। তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ- "মেরে ফেল বাবুজী, জান দেগা—ধরম দেগা নেহিন।" কুন্তার মতো চরিত্রের বলিষ্ঠতা, উদারতা, সরলতা ও প্রাণবন্ততায় *আরণ্যকের* নারী চরিত্রসমূহ পুরুষ চরিত্রগুলোকে অনেকাংশেই ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রাণোচ্ছলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নক্ছেদী ভকতের দ্বিতীয় স্ত্রী মঞ্চী, সারল্য-উদারতার প্রতীক রাজকন্যা ভানুমতী এবং মানবিকতা-আতিথেয়তার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় কবি বেঙ্কটেশ্বরের স্ত্রী রুক্মা। এ-প্রসঙ্গে সত্যচরণের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

> আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালোবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালোবাসাও বড়। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৩৯)

আরণ্যকে সাক্ষাৎ মেলে বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যতিক্রমী চরিত্রের। প্রকৃতিপ্রেমিক যুগলপ্রসাদ এদের মধ্যে অন্যতম। তার শখ বা নেশা হচ্ছে অরণ্যের মধ্যে নানারকমের ফুলগাছ লাগানো, বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফুলগাছের বীজ মাটিতে পুঁতে রাখা। 'অদ্ভুত মেজাজের' ও 'এক রকম খামখেয়ালী' স্বভাবের যুগলপ্রসাদ শিক্ষিত একজন লোক। কিন্তু কোনো কাজ করে না সে। বিয়ে-সাদি করেছে, অথচ সংসার দেখে না। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলগাছের বীজ সংগ্রহ করে অরণ্যের মাটিতে পুঁতে রাখে। কেবল প্রকৃতিপ্রেমিক নয়, সে একজন উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদও। ফুলের বর্ণনা শুনেই সে বিচিত্র প্রকৃতির অপরিচিত ফুলগাছের নাম বলে দিতে পারে। ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কিংবা বনে-ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাবে, এটাই তার শখ। এসব করে অদ্ভুত প্রশান্তি ও আনন্দ পায় যুগলপ্রসাদ :

> অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম এক সাহেবের বাগানে ভারি চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল! তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতাফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে। [...] আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৮৪)

মৈথিল ব্রাহ্মণ মটুকনাথ পাঁড়ে *আরণ্যকের* অপর একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত চরিত্র। সে অত্যন্ত দরিদ্র। সত্যচরণ চাষবাস করার জন্য কিছু জমি দিতে চাইলেও সে চাষবাস করতে চায় না। সে কিছু সংস্কৃত পড়েছে, কিন্তু তেমন কোনও কাজ শেখেনি – একটা টোলে কিছুদিন পড়ানো ছাড়া কোনও কাজ করেনি সে। বংশানুক্রমে তারা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাই একটি টোল খুলে পড়াতে চায় সে। অগত্যা সত্যচরণ তাকে টোলের জন্য একটি ঘর বেঁধে দিলে সেখানে মটুকনাথ টোল প্রতিষ্ঠা করে। কোনও ছাত্র না-পেলেও সে আশা ছাড়ে না, সেখানে একা একা মুগ্ধবোধের সূত্রগুলো আবৃত্তি করে, পূজার সময় নিজে প্রতিমা গড়ে পূজা করে। অনেকদিন পরে একজন ছাত্র পেয়েও সে খুব খুশি হয়। জঙ্গল থেকে বাথুয়া শাক তুলে তা সিদ্ধ করে একবেলা খেয়ে, কখনও না-খেয়েও সে তার টোল চালিয়ে নিতে থাকে। কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের পৈতৃক শাস্ত্র-ব্যবসায় ত্যাগ করে না।

নওগছিয়া গ্রামের সরল মহাজন ধাওতাল সাহু সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি চরিত্র। নওগছিয়া গ্রামের প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক। সে মহাজন নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিংয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের মানুষ। তার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, সুদে টাকা ধার দিয়ে সে কখনও টাকা তোলার জন্য জোর করে তাগাদা দিতে পারে না। ফলে বহুজন তাকে ফাঁকি দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তার কাছে এসে টাকা চাইলে সে না করতে পারে না। সরলভাবে সবাইকে সে বিশ্বাস করে। তাকে আর টাকা না-দেওয়ার জন্য বললে সে জানায় :

> সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর। এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন। টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে না বাড়লে আমাদের চলে না হুজুর। এই আমাদের ব্যবসা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৩৪)

আরণ্যকের জঙ্গলে লালিত নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া একজন স্বভাবশিল্পী। নাচ শেখার প্রতি অদম্য আগ্রহ রয়েছে তার। একজন 'যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে' তার মধ্যে। কেবল নাচের প্রতি আকুল আগ্রহের কারণেই 'ছক্করবাজি নাচ' শেখার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে সে গয়া জেলার তিনটাঙা গ্রামে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ ভিটলদাসের কাছে যায়। কিন্তু *আরণ্যক* অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে ধাতুরিয়া তার নৃত্যের যথাযোগ্য সমাদর পায় না। তাই সে সত্যচরণের কাছে কলকাতা যাওয়ার আগ্রহের কথা জানায় কেবল তার নাচের সমাদর পাওয়ার জন্য :

> কখনও কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা বাজনা নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলেই যেতে বসেছি। উঃ, কি করেই ওই নাচটা শিখি! (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৭১)

রাজু পাঁড়ে চরিত্রটি তার জীবনাচারের জন্য সহজেই *আরণ্যক* পাঠকের নজর কাড়ে। গরিব ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়েকে সত্যচরণ একরকম বিনামূল্যে দুই বিঘা জমি চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য দেয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে দেড় বছরের মধ্যে দুই-বিঘে জমির জঙ্গলই পরিষ্কার করতে পারে না। হিন্দি ও সংস্কৃত জানা রাজু পাঁড়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে পূজা-অর্চনা, পুঁথি-বইপত্র পাঠ, কবিতা লেখা ও আকাশ-পাহাড় দেখা নিয়ে। পূজাপাঠ ও গীতাপাঠেই চলে যায় তার দিনের বড় একটা সময়, জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করার মতো অবসর সময়ই পায় না সে। ধরমপুর পরগণার বাড়িতে তার তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও বিধবা বোন থাকার পরেও সংসারের চেয়ে প্রকৃতি-ঈশ্বরভক্তি-কবিতা-দর্শনের প্রতিই তার আগ্রহ। কবি-দার্শনিক-সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ রাজু পাঁড়ের কিছুটা দখল রয়েছে চিকিৎসাবিদ্যায়ও। শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হলে মানবিক মানুষ রাজু সেখানে গিয়ে মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে। রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন সর্বদা জটিল তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করে এবং জটিলতা সমাধান করে নিজের মনগড়া যুক্তি দিয়ে। আকাশে রামধনু ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, এমনটা নাকি সে স্বচক্ষে দেখেছে; নক্ষত্রদল হচ্ছে যমের চর, মানুষ কি পরিমাণে বাড়ছে তা সরেজমিনে তদারক করার জন্য নক্ষত্রদল প্রেরিত হয়; সূর্য পূর্বে উদয়-পাহাড়ে ওঠে, যা তার গুরুভাই কামতাপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছে প্রভৃতি। হিন্দি লেখাপড়া কিছুটা জানলেও বহির্জগৎ সম্পর্কে রাজু পাঁড়ের জ্ঞান নেই। 'কলিকাতা' নামটা সে শুনেছে, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা জানে না। বোম্বাই বা দিল্লির বিষয়ে তার ধারণা 'চন্দ্রলোকের ধারণা'র মতো 'সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কুয়াসাচ্ছন্ন'। অনেক বছর পূর্বে একবার পূর্ণিয়া শহরে গিয়ে থাকলেও শহর সম্পর্কে তার রয়েছে অদ্ভুত ধারণা। তার ধারণা, শহর খুব খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডার স্থান; শহরের অধিকাংশ মানুষ বদ্‌মাইস, সেখানে গেলে মানুষের জাত থাকে না; শহরের হাসপাতালে ডাক্তাররা টাকার জন্য মানুষের চিকিৎসার পরিবর্তে ক্ষতিসাধন করেন। তার ভাষায় :

> রাজু বলিল—শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি যে জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইস। আমার এ-দেশের একজন লোক কোন্ শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল, তার পায়ে কি হয়েছিল সেই জন্যে। ডাক্তার ছুরি দিয়ে পা কাটে আর বলে, তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? বললে দশ টাকা দেব। তখন ডাক্তার আরও কাটে! আবার বললে—এখনও বল কত টাকা দেবে? সে বললে—আরও পাঁচ টাকা দেব, ডাক্তারসাহেব আর কেটো না। ডাক্তার বললে—ওতে হবে না—বলে আবার কাটতে লাগল।

> সে গরীব লোক, যত কাঁদে, ডাক্তার ততই ছুরি দিয়ে কাটে—কাটতে কাটতে গোটা পা-খানাই কেটে ফেললে। উঃ, কি কাণ্ড ভাবুন তো হুজুর! (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২৪)

সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশের সব থেকে বড় 'আদিবাসী' বা 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। ১৮৫৫ সালের[৪] (১২৬২ বঙ্গাব্দ) 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা ও বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল থেকে। সেই ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দ্দী। এ অঞ্চলের আদিম ও পাহাড়ি জাতিরা এখনও তাকে রাজা মানে। সত্যচরণ রাজা দোবরুর সাথে গিয়ে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের সমাধিস্থল ও দুর্গ-প্রাসাদ পরিদর্শন করে ভারতবর্ষের অতীত-ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শনের সাথে পরিচিত হয়। তবে বর্তমানে রাজা দোবরু পান্নার রাজ্য বা প্রতাপ কোনোটাই নেই। অতিশয় দরিদ্র অবস্থায় গরু চরিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাঁকে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় বীর রাজা দোবরু পান্না গরু চরাচ্ছেন শুনে সত্যচরণ প্রথমে অবাক হয়েছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলে জানতে পারলেন, রাজা দোবরু ছিলেন সূর্যবংশের রাজা। এই পাহাড়-জঙ্গলে তাঁদের রাজত্ব ছিল। যৌবনে তিনি কোম্পানির সঙ্গে লড়েছেন। বর্তমানে সব হারিয়ে নিঃস্ব।

> বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে। দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে? আমাদের বংশ ছিল সূর্য্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তার পর আর কিছু নেই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১১৭)

বিভিন্ন রকেমের বৈচিত্র্যপূর্ণ নিজস্ব রীতি-নীতি আচার-বিশ্বাস লালন করে এ অঞ্চলের ব্রাত্য জনগোষ্ঠী, যেগুলো সাধারণত কোনো বাঙালি সমাজে দেখা যায় না।

> এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ীর মানুষ দেখিয়া কাঁদে নাই—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামীগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪১)

হাতি পোষা এ অঞ্চলে আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হয়। মহাজন নন্দলাল ওঝা তার বাড়িতে সত্যচরণকে নেওয়ার জন্য হাতি পাঠিয়েছিল। রাসবিহারী সিংয়ের গোয়ালে প্রায় ষাট-পয়ষট্টিটি গরু, আস্তাবলে সাত আটটি ঘোড়া আছে, কিন্তু কোনো হাতি নাই। তাই সে হাতি ক্রয় করতে চায়, কারণ– এ অঞ্চলে হাতি না-থাকলে সে সম্ভ্রান্ত লোক হিসেবে বিবেচিত হয় না। এছাড়াও বড়লোকদের বাড়িতে কোনো অতিথি এলে দুই বার বন্দুক দিয়ে গুলির আওয়াজ করে অভ্যর্থনা জানানো এ অঞ্চলের রীতি। সত্যচরণ মহাজন নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে গেলে উভয় স্থানেই তাকে বন্দুকের আওয়াজ দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয়।

ধর্ম-পরিচয়ে এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে এরা মহাবলী হনুমানকে বেছে নিয়েছে তাদের ধর্মাচরণে। রাম-সীতা, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা এখানে খুবই কম হয়। সত্যচরণের ভাষায় :

> ধর্ম্মের কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না—প্রত্যেক বস্তীতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা

> হয়। রাম-সীতার কথা ক্বচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশী আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার প্রচার তত নাই—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ আমাদের মহালে তো আমি দেখি নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭৭-১৭৮)

ধর্ম-পালনে দেবতাকে নিয়ে উঁচু-নিচুজাতের মধ্যে বিরোধও এখানে লক্ষ করা যায়। যেমন : নিচুজাতের মানুষ দ্রোণ মাহাতো শিবভক্ত হিসেবে একটি শিলাখণ্ড নিয়ে শিবের পূজা করলে তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না ব্রাহ্মণ মটুকনাথ পাঁড়ে। ব্রাহ্মণ মটুকনাথের বক্তব্য হচ্ছে, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পূজা পাওয়ার যোগ্যই হয়ে ওঠে না। উঁচু-নিচু, জাতি-বর্ণের বিভেদ লক্ষ করা যায় পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা দোষাদদের প্রতি ব্রাহ্মণ, ছত্রী ও গাঙ্গোতাদের মনোভাবে। যদি দোষাদ শ্রেণিভুক্ত মেয়েদের বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ঘরে তোলা হয়, তাহলে ঘরের সব খাবার ফেলে দিতে হবে, সেই খাবার ব্রাহ্মণ-ছত্রী-গাঙ্গোতা কেউ খাবে না। বাঈজির মেয়ে কুন্তাকে বিয়ে করার জন্যই দেবী সিং ও কুন্তাকে সমাজচ্যুত করা হয়, যা কৌলীন্য প্রথারই নিদর্শন। মঞ্চীকে কুণ্ডীর জলে স্নান করতে না-দেওয়ার মধ্যে জাতপাতের বৈষম্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চার

আরণ্যক উপন্যাস সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। আরণ্যপ্রকৃতির জীবন্ত বর্ণনা ও অরণ্যের কোলে লালিত ব্রাত্য জীবনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় এক অসামান্য সাহিত্যকর্ম *আরণ্যক*। আমাদের চেনা-পরিচিত জগৎ থেকে বহুদূরের অরণ্যে জীবন-যাপন করা এ মানুষগুলো আরণ্যপ্রকৃতির মতো সরল, উদার ও প্রাণোচ্ছল। সরল সিপাহি মুনেশ্বর সিং অবলীলায় তার স্বপ্ন 'একটি লোহার কড়া'র কথা জানায় সত্যচরণকে, যদিও তখনও সে জানে না নতুন ম্যানেজার সত্যচরণ কেমন স্বভাবের মানুষ। সরল বিশ্বাসী ও মানবদরদি মহাজন ধাওতাল সাহু ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবে কি পাবে না তার দিয়ে মনোযোগ না-দিয়ে বিপদে পড়ে ধার নিতে আসা মানুষের প্রয়োজনটাকেই সে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে টাকা ধার দেয়। মানুষের প্রয়োজনটাই তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে, কতোটা সুদ পাওয়া যাবে সেটা নয়। অনেক অভাবে দিনাতিপাত করে একবেলা খেয়ে অথবা না-খেয়েও টোলে পড়ানোর কাজ চালিয়ে যায় পণ্ডিত মটুকনাথ পাঁড়ে। যদিও অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা-গ্রহণের পরিবর্তে খাওয়া-থাকার লোভেই তার টোলে এসে ভর্তি হয়, তবুও সে শিক্ষাদানের বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে অপার আগ্রহ নিয়ে টোল পরিচালনা করে। গভীর অরণ্যে সারাদিন একা একা থাকা সত্ত্বেও দেড় বছরে মাত্র দুই বিঘা জমির জঙ্গল সাফ করার সময় হয়ে ওঠে না কবি-দার্শনিক-চিকিৎসক রাজু পাঁড়ের। মন তার প্রকৃতির মতো স্বচ্ছ। আপন মনে পূজার্চনা, গীতাপাঠ ও আকাশ-পাহাড়ের সৌন্দর্য অবলোকন করেই দিন কেটে যায় তার। এদের জীবনবিশ্বাসের তুলনা কেবল এদের সাথেই করা চলে। সরল মঞ্চীকে সূরয-কুণ্ডীর জলেস্নান করতে নামতে দেওয়া হয়নি বলে সে কেঁদে ফেলে। তার যুক্তি, এ তো পাহাড়ি ঝরনা, যে-সে এখানে নাইতে পারে। কোনও রকমের ভেদবুদ্ধির ধারণা ছিল না বলেই এমন সরল, অথচ লক্ষ্যভেদী যুক্তি উপস্থাপন করা সম্ভব হয় তার পক্ষে। দেবী সিংয়ের বিধবা স্ত্রী বাঈজির মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও শত কষ্ট, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করেও নিজের সম্ভ্রম বিসর্জন দেয় না। সাঁওতাল রাজকন্যা ভানুমতী সামান্য একটি আয়না পেয়েই মহা খুশি হয়। সাঁওতাল রাজকন্যা হয়েও কোনও শহর দেখা হয়নি তার। নগরজীবন সম্পর্কে ধারণা না-থাকার কারণেই নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া ভাবে হয়তো কলকাতা শহরে তার শেখা 'ছক্করবাজি' নাচের অনেক সমাদর মিলবে। এমন জীবনাচার তাদের যাপিত ব্রাত্য জীবনকেই নির্দেশ করে। যে জীবনের উৎসব-পার্বণ, খাদ্যাভ্যাস, অতি-প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি সভ্য সমাজের জীবনাচার থেকে একেবারেই আলাদা।

টীকা

১. গাঙ্গোতা জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে *The Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে লেখা হয়েছে, "Gangota, Gangauta, a cultivating, landholding, and labouring caste of Behar. Many of them live on the banks of the Ganges, and this is said to be the origin of the name." (Risley, 1891 : 268)

২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। *বিভূতি-রচনাবলী [পঞ্চম খণ্ড]*। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য [সম্পা.]। কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ। এ-সংস্করণ থেকে বর্তমান গবেষণায় *আরণ্যক* উপন্যাসের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. 'মেরজাই' হচ্ছে ফতুয়াজাতীয় হাতাকাটা একজাতীয় ছোট জামা বিশেষ।

৪. সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বা ১২৬২ বঙ্গাব্দে। *আরণ্যক* উপন্যাসে সম্ভবত অসাবধানতাবশত সাঁওতাল বিদ্রোহের তারিখ হিসেবে ১৮৫৫ সালের (১২৬২ বঙ্গাব্দের) পরিবর্তে ১৮৬২ সাল উল্লেখ করা হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অশ্বিনী কুমার দাস (২০০৯)। *স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন : তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা*। আলীগড় : আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। [পিএইচডি অভিসন্দর্ভ]

আলোক মণ্ডল (২০১৪)। *নানা রঙের বিভূতিভূষণ*। ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কলকাতা।

কিশলয় ঠাকুর (১৯৫৮)। *পথের কবি*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

গিয়াস শামীম (২০১৫)। *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (সম্পা., ২০১৪)। *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* (দ্বিতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৫৯)। *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

গৌতম কুমার দাস (২০০৯)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস : গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ জনপদের ভাষা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ (১৩৬৬)। *বিভূতিভূষণ*। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, কলিকাতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯৩)। *বিভূতি-রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য [সম্পা.]। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

(১৩৬৩)। *বিভূতি-রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য [সম্পা.]। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

বিমল চক্রবর্তী (২০১২)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার*। অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা., ২০১১)। *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রণজিৎ কুমার সমাদ্দার (১৩৬২)। *সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য*। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০০)। *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রুশতী সেন (১৯৯৫)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

সরদার আবদুস সাত্তার (২০১০)। *কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে*। সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৭)। *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সুব্রত বড়ুয়া (২০১৬)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*। গদ্যপদ্য, ঢাকা।

H. H. Risley (1891). *The Tribes and Castes of Bengal*. The Bengal Secretariat Press, Calcutta.

Climate Change in Bhola District, Bangladesh: A Study of Coastal Households' Perception of Effects and Causes

Pinke Rani Dey*

[Abstract : This study explores the climate change perception of the coastal rural people by investigating the people of Bhola district, one of the coastal districts of Bangladesh. The main objective of this paper is to analyze coastal households' perception about the effects and causes of climate change and to identify the determinants of their perception. For conducting the research, a total of 274 households were interviewed by a predesigned questionnaire through a systematic sampling technique. The result of chi-square test indicates that gender, education level, occupation, monthly income, access to the internet, and access to television are significantly related to their perception. For investigating the determinants of perception, the binary logistic regression is used. The results represent education level, monthly income, and access to television are significantly related to the perception of climate change. Therefore, this study suggests governmental and nongovernmental efforts and actions to promote the understanding of climate change issues among the rural coastal people of Bangladesh.]

Keywords : Perception, Climate Change, Coastal Households, Bangladesh.

1. Introduction

The long-term change in temperature and weather patterns, known as climate change, has become a severe challenge for the global social economy to attain sustainable development goals (SDGs) and is also the most tremendous threat for a low-lying country like Bangladesh (Huda, 2013). Because of its disaster-prone geographical status, high population density, social disparities, low elevation from the sea, inadequate infrastructure, and economic reliance on agriculture, the country holds the most vulnerable position in terms of climatic change (Younus and Harvey, 2014). Examining the period of 1999-2018, German watch's Global Climate Risk Index (CRI) 2020 reports that, Bangladesh ranked 7th position among the list of countries that are mostly affected by various natural calamities. This result emphasizes the fact that the richer countries face much higher monetary loss while the poorer countries are more vulnerable to climatic risks. Each year Bangladesh is confronted with various natural

* Lecturer, Department of Economics, Rabindra University, Bangladesh.

inversion, such as increased heat, irregularity in precipitation, frequent drought, haphazard cyclones, floods, rise in the sea level, soil erosion, salinity intrusion, etc. which hamper the development of the country by lagging behind both socially and economically (Nesha et al., 2014).

The Earth's surface is getting warmer day by day due to the increase in threat mospheric concentration of CO_2 driven by the growth of the global economy and global population (IPCC, 2014). By the extensive emission of greenhouse gases, the human contribution is clear for this global warming. According to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), this unresisted emission of greenhouse gases leads to a long-lasting impact on the ecosystems and causes serious harm to human beings by increasing the likelihood of severe climatic events. Increasing temperature causes polar ice to melt continuously, which in turn increases the sea level. According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 2020, Bangladesh possesses a land area of 147,570 square kilometers, among which 32% is the coastal area (47,211 square kilometers) with a very low-lying flat land. It was anticipated that the sea levels of Bangladesh would increase by up to 0.30 meters and up to 0.74 meters by the years 2050 and 2100 respectively. As a result, a large portion of productive land could be lost under the seawater in the southern region of Bangladesh. It will also affect the living of coastal people by reducing agricultural production, hampering food security, creating health hazards, and augmenting poverty (Haq and Ahmed, 2017). This increase in the sea level could force around 0.9 million people to lose their homes by 2050, and also the translocation of around 2.1 million people by 2100(Davis et al., 2018). As stated by the environmental specialists, one of the most tangible effects of climate change is the increasing salinity of land, which has become an antique problem for agriculture production in the southern region of Bangladesh (Rahman et al., 2017). In addition, increasing river erosion causes the area of agriculture production to decline day by day. Irregular precipitation and the increasing propensity of drought make life more difficult for the people of the coastal areas (Haq and Ahmed, 2017).

As a disaster-prone country, people in the southern region of Bangladesh suffer a lot from extreme climatic events. Because of the proximity to the coast of the Bay of Bengal, each year the living of the people in this area is confronted with disastrous impedance. However, human activities are the major influence on global climate warming. Hence, social awareness and responses can remarkably reduce the negative effects and loss from extreme climatic events (AGU,2014).Dealing with the climate change issues requires to observe the perception of society and analyze how this perception of climate change motivates them to respond individually. To face the climate change challenge, the government of Bangladesh has

already taken various actions and made adequate investments in adaptation measures. However, in the rural area of Bangladesh households are not properly informed about the terrible threat of climate change. Lack of knowledge and publicity makes them unaware of environmental protection (Kabir et al., 2016). Much of the governmental efforts to mitigate climate change effects can be faded away by this unconsciousness of rural people. Therefore, this study aims to explore the coastal households' perception about the effects and causes of climate change by investigating the determinants of those perceptions. The findings of this study can assist the policymakers to develop policies regarding improving household perception and thereby mitigating environmental catastrophe. Hence, the objectives of this study are-

1. To observe the coastal rural households' perception about the causes and effects of climate change.
2. To examine the association between socio-demographic factors of rural households and their climate change perception.
3. To find out the determinants of their climate change perception.

The rest of this study is structured as follows: relevant articles are reviewed in section 2; description of the survey area, data collection, and methodological procedures are presented in section 3; discussion of the survey results are displayed in section 4, and finally conclusion and recommendations in section 5.

2. Literature Review

Because of the severity of its impacts, climate change has become a widespread concern of the international community. Researchers all around the world are expressing their intent in several prospects of climate change issues. The objective of this study is to peruse the rural households' perception of climate change and their individual responses to mitigate its ominous effects. Therefore, in this section studies on climate change perceptions are reviewed as some influential papers.

The vulnerability of one country cannot be generalized from the findings of other national contexts. Several studies related to climate change perception were carried out in the context of Bangladesh. Almost all of these studies indicated an increase in temperature and decrease in annual rainfall as the primary effects of climate change. However, the effect of climate change is different across countries and regions. Several factors such as regional differences in socio-economic conditions, or climatic impact on a particular country are responsible for significant dissimilarities in the perception and adaptive responses across countries (Alam, 2016; Brulle et al., 2012).The relationship between climate change perception and socio-demographic characteristics of potential respondents was explored

by some researchers. To examine the factors determining farmers' perception of climate change, Uddin et al. (2017) researched on the coastal farmers of Bangladesh. Using a logit model they mentioned several factors, such as educational background, family information, farming information, and information on training received as significant determinants of farmers' perception of climate change. Roco et al. (2014) also showed education, age, and access to weather information as some influential factors to form the perception of climate change. Hence, there is substantial evidence that the perception of climate change is significantly related to some socio-demographic variables such as age, gender, education level, and monthly income of the households. A contradictory result was found by some other researchers that the variable age has no significant effect in determining the perception of climate change among the survey respondents (Akanda and Howlader, 2015). A study by Shields and Zeng (2012) found that the knowledge on climate change differs in response to gender differences in China. Conducting research on the indigenous community of Bangladesh Huda (2013) also reported that males are more likely to accept that the climate is changing than females. Contrarily, few studies claimed that the environmental concern is higher among females than males (McCright, 2010; Haq, 2013; and Kabir et al., 2016). Besides, it was also asserted by the findings of scholarly articles that training and seminars can play an important role in enhancing public concern about climatic issues.

In order to reduce the risks associated with climate variability, the adjustments in human behavior or environment system are referred to as adaptation strategies (Wheeler et al., 2013).Households' responses to climate change depend on their perceptions, derived from their daily interactions with the environment and reliance on weather conditions to assure nourishment. Inappropriate perception may lead to misleading actions. Various studies have been conducted previously regarding climate change perception. Researchers examined the significant link between climate change perception and corresponding adaptive activities in response to several countries; such as, in the USA (Mase et al., 2017; Gordon et al., 2013), Australia (Wheeler et al., 2013), China (Yu et al., 2013), Chile (Roco et al., 2014), Thailand (Manandhar et al., 2015), Vietnam (Dang et al., 2014; Schad et al., 2012), India (Dey et al., 2017), Malaysia (Alam et al., 2012), Sri Lanka (Esham and Garforth, 2013), South Africa (Elum et al., 2017; Gandure et al., 2013), Tanzania (Kangalawe et al., 2016), Zambia (Mulenga et al., 2017),and so on.

From the articles reviewed above, we can conclude that the perception of climate change is highly related to the socio-demographic characteristics of the respondents. Therefore, researchers mostly studied the relationship between the perception of climate change and the background information

of the potential respondents. However, studies on climate change perception of coastal rural households are very rare in Bangladesh. Households with appropriate perceptions are willing to take actions to mitigate the harmful effects of extreme climatic events, while some are unwilling by thinking of climate change as a natural consequence. Therefore, taking rural households of Bangladesh as the research object, the purpose of this study is to observe their perception of the causes and effects of climate change and examine the determinants of such perception.

3. Methodology

3.1 Overview of the Study Area

Bangladesh encompasses 19 coastal districts that are more prone to extreme climatic events. As required for the objective of this study, primary data were collected from Sadar Upazila (sub-district) of Bhola district, one of the coastal districts of Bangladesh. The district of a 1,776,795 population comprises seven Upazilas with an area of 3,403.5 square kilometers. Bhola Sadar Upazila has 13 unions (local level government administrative unit) from which two unions namely- Bapta and Ilisha were randomly selected to carry out this study(Bangladesh Bureau of Statistics, 2020).

3.2 Sample Size, Data collection and Analysis

Cochran (1977) formula is used to determine the sample size. That is,

$$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$

Where, n= sample size, Z= Z score, (p)(q) = estimate of variance, e= margin of error. With 90% confidence, assuming p=0.5 and $\pm$5% precision the minimum valid sample size is 271.

Systematic sampling technique was followed to select the respondents from different characteristics. A predesigned questionnaire was used to survey on the selected households in June 2021. A total of 274 households were selected from two villages of Bapta union and one village from Ilisha union of Bhola Sadar Upazila. The first household from each village is selected randomly, then every fifth household is selected for face-to-face interview. The respondents of the direct interview were the head of the households or senior members in absence. A short introduction to climate change was given to each respondent. Oral consent was obtained from the selected respondents before starting the interview. The data collection process was always monitored by the author to ensure the quality and accuracy of data. In the first section, the respondents were asked about their socio-demographic information, and then in the next sections, they were asked questions regarding their perception of climate change. Collected data were analyzed and summarized to conclude about their perception of climate

change and its determinants. STATA software version 14 was used for the analysis of data.

3.3 Test and Empirical Model

This qualitative study uses some descriptive statistics to examine the coastal households' perception of the causes and effects of climate change. Chi-square test is used to clarify the association between socio-demographic characteristics of the respondents and their perception. Besides, a binary logistic regression model is used to examine the significant determinants of households' perception of climate change.

4. Results and Discussion

4.1 Households' Perception of Climate Change

The survey was conducted among a total of 274 respondents living in the coastal and rural areas of Bangladesh. The respondents of the survey were the head or the senior member of the households. Most of them were males (82.48%) and only a small number of females (17.52%). The respondents were on average 43.06 years old with a standard deviation (SD) of 12.69 years. This is similar to the finding of other researchers who conducted surveys on the sample of people from other locations of Bangladesh. The educational information of the respondentsshows that the majority of them were from high educational backgroundswith about 25.18% completing their SSC/HSC level, 24.09% in the secondary level, and about 21.53% having higher degrees. As seen in the occupational structure, 29.56% of respondents were in government or private service, next to service was farming (25.18%) and business (21.9%). More than half of the respondents' (56.93%) monthly household income was less than 20000 BDT with an average income of 18764.08 BDT per month, implying that the respondents largely came from a moderate socioeconomic background (1 USD = 85 BDT approximately) (Table 1).

In order to perceive the knowledge on climate change, the respondents were asked a dichotomous ('yes/no' response) question regarding whether or not they heard about climate change. They were interrogated for further details about their knowledge of climate change after getting a positive response initially. Table 2 shows that the majority of the respondents (81.39%) heard about climate change from some sources and only a few (18.61%) had no idea about it. Among various sources, media has played the most important role in unveiling climate change issues. Almost 80% of the knowledgeable respondents mentioned radio, TV, or newspaper as the source of their knowledge about climate change. Kabir et al. (2016) also obtained similar results. Based on the literature reviewed, the respondents (n=223) were then queried about the type of climate change events that they had experienced within the past 10 years. Almost all the respondents

(99.55%)replied positively that they have perceived a series of climaticvariations in the form of change in temperature, precipitation, occurrence of drought, floods, and so on.This result isconsistent withthe findings of Uddin et al. (2017).

Table 1 Demographic characteristics of the respondents (n=274)

Variable	Frequency (%)
Gender	
Male	226 (82.48)
Female	48 (17.52)
Age (Mean ± SD) in years	43.06 ± 12.69
Educational information	
No formal education	33 (12.04)
Primary level	47 (17.15)
Secondary level	66 (24.09)
SSC/HSC	69 (25.18)
Degree/Masters/Equivalent	59 (21.53)
Occupational information	
Housewife	38 (13.87)
Business	60 (21.9)
Day laborer	18 (6.57)
Service holder	81 (29.56)
Farmer	69 (25.18)
Others	8 (2.92)
Monthly household income (BDT)	
(In Bangladeshi Taka, 1 USD=85 BDT approx..)	
Below 10,000	27 (9.85)
10,000 to 20,000	129 (47.08)
20,000 to 30,000	77 (28.1)
Above 30,000	41 (14.96)

Source: Author's field survey in 2021.

As stated by their study, majority of the respondents agreed that they had experienced various climate change events over past years. Again, the study of Anik and Khan (2012) postulated a different scenario of the perception of climate change among rural people.Since their study was conducted especially on fishermen and farmers, most of the respondents were uneducated, or had a lower level of education, and therefore, only 10% of them were well informed about climate change (Huda, 2013).However, Table 1 shows that the respondents in this research were largely service holders with a high level of education, hence the difference between the results of these two studies.The Majority of them (95.5%)indicated increasing heat as a consequence of climate change.

Table 2 Respondents' perception of climate change

Variable	Frequency (%)
Have you heard about 'climate change'?	
No	51 (18.61)
Yes	223 (81.39)
What is the main source of your information on climate change? (Multiple response)	
DAE	26 (11.71)
NGO	11 (4.95)
Union Parishad	8 (3.6)
Other governmental institutions	10 (4.5)
Radio / TV / Newspaper	177 (79.73)
Internet/Facebook	40 (18.02)
In public	81 (36.49)
Educational institutions	33 (14.86)
Others	3 (1.35)
Have you experienced any change in weather pattern in last 10 years?	
No	1 (0.45)
Yes	222 (99.55)
Type of change in weather pattern (Multiple response)	

Increased heat	212 (95.5)
Increased precipitation	10 (4.5)
Decreased precipitation	141 (63.51)
Irregular precipitation	77 (34.68)
Increased thunder	78 (35.14)
Increased incidence of floods	16 (7.21)
Increased cyclone	20 (9.01)
Increased river erosion	24 (10.81)
Increased tendency of drought	69 (31.08)
Increased salinity	6 (2.7)
Irregular seasonal variation	45 (20.27)
Increased cold in winter	1 (0.45)
Less cold in winter	60 (27.03)
Increased fog falling in winter	3 (1.35)
Decreased fog falling in winter	8 (3.6)
Others	5 (2.25)
Main reason behind climate change	
Natural	103 (46.19)
Man-made	98 (43.95)
Both	22 (9.87)

Source: Author's field survey in 2021.

Besides, more than half ofthe respondents (63.51%)mentioned a decrease in the amount of precipitation and 35.14% thought that the occurrence of thunder has increased than before. The respondents also mentioned irregular precipitation (34.68%), increased tendency of drought (31.08%), less cold in winter (27.03%), irregular seasonal variation (20.27%), and many other changes in the weather pattern as some consequences of climate change. When they were asked (n=223) to mention the main reason behind climate change, 46.19% of the respondents believed that climate change is a natural phenomenon, and they have nothing to control it. However, 43.95% of the respondents conceived climate change as a consequence of the blindfold activities of mankind. Some respondents (9.87%) felt that the

change in climatic conditions is not only a natural circumstance but also an aftereffect of the reckless behavior of human beings. Deforestation, excessive carbon emission, mismanagement of industrial wastage,etc. were some causes mentioned by them (Table 2).

4.2 Association between Socio-demographic Factors and Perception of Climate Change

The data presented in Table 3 shows the association between various socio-demographic characteristics and climate change perception of the survey respondents. Where cross tabulation was used to examine the association between such variables. According to the survey results, respondents' age was not a significant factor in determining the perception of climate change. Because of the strong educational and financial background of the respondents in the survey area, people may acquire more knowledge on climate change issues irrespective of their age. The study of Akanda and Howlader (2015) also did not find a strong correlation between ages and the perception of climate change. On the contrary, conducting research on other parts of Bangladesh, some researchers found a significant association between these two variables. Huda (2013) claimed that the young aged people have more knowledge on climate change than the old aged people. On the other hand, the study of Kabir et al. (2016) reported that environmental concern is higher among the older group of people than the younger group. However, other socio-demographic variables such as, gender, education, occupation, and household monthly income were found to be significantly associated with the perception of climate change which is similar to the findings of other related studies. That is, males have higher knowledge (84.07%) on climate change than females (68.75%). Respondents with a higher level of education and more incomehavea better understanding of climate change issues than others.Knowledge on environmental issues is also related to the available access to television and the internet of the respondents in the survey area. In this study, the significant association between access to television, the internet, and the perception of climate change indicated that the people with higher access to television and the internet were more likely to believe that the climate is changing.

Table 3 Association between respondent's socio-demographic variables and perception of climate change

Variable	Climate change perception	Statistics

	No (%)	Yes (%)	Total (%)	
Age category				
Below 30 years	10 (18.87)	43 (81.13)	53 (100)	χ^2= 0.12
Age 30-45 years	20 (17.7)	93 (82.3)	113 (100)	df = 3
Age 46-60 years	15 (19.23)	63 (80.77)	78 (100)	p = 0.99
Above 60 years	6 (20)	24 (80)	30 (100)	
Total	51 (18.61)	223 (81.39)	274 (100)	
Gender				
Female	15 (31.25)	33 (68.75)	48 (100)	χ^2= 6.13
Male	36 (15.93)	190 (84.07)	226 (100)	df = 1
Total	51 (18.61)	223 (81.39)	274 (100)	p = 0.01
Education				
No formal education	8 (24.24)	25 (75.76)	33 (100)	χ^2 = 11.7
Primary level	13 (27.66)	34 (72.34)	47 (100)	df = 4
Secondary level	17 (25.76)	49 (74.24)	66 (100)	p = 0.02
SSC/HSC	8 (11.59)	61 (88.41)	69 (100)	
Degree/Masters/ Equivalent	5 (8.47)	54 (91.53)	59 (100)	
Total	51 (18.61)	223 (81.39)	274 (100)	
Occupation				
Home maker	13 (34.21)	25 (65.79)	38 (100)	χ^2= 24
Business	6 (10)	54 (90)	60 (100)	df = 5
Day laborer	9 (50)	9 (50)	18 (100)	p = 0.001
Service holder	11 (13.58)	70 (86.42)	81 (100)	
Farmer	12 (17.39)	57 (82.61)	69 (100)	
Others	0 (0)	8 (100)	8 (100)	
Total	51 (18.61)	223 (81.39)	274 (100)	
Household monthly income				

Below 10,000	9 (33.33)	18 (66.67)	27 (100)	χ^2= 12.41
10,000 to 20,000	30 (23.26)	99 (76.74)	129 (100)	df = 3
20,000 to 30,000	10 (12.99)	67 (87.01)	77 (100)	p = 0.01
Above 30,000	2 (4.88)	39 (95.12)	41 (100)	
Total	51 (18.61)	223 (81.39)	274 (100)	
Access to television				
No	26 (26)	74 (74)	100 (100)	χ^2= 5.67
Yes	25 (14.37)	149 (85.63)	174 (100)	df = 1
Total	51 (18.61)	223 (81.39)	274 (100)	p = 0.02
Access to internet				
No	39 (21.67)	141 (78.33)	180 (100)	χ^2= 3.23
Yes	12 (12.77)	82 (87.23)	94 (100)	df = 1
Total	51 (18.61)	223 (81.39)	274 (100)	p = 0.07

Source: Author's field survey in 2021.

4.3 Determinants of Households' Perception of Climate Change

In the multivariate analysis, a binary logistic regression model was constructed to predict the perception of climate change since the dependent variable of the model is whether the respondents heard about climate change or not. Among various independent variables, only the level of education, monthly income, and access to television had a significant effect on households' perception of climate change. Table 5 shows the results of the logistic regression model which postulated that, at the 5% level of significance, respondents' education level had a positive and significant effect on their perception of climate change. That is, respondents' who have completed SSC or a higher educational level were more likely to accept the changes in climatic condition than the respondents with secondary or lower levels of education. The significance of education in influencing the perception of climate change was also claimed in the studies of other researchers (Uddin et al., 2017; Kabir et al., 2016; Akanda and Howlader, 2015; Huda, 2013).

Again, monthly household income was also found to be positively and significantly (at 5% level) related to the perception of climate change. Households with monthly income above 20000 had greater knowledge on climate change compared to the households with monthly income below 20000. Because of higher educational attainment and more access to

information, richer groups of the society tended to become more aware of climatic issues than the lower-income group.

Regarding access to information of the respondents, access to television was another important independent variable in predicting the perception of climate change. The results displayed in Table 5 show, at the 1% level of significance, a positive and significant relationship between access to television and the perception of climate change. This implies that the respondents who had access to television, understand that the climate is changing more frequently than the respondents who did not have access to television (Table 4).

Table 4 Determinants of perception of climate change from logistic regression analysis

Variables	Perception of climate change
Age (0=age 36 and above, 1= age less than 36)	0.376 (0.408)
Gender	0.960 (0.930)
Level of education (0= Secondary and below, 1=SSC and above)	1.126** (0.452)
Occupation (Base category: Home maker)	
Business	1.349 (1.084)
Day laborer	0.215 (1.008)
Service holder	0.231 (0.986)
Farmer	1.444 (1.056)
Monthly income (Base category: below 10000)	
10000 to 20000	0.634 (0.510)
20001 to 30000	1.269** (0.585)
Above 30000	2.262** (0.890)
Access to internet (0=No, 1=Yes)	-0.273 (0.480)
Access to television (0=No, 1=Yes)	1.286*** (0.444)
Constant	-2.048*** (0.784)

Source: Author's field survey in 2021.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Standard errors in parentheses.

5. Conclusion and recommendations

A low-lying country like Bangladesh is in a vulnerable position concerning climate change issues (Uddin et al., 2017). People all around the country are not yet aware of this emerging phenomenon. Selecting the people fromthe Bhola district as a research object, this paper attempts to explore the perception of climate change among the people of the rural and coastal areas of Bangladesh.According to the findings of this study, majority of the survey respondents (81.39%) have heard about climate change from different sources, mainly from radio/TV/ newspaper (80%). Increase in temperature, decrease in annual precipitation, and increase in the occurrence of thunderare the top three changes in the weather patternsas mentioned by the knowledgeable respondents that they have noticed within last 10 years.Nevertheless, when querying about the cause of climate change, only 43.95% of them reported this climate variability as a consequence of human deeds and the rest believed this as a natural phenomenon or both.Although the results of thechi-square test reveal significant association between various socio-demographic variables and the perception of climate change, the logit model demonstrates that, level of education, monthly income, and access to television are the significant determinants of households' climate change perception.In conclusion, rural and coastal households have average knowledge about the effects and causes of climate change.

Thus, government as well as other non-governmental organizations should come forward and take proper initiatives to encourage higher education among the people of the rural and coastal areas of Bangladesh.Various promotional activities, such as training programs and seminars should be initiated on regular basis. Expanding publicity on the impacts of climate change and the respective adaptive strategies via television can help to increase environmental awareness.The government should adopt proper fiscal policies like, increasing expenditure on adaptive activities and imposing more taxes on the activities that cause environmental degradation. Since climate change is a huge concept, and this study used only the people from Bhola district, regular research and field studies on other aspects of climate change selecting other areas of Bangladesh are essential to enhance the public perception and awareness of climate change. There is also scope for further studies based on promoting adaptive strategies for addressing climate change issues.

Acknowledgements

The author would like to thank all the people from the study area of the Bhola district for their cooperation. The author is especially grateful to Mr. Milon Chandra Dey, Assistant Agriculture Extension Officer, Rangabali, Patuakhali for his cordial assistance in field work.

References

Akanda, M.G.R., & Howlader, M.S. (2015). Coastal farmers' perception of climate change effects on agriculture at Galachipa Upazila under Patuakhali District of Bangladesh. *Global Journals of Science Frontier Research: Agriculture and Veterinary*, *15*(4), 30-39.

Alam, G.M. (2016). *An assessment of the livelihood vulnerability of the riverbank erosion hazard and its impact on food security for rural households in Bangladesh* (Doctoral dissertation, University of Southern Queensland).

Alam, M.M.,Siwar, C.,Molla, R.I., Talib,B., &bin Toriman,M.E. (2012). Paddy farmers' adaptation practices to climatic vulnerabilities in Malaysia. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, *17*(4), pp.415-423.

American Geophysical Union (2014). Human-Induced Climate Change Requires Urgent Action. www.agu.org.

Anik,S.I., &Khan,M.A.S.A. (2012). Climate change adaptation through local knowledge in the north eastern region of Bangladesh. *Mitigation and adaptation strategies for global change*, *17*(8), pp.879-896.

Arbuckle, J.G., Prokopy, L.S., Haigh, T., Hobbs, J., Knoot, T., Knutson, C., & Widhalm, M. (2013). Climate change beliefs, concerns, and attitudes toward adaptation and mitigation among farmers in the Midwestern United States. *Climatic change*, *117*, 943-950.

Atiqul Haq,S.M. (2013). Nexus between perception, environment and fertility: A study on indigenous people in Bangladesh. *Sustainable Development*, *21*(6), pp.372-384.

Bangladesh Bureau of Statistics (2020). *Statistical Yearbook*, Dhaka, Bangladesh: Bangladesh Bureau of Statistics.

Brulle, R.J., Carmichael, J., & Jenkins, J.C. (2012). Shifting public opinion on climate change: an empirical assessment of factors influencing concern over climate change in the US, 2002–2010. *Climatic change*, *114*(2), pp.169-188.

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. John Wiley & Sons.

Davis, K.F., Bhattachan, A., D'Odorico, P., & Suweis, S. (2018). A universal model for predicting human migration under climate change: examining future sea level rise in Bangladesh. *Environmental Research Letters*, *13*(6), 064030.

Dey, T., Pala, N.A., Shukla,G., Pal, P.K., Das,G., & Chakarvarty,S. (2017). Climate change perceptions and response strategies of forest fringe communities in Indian Eastern Himalaya. *Environment, Development and Sustainability*, *20*(2), pp.925-938.

Eckstein, D., Künzel, V., Schäfer, L., & Winges, M. (2019). Global climate risk index 2020. *Bonn: Germanwatch*.

Elum, Z.A., Modise, D.M., & Marr, A. (2017). Farmer's perception of climate change

and responsive strategies in three selected provinces of South Africa. *Climate Risk Management*, *16*, 246-257.

Esham, M.,& Garforth, C. (2013). Agricultural adaptation to climate change: insights from a farming community in Sri Lanka. *Mitigation and adaptation strategies for global change*, *18*(5), pp.535-549.

Gandure, S., Walker, S., & Botha, J.J. (2013). Farmers' perceptions of adaptation to climate change and water stress in a South African rural community. *Environmental Development*, *5*, pp.39-53.

Haq, S.M.A., & Ahmed, K.J. (2017). Does the perception of climate change vary with the socio-demographic dimensions? A study on vulnerable populations in Bangladesh. *Natural Hazards*, *85*, 1759-1785.

Huda, M.N. (2013). Understanding indigenous people's perception on climate change and climatic hazards: a case study of Chakma indigenous communities in Rangamati Sadar Upazila of Rangamati District, Bangladesh. *Natural Hazards*, *65*(3), pp.2147-2159.

IPCC (2014). IPCC Fifth Assessment Synthesis Report. *IPCC: Geneva, Switzerland*.

Kabir, M.I., Rahman, M.B., Smith, W., Lusha, M.A.F., Azim, S., & Milton, A.H. (2016). Knowledge and perception about climate change and human health: findings from a baseline survey among vulnerable communities in Bangladesh. *BMC public health*, *16*(1), pp.1-10.

Kangalawe, R.Y., Mung'ong'o, C.G., Mwakaje, A.G., Kalumanga, E., & Yanda, P.Z. (2017). Climate change and variability impacts on agricultural production and livelihood systems in Western Tanzania. *Climate and Development*, *9*(3), pp.202-216.

Le Dang, H., Li, E., Bruwer, J., & Nuberg, I. (2014). Farmers' perceptions of climate variability and barriers to adaptation: lessons learned from an exploratory study in Vietnam. *Mitigation and adaptation strategies for global change*, *19*, 531-548.

Manandhar, S., Pratoomchai, W., Ono, K., Kazama, S., & Komori, D. (2015). Local people's perceptions of climate change and related hazards in mountainous areas of northern Thailand. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *11*, 47-59.

Mase, A.S., Gramig, B.M., & Prokopy, L.S. (2017). Climate change beliefs, risk perceptions, and adaptation behavior among Midwestern US crop farmers. *Climate Risk Management*, *15*, 8-17.

McCright, A.M. (2010). The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American public. *Population and Environment*, *32*, 66-87.

Mulenga, B.P., Wineman, A., & Sitko, N.J. (2017). Climate trends and farmers' perceptions of climate change in Zambia. *Environmental management*, *59*, 291-306.

Nesha, K., Rahman, A.A., Hasan, K., & Ahmed, Z. (2014). People's perception in relation to climate change and its adverse effects in Rural Bangladesh. *Journal of Environment and Human*, *1*(3), 23-33.

Rahman, M.T.U., Rasheduzzaman, M., Habib, M.A., Ahmed, A., Tareq, S.M., &

Muniruzzaman, S.M. (2017). Assessment of fresh water security in coastal Bangladesh: An insight from salinity, community perception and adaptation. *Ocean & Coastal Management*, *137*, 68-81.

Roco, L., Engler, A., Bravo-Ureta, B.E., & Jara-Rojas, R. (2014). Farmers' perception of climate change in mediterranean Chile. *Regional Environmental Change*, *15*(5), pp.867-879.

Schad, I., Schmitter, P., Saint-Macary, C., Neef, A., Lamers, M., Nguyen, L., & Hoffmann, V. (2012). Why do people not learn from flood disasters? Evidence from Vietnam's northwestern mountains. *Natural hazards*, *62*, 221-241.

Shields, T., & Zeng, K. (2012). The reverse environmental gender gap in China: Evidence from "The China Survey". *Social science quarterly*, *93*(1), pp.1-20.

Stocker, T.M., & Qin, D. (2013). Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Uddin, M.N., Bokelmann, W., & Dunn, E.S. (2017). Determinants of farmers' perception of climate change: a case study from the coastal region of Bangladesh. *American Journal of Climate Change*, *6*(1), pp.151-165.

Wheeler, T., & Von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. *Science*, *341*(6145), pp.508-513.

Younus, M.A.F., & Harvey, N. (2014). Economic consequences of failed autonomous adaptation to extreme floods: A case study from Bangladesh. *Local Economy*, *29*(1-2), 22-37.

Yu, H., Wang, B., Zhang, Y. J., Wang, S., & Wei, Y. M. (2013). Public perception of climate change in China: results from the questionnaire survey. *Natural hazards*, *69*, 459-472.

Strengthening Community Participation in the Management of Upazila and Union Parishad: A Study on Kushtia Sadar Upazila in Bangladesh

Malina Khatun*

[Abstract : The study strives to determine the current community participation level, its stimulating factors, key challenges, and mechanisms for strengthening the community participation in the management at UZP and UP. It usages an explanatory sequential mixed method research design. The survey dataset shows that the overall participation level is low. The inefficient leadership role, lack of capacity, improper political learning, poor administrative coordination, and ineffective communication make this situation miserable despite the strong presence of a sound legal framework. Unwillingness and lack of awareness of the community citizen are the main challenges of poor participation level. This study recommends arranging participatory training, mess media effectiveness, the enrichment of political education, the implementation of community scorecards, and the development of grievance redress mechanisms to diminish the effects.]

Keywords : Local Governance, Community Participation, Challenges

Introduction

The core commitment of the government is to serve the people of all levels (Shah, 1999; Faguet, 2004). There are two tiers in the local governance such as the rural area i.e., Upazila Parishad (UZP) and Union Parishad (UP) and urban areas i.e., Municipalities and City Corporations (Islam, & Fujita, 2012; Sharmin, Haque, & Islam, 2012; Islam, 2015). Among them, UP is the root, while the local government institutions i.e., the UZP, UP, local community, and civil society institutions (NGOs) are the indispensable part of the governance. They play an active role in safeguarding good governance (Panday, 2018; Rahman, & Ahmed, 2014). To ensure good governance, active community participation in the management of UZP and UP is a must as it boosts accountability, transparency and predictability (Waheduzzaman, & As-Saber, 2015; Njunwa, 2010; Fritzen, 2006; Hussain, 2017).

* Lecturer, Dept. of Management, Rabindra University, Bangladesh.

Society can consummate the blessings of good governance through active citizen participation in the management of UZP and UP (Ura, & Kinga, 2004; Nanda, 2006; Cunningham, 1972; Naushin Parnini, 2006). In Bangladesh, the community people are unconscious of the rules, responsibilities and functions of the UZP and UP. They professed to the wrong conception that it's only the responsibility of the elected persons to ensure socio-economic development. Elected persons are also apathetic to build up the citizen's participation. Moreover, civil society in rural areas and NGOs play an active role in socio-economic development in this local area. But, the UZP and UP play the supervisory role and work collaboratively to implement the project successfully. Evidence shows that NGOs are unwilling to be supervised. So, many key performers cannot achieve their mutual benefits by collaboration due to poor citizen engagement at the local level. (Lawton, & Macaulay, 2014; Panday, 2017; Hussain, 2017)

The legal framework in The People's Republic of Bangladesh urges active community participation in the governance of all levels (Rashid, 2012; Halachmi, Greiling, & Huque, 2011). The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (1972) stresses the essentials of the active peoples' participation in the establishment and administration of the local bodies. It intends not only for the consultation but also for the direct community participation in implementing different developmental initiatives. The Union Parishad Act in 2009 confirms citizen participation through village meetings to make the government officials accountable for expenditure. UP Act mandated to arrange Ward Sabha (Ahmed, 2016; Kabeer, Mahmud, & Issaza Castro, 2010). The law prescribed that the number of Sabha should be limited. Less than 10% of citizens participate and the topic is bound only to the infrastructure-related development plan. The people are unaware of most of the issues while taking part in grievance handling (Shah and Shah, 2009). Contemporarily, society experiences the ineffective and inefficient performance of UZP and UP, corruption and misuse of power, failure to ensure need-based community services, barrier for mobilization and utilization of local resources, striking inequalities in the distribution of developmental benefits and ineffective implementation of different projects (Brett, 2003; Sarker, Bingxin, Sultana, & Prodhan, 2017; Paul, 1987).

Although the developmental initiatives produced centrally, it has impacts on individuals and families at the local level. There is no rule of thumb to involve the citizen at the planning stage. They have developmental needs that should be addressed during planning (Ahmed, 2019). The Constitution of Bangladesh in 1972 and the Union Parishad Act in 2009 called for active participation in the management of UP. The community participation at different stages of the project life cycle is gradually

increasing but has not reached the desired level yet (Waheduzzaman and As-Saber, 2015; Kabeer, Mahmud, & Isaza Castro, 2010; Shah and Shah, 2009). Based on these, the research area has been selected on 'Strengthening the Level of Community Participation in the Management of Upazila and Union Parishad : A Study of Kushtia Sadar Upazila in Bangladesh.

This paper is significant to many. The government can be benefited to formulate, implement and modify existing policy in rural areas for the corroboration of community-based service. As the government must ensure two-way communication which is possible through active participation. This paper also will be the source of the researchers to conduct further study. This paper aims to address the issues of strengthening community participation in the management of UZP and UP. The specific objectives are to assess the current community participation level, factor affecting the community participation level, examine the key challenges and recommend propositions for strengthening the community participation in the management of UZP and UP. Identifying the current community participation level, stimulating factors, and challenges are the prerequisite to recommend mechanisms for strengthening the community participation in the management of UZP and UP. The following research questions are formulated :

1. What is the current level of community participation level in the management of UZP and UP?
2. Which factors stimulate the current level of community participation level in the management of UZP and UP?
3. What are the key challenges facing for implementing the current policy and practices for strengthening the community participation in the management of UZP and UP?
4. What will be recommended solutions for strengthening the community participation in the management of UZP and UP?

This paper is organized as follows; in first section, conceptual framework has been developed by doing literature review. Then in second section, current level of community participation and factors affecting the community participation has been examined. And lastly key challenges and the recommended solutions have been figured out for strengthening the community participation in the management of UZP and UP.

Operational Definition

Community Participation

Community is a small homogeneous social unit who shares common views and norms. Community can also be well-defined grounded on the place where they live, is called place centered (Agrawal and Gibson,

1999). Community participation means giving power to make decision or engage of peoples for making and implementing decision that impacts their personal lives (Kelly, 2001). Paul Selman in 2004 in his paper defined the community participation in local governance as an engagement of the stakeholders for planning, organizing and monitoring the progress of government policy at local level (Selman, 2004). As per the opinion of sander, community participation is to teach and develop the competency level to influence the decision area which affects their life (Sanders, 1958). In this paper community participation means the engagement of community citizen (Specially the marginal group i.e., women, ethnic minority) in policy formulation, budgetary control, develop community driven program, project management and monitoring the performance of service agency.

Local Governance

Local governance is the synonym of local states (Ahmed, 2019; Harrison, 2008). It is a social entity where community citizens share their opinion openly (Huq, 2016; Stoker, 1998). Formulation and the implementation of government policy of a concerned locality is referred as local governance. The main purpose of local governance is to serve community in a way so that there are maintaining freedom of people, pave the way of participative government, ensure sustainable development through development of people, and draw the results which enhance the standard of livings (Shah and Shah, 2009). This paper concentrates on the local governance in Bangladesh where the bottom level of local governance is Union Parishad.

Literature Review

The center of economic development is the participation, sustainability and empowerment (Laah, Adefila, & Yusuf, 2013). Many studies have been conducted on 'The Level of Community Participation in Management in Local Governance'.

Theoretical Framework

Arnstein in 1969 on her study on 'A ladder of citizen participation' developed a model of eight ranges (1-8) ladder of citizen participation contents such as manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power and citizen control. The scholars has categorized the ranges into three broad categories such as non-participation i.e., manipulation and therapy, tokenism i.e., informing, consultation and placation and three degrees of citizen power i.e., partnership, delegated power and citizen control. The study result shows that a typology of eight participation level helps to determine to see the difference between

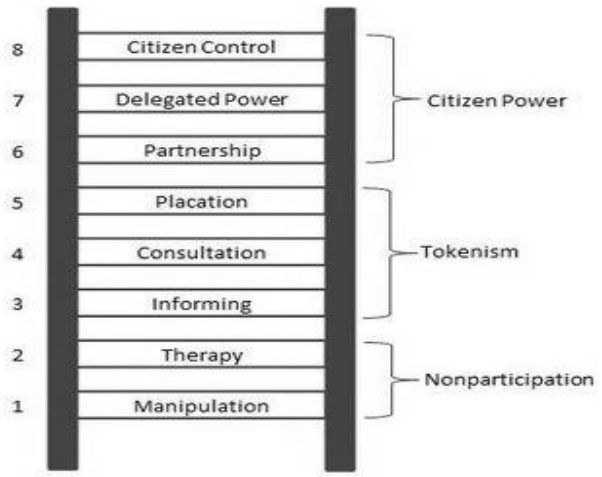


Figure 1: Ladder of citizen participation

Source: Arnstein, 1969

participation levels and also helps to categorize participation and nonparticipation. (Arnstein, 1969)

Role of Community Participation

Community participation is the precondition of attaining Sustainable Development Goals (Lucky, 2016). Active participation is essential due to increase democratic and accountable service delivery, enhances effectiveness through developing people's knowledge and skills, and formulating policy relevant to the community needs (Shah and Shah, 2009). According to Waheduzzaman and As-Saber (2015), pro-people development can ensure through active citizen participation at local level as community participation has great impacts of accountability, responsiveness, transparency and reliability (Waheduzzaman and As-Saber, 2015). Community participation is also the stimulating factors of social accountability (Kasar, 2019). It is helpful to improve local responsiveness, accessibility, equity building, inclusivity and enhance service performance (Babajanian, 2015). Laah, Adefila, & Yusuf has identified the issue of infective project implementation due to poor level of community participation (Laah, Adefila, & Yusuf, 2013).

Factors Affecting Community Participation

Kasar, Laah, Adefila, & Yusuf in their paper use socio-demographic factors i.e., age, gender, educational qualifications etc. to determine the level of participation in rural infrastructure development where the female

are more sensitive than male towards community development (Laah, Adefila, & Yusuf, 2013; Kasar, 2019). Alongside, Babajanian stresses the importance of accessibility and effective communication channels, and proactive citizen participation (Babajanian, 2015). Level of community participation in management is the magnitude of community participation in performing managerial functions depends on the extent of delegating power such as access to information, consultation and active engagement (Gaventa and Valderrama, 1999). To assess the level of community participation, Shah and Shah have used different measures i.e., influence and power, capacity building, communication, and learning (Shah and Shah, 2009). From the study of Pellini and Ayres, some key factors have been identified for ensuring active participation such as local leadership and role of central authorities for increasing awareness (Pellini and Ayres, 2007). Another study has been conducted by Kelly in 2001 where the level of participation mainly depends on the extent of power they are delegated to make decision, implementation and monitoring progress (Kelly, 2001).

Obstacles of Community Participation

Laah, Adefila, & Yusuf in 2013 have identified constraints of community participation i.e., lack of awareness, incompetent leadership, illiteracy, inadequate funds, and lack of assistance from government (Laah, Adefila, & Yusuf, 2013). Gaventa and Valderrama have identified the barriers of community participation i.e., power relations, level of citizen organization, participatory skills, political will, the level of participation and insufficient financial resources at the local level (Gaventa and Valderrama, 1999).

Instruments to Develop Community Participation

The recommended solutions are i.e., participatory planning, citizen education and awareness building, training and sensitizing local officials, advocacy, alliances and collaboration, participatory budgeting and promoting accountability of elected officials to citizens (Gaventa and Valderrama, 1999). Laah, Adefila, & Yusuf stress the importance to build awareness through mass media, seminars and workshops (Laah, Adefila, & Yusuf, 2013). Grievance redress systems, participatory performance monitoring instruments i.e., citizen scorecards, public hearing and community scorecards can be treated as an effective mechanism to build accountability and explore corruption (Babajanian, 2015). Bernard, Collion, De Janvry, Rondot, & Sadoulet have suggested few mechanisms i.e., trained up service agency staffs, NGOs, two-sided and multifaceted

development agencies and nurturing awareness of political and administrative body. Besides, the awareness building program need to inaugurate in such a way to increase social motivation for community participation to stimulate rural development (Sismujito, 2016).

Conceptual Framework

The conceptual framework is an assumed model for identifying the characteristic under study that designates the relationship between these variables (Kothari, 2004). Different dependent and independent variables have been acknowledged that stimulate the degree of extent active participation level of community. This study intends to find out dependent variables that are affected by the dependent variables. These are shown in the graph below (Figure 2).

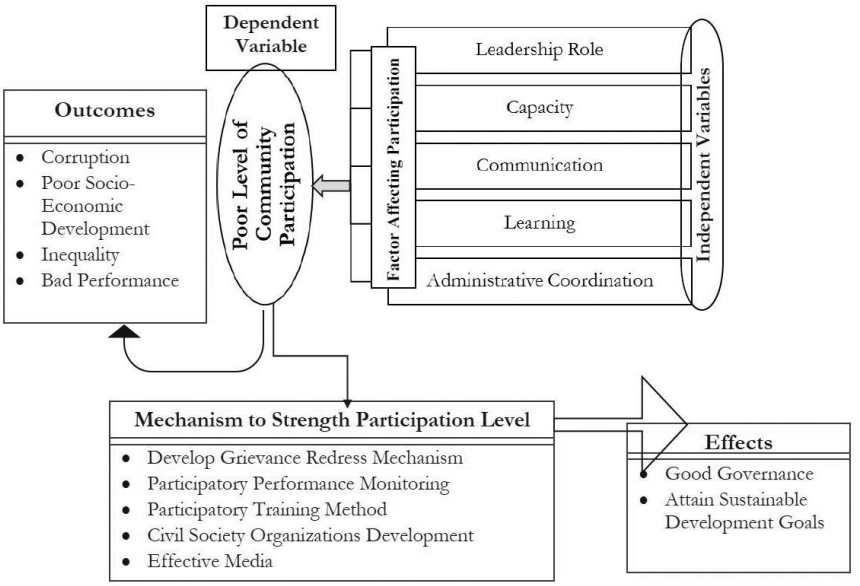


Figure 2: Model framework of community participation and its cause and effects.

Source: Burns, & Heywood, 2004; Okafor, 1982; Babajanian, 2015; Hubley, 1990; McEwan, 2003; Afify, 2011; Lucky, 2016

Hypothesis

In this study, the null hypotheses (H0) and alternative hypotheses (H1) have been developed to identify the level of community participation and its stimulating factors. These are specified below in the table.

Table 1: Proposed hypotheses

Hypothesis: 1	H0: Community participation in the management of Upazila and Union Parishad is not met the standard level.
	H1: Community participation in the management of Upazila and Union Parishad is met the standard level.
Hypothesis: 2	H0: Community participation is not affected by effective communication significantly where capacity, leadership role, learning and administrative coordination have significant effects on community participation.
	H1: Community participation is affected by effective communication significantly where capacity, leadership role, learning, and administrative coordination do not have significant effects on community participation.

Methodology

This study follows explanatory sequential mixed method research design has been used to collect and analysis collected data. Both the primary sources, i.e., semi-structured questionnaire-based survey, Key Informant Interview (KII), etc. and secondary sources, i.e., journal, article, laws, regulations, well-reputed newspaper, published report, documents and books have been used to collect data. Moreover, a semi-structured questionnaire-based survey has been conducted to evaluate the community participation level and KII has been used to explore the key challenges facing to enhance the community participation level with recommended solutions. The semi-structured questionnaire has been developed which is separated into two parts. If first part, the open-ended questions have been established. And in second part, five points Likert scale ((1= Very low, 2= Low, 3= Moderate, 4= High, 5= Very high) has been industrialized under six sections (Section A to F).

By random sampling technique, two Unions (Jiarakhi and Ujangram) have been selected among the 14 (Fourteen) Unions under the Kushtia Sadar Upazila. The population for the questionnaire-based survey has been cited in the table below.

Table 2 : Pilot UZP and UP with target population.

District	**UZP**	**UP**	**Total population**	**Target population [18 years$^{+(Plus)}$]**
Kushtia	Kushtia Sadar Upazila	Ujangram	23,688	15,335
		Jiaraakhi	27,135	17,995
	Total		50,823	33,330

Source: Population and Housing Census of The People's Republic of Bangladesh, 2011

Semi-structured questionnaire-based survey has been conducted on the resident of two Unions (Jiarakhi and Ujangram) under the Kushtia Sadar Upazila. Among total population of two UPs (50,823), target population is the one above 18 years old of two UPs (33,330) under Kushtia Sadar Upazila which has been included in the sample size. Alongside the sample has been calculated by using an online sample size calculator, surveymonkey.com at a 5% significance level (Confidence level 95%) and 15% margin of error rate. This study has been used a stratified random sampling method where the sample is divided into two homogenous groups (Two UPs). The sample size is 43, which has been distributed between the UPs in the table below.

Table 3 : Pilot UZP and UP with Sample.

District	UZP	UP	Target population	Calculation [n× (N_k÷N)]	Sample
Kushtia	Kushtia Sadar Upazila	Ujangram	15,335	43× (15,335÷33,330)	19.78~20
		Jiaraakhi	17,995	43× (17,995÷33,330)	23.21~23
	Total		33,330		**43**

The category-based Sample ($\mathbf{n_k}$) is calculated by the following equation :

$$\mathbf{n_k} = n\times (N_k \div N)$$

Sample size of the strata= $\mathbf{n_k}$

Size of entire sample= $\mathbf{n}$, Population size= $\mathbf{N_k}$

Layer size= $\mathbf{N}$

Alongside, KII has been conducted with the elected person, i.e., chairman and members of two UPs for their opinion towards the mechanism to progress community participation level. In this paper, the dependent and independent variables have been identified and mentioned below with indicators and analytical tools. 5-point Likert scale (1= Very low, 2= Low, 3= Moderate, 4= High, 5= Very high) has been used to quantify the responses in the semi-structured questionnaire. Statistical software, SPSS 26.0 (Statistical Package for the Social Sciences) and Excel are used for quantitative analysis.

Table 4 : Measures of variables

Independent variable	**Indicators**	**Scale**	**Data analytical tools**
Level of community participation	Active role play		
Dependent Variables	**Indicators**	Ordinal/ Categorical	Questionnaire/ Mean, Median, Ordinal Regression, and Spearman Correlation
Leadership Role	All decision-making processes access and taken effective action		
Resource capabilities	Effectively resourced		
Communication	Effective communication and information		
Learning	Effective approach towards participatory learning		
Administrative coordination	Compatible service structure with participation		

Analysis

Descriptive Analysis of Survey Data

The respondents have been asked three questions to determine the level of participation in local governance. Most of them agree with the statement that they do not play any role in policymaking and budgetary control. The average response of each statement is 2.06, 1.83, and 2.34, which are categorized at a lower level (1.81-2.60). Concurrently, the data set deviates towards mean more than one (1.18312, 1.11120, and 1.21270). It indicates that community citizens are only informed a bit of policy, budget and developed programs.

On the other hand, the power and influence of community citizens towards raising demand and making officials accountable is ranged at a low level (In between 1.81 to 2.60) with the variance closest to one. It means that most of the community citizens have power on paper, not in the real sense. The capacity level is also below average in terms of financial or mental (2.0698 and 2.0465). Alongside, the scope of sharing

information and receive feedback is the moderate level where the accessibility and clarification of information are low. Additionally, most community citizens opine that they have no close relatives to learn the bottom of the issues and only depend on elected persons. The base of their knowledge about the local governance issues is pitiable. Besides, the administrative structure is not compatible with proper coordination.

Table 5 : Descriptive Statistics.

Participation Level	**Mean[1]**	**Std. Deviation**	**Variance**
Contribution in-			
Policy making	2.0698	1.18312	1.400
Budgetary control	1.8372	1.11120	1.235
Program development	2.3488	1.21270	1.471
Leadership Role	**Mean[2]**	**Std. Deviation**	**Variance**
Real power of community citizen to-			
Raise demand	2.1860	1.11816	1.250
Make government officials accountable	2.0233	0.98774	0.976
Capacity	**Mean[3]**	**Std. Deviation**	**Variance**
…. capacity to initiate and sustain community driven program			
Financial	2.0698	0.93593	0.876
Mental- Skills and knowledge	2.0465	1.15374	1.331
Communication Effectiveness	**Mean[4]**	**Std. Deviation**	**Variance**
Accessibility of information	1.7442	0.87541	0.766

[1] Range: Very low (Formulate policy centrally)= 1 to 1.80, Low (One-way flow of information)= 1.81 to 2.60, Moderate (Consultation) = 2.61 to 3.4, High (Partnership)= 3.41 to 4.20,Very high (Ownership)= 4.21 to 5

[2] Range: Very low (No leadership)= 1 to 1.80, Low (Token leadership)= 1.81 to 2.60, Moderate (Committed but minimal leadership) = 2.61 to 3.4, High (Short-run leadership)= 3.41 to 4.20,Very high (Long run leadership)= 4.21 to 5

[3] Range: Very low (Absent)= 1 to 1.80, Low (on around 25%)= 1.81 to 2.60, Moderate ((on around 50%) = 2.61 to 3.4, High ((on around 75%)= 3.41 to 4.20,Very high (Totally)= 4.21 to 5

[4] Range: Very low= 1 to 1.80, Low= 1.81 to 2.60, Moderate = 2.61 to 3.4, High= 3.41 to 4.20,Very high= 4.21 to 5

Clarity of information	1.9767	1.31816	1.738
Two way communication	2.6977	1.16568	1.359
Learning	**Mean[5]**	**Std. Deviation**	**Variance**
Action learning networks	2.3721	1.46423	2.144
Knowledge on the rules, & responsibilities	2.0000	1.02353	1.048
Administrative Coordination	**Mean[6]**	**Std. Deviation**	**Variance**
Joined-Upness	1.5116	1.00882	1.018
Take part implementation body	1.4651	0.98437	0.969

Synchronously, community participation, leadership role, capacity, communication effectiveness, learning and administrative coordination levels are lower for female citizens than males. If males are being informed then the females are not even informed about the developed program, Ward Shava and open budget session. Though both males and females have a low level of participation than expected. More revealing is that the female category is far behind the male group in all cases.

Table 6 : Mean compare.

	Gender	**N**	**Mean**	**Std. Deviation**	**Std. Error Mean**
Participation level	Male	22	2.3788	1.19211	0.25416
	Female	21	1.7778	0.96225	0.20998
Leadership role	Male	22	2.6818	0.86665	0.18477
	Female	21	1.5000	0.70711	0.15430
Capacity	Male	22	2.5682	0.83517	0.17806
	Female	21	1.5238	0.67964	0.14831
Communication	Male	22	2.5152	1.14885	0.24494
Effectiveness	Female	21	1.7460	0.70636	0.15414
Learning	Male	22	2.6136	0.96278	0.20527

[5] Range: Very low (No knowledge)= 1 to 1.80, Low (No formal education or training but experience little bit)= 1.81 to 2.60, Moderate (Formal education) = 2.61 to 3.4, High (Trained up without formal education)= 3.41 to 4.20,Very high (Trained up without formal education)= 4.21 to 5

[6] Range: Very low (No cooperation)= 1 to 1.80, Low (Information exchange)= 1.81 to 2.60, Moderate (Coordination) = 2.61 to 3.4, High (Cooperation)= 3.41 to 4.20,Very high (Collaboration)= 4.21 to 5

	Female	21	1.7381	0.84586	0.18458
Administrative	Male	22	1.8636	1.25529	0.26763
Coordination	Female	21	1.0952	0.30079	0.06564

***Range: Very low (1-1.80), Low (1.81-2.60), Moderate (2.61-3.4), High (3.41-4.20), Very high (4.21-5)*

It has been assumed that more educational qualifications increase the extent of community participation. But the survey result doesn't support that assumption. The participation in all education levels is quite the same (All at a low level). Leadership role, capacity and learning increase a little bit but not up to the desired level. Concurrently, administrative coordination is more in non-educated people than the person with proper formal education.

Table 7 : Mean compare based on range[7]

	No Education	**Primary Education**	**Secondary Education**	**Higher Secondary**	**Graduation to above**
Participation level	2.217	2.230	1.867	1.889[a]	2.317
Leadership role	2.025	1.972	1.750	2.833[a]	2.725
Capacity	1.650	1.766	2.100	2.667[a]	2.975
Communication Effectiveness	2.000	2.378	1.867	2.222[a]	2.217
Learning	1.750	1.722	2.450	2.833[a]	3.075
Administrative Coordination	1.850	1.500	1.400	1.500[a]	1.450

Regression Analysis of Survey Data

Before conducting regression and correlation analysis to test a hypothesis, the normality test has been conducted to determine whether to choose a parametric or non-parametric method. Test of normality is done by using the Shapiro-Wilk model as the dataset is less than 100 (100>43). By using the mean transform value, the data are statistically significant (Sig. <0.05) and not normally distributed. For more accuracy, log transform value has been used. It also shows the same result, not normally distributed. So, the best technique to analyze data is the non-parametric method, i.e., Ordinal Regression and Spearman Correlation.

[7] **Range: Very low (1-1.80), Low (1.81-2.60), Moderate (2.61-3.4), High (3.41-4.20), Very high (4.21-5)

Table 8 : Tests of Normality (Shapiro-Wilk).

	By using mean transform value			By using log transform value		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Community participation	0.860	43	0.000	0.906	43	0.002
Leadership role	0.889	43	0.001	0.875	43	0.000
Capacity	0.900	43	0.001	0.890	43	0.001
Communication effectiveness	0.839	43	0.000	0.896	43	0.001
Learning	0.909	43	0.002	0.894	43	0.001
Administrative coordination	0.539	43	0.000	0.575	43	0.000

a. Lilliefors Significance Correction

***Source: Survey data.*

Model fitting information shows the fitness model with dataset. As it is statistically significant (Sig. <0.05), it fits the data very well. And the goodness of fit model shows that they are not statistically significant and the techniques fit well as both Pearson and Deviance sig. value 0.793 and 1.00, both >0.05.

Table 9 : Goodness-of-Fit.

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	362.116	385	0.793
Deviance	112.804	385	1.000

Link function: Logit.

Table 10 **:** Model Fitting Information.

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	178.323			
Final	115.812	62.511	5	0.000

Link function: Logit.

As the technique fits very well, the parameter estimates are useful to test the hypotheses. The regression model summary shows that associated P values regarding the significant effects of certain variables (i.e., leadership role, capacity, learning, and administrative coordination) on community participation level are 0.58, 0.06, 0.24, and 0.89, which are greater than 0.05 (Sig. >0.05). So Null hypotheses (H0) is accepted that

leadership role, capacity, learning, and administrative coordination are the stimulating factors to raise the level of community participation.

In contrary P value associated with the no effects of communication effectiveness on community participation is 0.00 which is less than 0.05 (0.05> Sig.). So Alternative hypothesis (H1) is accepted that communication effectiveness has the significant effects on community participation.

Table 11: Parameter Estimates.

		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Participation level = 1.00]	5.083	1.143	19.77	1	0.00	2.843	7.323
	[Participation level = 1.33]	6.530	1.253	27.18	1	0.00	4.075	8.985
	[Participation level = 1.67]	7.417	1.354	30.03	1	0.00	4.765	10.070
	[Participation level = 2.00]	9.184	1.652	30.90	1	0.00	5.946	12.422
	[Participation level = 2.33]	9.984	1.785	31.27	1	0.00	6.485	13.483
	[Participation level = 3.00]	12.207	2.139	32.56	1	0.00	8.015	16.400
	[Participation level = 3.33]	12.851	2.229	33.23	1	0.00	8.482	17.219
	[Participation level = 3.67]	14.260	2.497	32.60	1	0.00	9.365	19.154
	[Participation level = 4.00]	16.735	3.073	29.66	1	0.00	10.713	22.757
	[Participation level = 4.33]	17.643	3.208	30.24	1	0.00	11.355	23.931
Location	Leadership role	-0.278	0.514	1.292	1	0.58	-1.285	0.729
	Capacity	1.068	0.580	3.399	1	0.06	-0.067	2.204
	Communication effectiveness	3.583	0.730	24.08	1	0.00	2.152	5.014
	Learning	-0.601	0.518	1.345	1	0.24	-1.616	0.414
	Administrative coordination	0.065	0.479	1.018	1	0.89	-0.873	1.003

Link function: Logit.

The Regression Coefficient (Estimates) shows that the capacity, communication effectiveness, and administrative coordination are the positive predictor of community participation. It is an anticipated increase of 1.068 in the community participation level for one unit increase in capacity (Others i.e., communication effectiveness, and administrative coordination remain constant), increase of 3.583 in the community participation level for one unit increase in communication effectiveness, and increase of 0.065 in the log odds of being on a higher level of participation for one unit increase in administrative coordination. Whereas leadership role and learning are the negative predictor of community participation. It is an anticipated decrease of 0.278 in the community participation level for one unit increase in leadership role, and 0.601 in the community participation level for one unit increase in learning.

Spearman Correlation Analysis of Survey Data

The coefficient of correlation determines the relationship between each independent variable and dependent variable ranged from +1 to -1 where -1 indicating perfect negative correlation, +1 indicating perfect positive correlation, and o indicating no relation (Kothari, 2004; Artusi, Verderio, & Marubini, 2002). Here the independent variables are leadership role, capacity, communication effectiveness, learning, and administrative coordination and the independent variable is the level of community participation.

The Spearman coefficient correlation explores that leadership role and community participation level are statistically significant (0.01>0.000) and positively correlated at a modest level (0.590). Capacity and community participation level are also moderately correlated (0.588) with a significance level of 0.000. Alongside, there is a strong positive correlation (0.869) between communication effectiveness and community participation level, and they are statistically significant (0.01>0.000).

Furthermore, Spearman coefficient correlation of the other two independent variables (learning and administrative coordination) and the level of community participation is established at 0.450 and 0.481, which indicate the positive correlation at a moderate level with significance 0.002 and 0.001.

Table 1: Spearman's rho Correlations

		Participation Level	Leadership Role	Capacity	Communication Effectiveness	Learning	Administrative Coordination
Participation Level	Correlation Coefficient	1.000					
	Sig. (2-tailed)	.					
	N	43					
Leadership Role	Correlation Coefficient	**0.590****	1.000				
	Sig. (2-tailed)	**0.000**	.				
	N	43	43				
Capacity	Correlation Coefficient	**0.588****	0.665**	1.000			
	Sig. (2-tailed)	**0.000**	0.000	.			
	N	43	43	43			
Communication Effectiveness	Correlation Coefficient	**0.869****	0.683**	0.598**	1.000		
	Sig. (2-tailed)	**0.000**	0.000	0.000	.		
	N	43	43	43	43		
Learning	Correlation Coefficient	**0.450****	0.696**	0.750**	0.536**	1.000	
	Sig. (2-tailed)	**0.002**	0.000	0.000	0.000	.	
	N	43	43	43	43	43	
Administrative Coordination	Correlation Coefficient	**0.481****	0.510**	0.516**	0.474**	0.558**	1.000
	Sig. (2-tailed)	**0.001**	0.000	0.000	0.001	0.000	.
	N	43	43	43	43	43	43

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Discussion and Recommendation

The study result shows that the level of participation is low which indicates the community citizen only gets information about policy, budget, and developed programs. The factors are identified based on the literature review, i.e., leadership role, capacity, learning, communication effectiveness, and administrative coordination. The study has found that these are the stimulating factors to diminish the participation level through hypothesis tests. The community citizen consummates the power in the name, not in reality. Along with these, they do not have a strong action learning network and little scope for getting feedback. Additionally, they have no engagement in the implementation of the different governmental projects.

As the real scenario shows the poor participation of the community at the grassroots (at the rural level government), it's time to review the laws and regulations to find out whether the loopholes of law are liable to this kind of situation. The constitution of the people's republic of Bangladesh protects every citizen's right and makes special provisions to protect the rights of the marginal group (woman, ethnic minority, religious group). Different laws and regulations (election law) also protect political and voting rights, i.e., freedom of expression, form or be a part of a political party, etc. It empowers citizens to a great extent. And it is strong enough to make sure the balance of power between political leaders, elected officials, and citizens. But in survey data shows, the power centralized the social-political leaders and elected officials.

Besides, the Union Parishad Act (2009) is sound enough to make sure the participation of the rural community in local governance. It has three hardpoints, i.e., Ward Shava, form standing committee, and open budget session. In Ward Shava, community citizens have a scope to raise demand and be a part of UP management, both for policy modification or program development. This provision also stimulates communication effectiveness as it allows an open platform for all to discuss. Along with this, the previous project reports evaluate which makes the officials accountable. The opportunity to be a part of the standing committee enhances the level of administrative coordination. Above all, Ward Shava and open budget sessions stimulate the transfer of learning. The main shortcoming is that it permitted the elected officials to select the members of the standing committee.

As the law is not responsible for the poor level of community participation, the improper implementation is accountable for this. The survey data shows that most citizens do not have any idea about the Union Parishad Act. Few of them opined that it is the responsibility of the government to meet their demands. Most females say that it's not their

responsibility (it's the responsibility of males). Another group expresses that they don't know when the meetings (Ward Shava and open budget session) are held. Most of the citizens agree with the statement that the members of the standing committee are set based on the favoritism of UP members. It stays away from the qualified and motivated citizen from administrative coordination.

The KII synopsis confirms that the UP members arrange the Ward Shava and informs the citizen via village police. But in most cases, the arrangement is not more than twice a year. The participants do not exceed 300 in total. In few words, women participate more than men. One UP member stresses that the participation of women was not significant before, but now it is tremendous as their participation exceeds the men's. One UP member said that the participation rate is lower due to the arrangement of meetings during the working hour. Arrange meetings on a weekly holiday (Friday) is not effective as most people work at the agricultural farms as day laborers. They do not want to sacrifice the earning. The UP member tries to convince them to participate in meetings from time to time.

The awareness-building program is not strong enough in some cases as one of the main mechanisms of the government to build awareness through arrange village meetings. Proper education and transmission of information about the arrangement of the Ward Shava are not enough as most well-educated persons' participation level is low than a non-educated person. And most of the citizens heard about the arrangement of Ward Shava and open budget sessions but remain absent.

The unwillingness of the citizen and miscommunication between elected persons with citizens is the prime reason for the low level of citizen participation. To increase awareness, opinion leaders, NGOs, and religious leaders should play an active role. Participatory training sessions (simulation, role-playing, and problem-solving) can be arranged and make compulsory to attend for all community citizens, service agency staff, and elected persons. Political education must spread out to all levels of the citizens. Community scorecards can play effectively in this situation where track performance record, self-evaluation by service agencies, and community engagement meeting (FGD and survey). A grievance redress mechanism can ensure formal accountability.

Conclusion, Implications, and Future of the Study

The government must play an active role in the socio-economic development of a country. Among the two tiers of the government, i.e., urban and rural level, the rural or local government is more crucial for ensuring development. The policy formulates at the central level but

implements at the local level. The literature shows that community participation is vital for the implantation of the projects. But in reality, the participation is not satisfactory at the management of UP and UZP in Bangladesh. The survey data shows that citizen participation in policymaking, budgetary control, and program development is disappointed. Leadership role, capacity, learning, communication effectiveness, administrative coordination are the stimulating factors to diminish participation level. The law empowers them to be a part of UP management, but they remain far back towards the expectation due to improper knowledge about their knowledge. The citizens do not even raise their voices towards the poor service delivery. Alongside, the Bangladesh government permits open access to information. But unfortunately, they are unaware of these issues. The ineffective media makes this situation worst. The government initiatives are appreciated, i.e., Ward Shava, open budget session, formation of the standing committee for strengthening the participation level. It's even saddest that despite giving power to citizens, they claim for powerless. So, any mechanism without the self-motivation and awareness of the citizen is ineffective.

Many studies has been conducted on the importance of community participation, factors affecting community participation, and mechanisms to strengthen the level of community participation. But this study is the first developed in specific area (UZP and UP) at local governance in Bangladesh. The current level of community participation has been determined by using survey and its stimulating factors. Along with these, the key challenges are which are facing to implement the current programs have been identified. By doing literature, scholar's opinion has been matched with the current identified problems from the survey and recommend solutions. The policy makers and the person assigned to implement the policy should consider the determined level of community participation, its stimulating factors for policy modification and program development. The specific challenges facing for policy implication in each UZP will guide to mediate the problem from the bottom level which is unique in each UZP.

Research limitations are the unwillingness to participate in survey and KII, budgetary constraints, and getting authorization from the area chief. Among the few challenges which have been encountered during conducting the study, the biggest challenge was the respondent's willingness to participate in the survey. Because there was no significant reward for the participants and they fear to share any information due to political affairs involved in here.

This study covers only two UPs among fourteenth UPs in Kushtia Sadar Upazila and the target population was above eighteen years old.

Forthcoming study may cover all the UPs in Kushtia Sadar Upazila. And the only demographic factor i.e., gender has been considered for collecting data in equal portion where different income level and ages category have been ignored. Upcoming study may cover this ignorance part. Moreover, this study only concentrate on addressing the issues of strengthening community participation in the management of two Unions (Jiarakhi and Ujangram) under the Kushtia Sadar Upazila which motivates to conduct further study in each UZP of Bangladesh for policy modification and mediate the unique challenges for implementation the program in each UZP of Bangladesh.

References

Afify, A. M. N. (2011). Challenges and advantages of community participation as an approach for sustainable urban development in Egypt. *Journal of sustainable development*, *4*(1), 23-36.

Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation. *World development*, *27*(4), 629-649.

Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. *Corporate governance: an international review*, *17*(3), 376-387.

Ahmed, T. (2016). The ward sabha in Bangladesh–lessons from Kerala and West Bengal. *Commonwealth Journal of Local Governance*, 164-170.

Ahmed, T. (2019, October 03). Local government and economic development. *The Daily Star*. Retrieved from https://www.thedailystar.net/supplements/24th-anniversary-the-daily-star-part-3/local-government-and-economic-development-71121.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, *35*(4), 216-224.

Babajanian, B. (2015). Citizen empowerment in service delivery. In *Governance in Developing Asia*. *Edward Elgar Publishing.*

BBS. (2011). Population and Housing Census 2011. Bangladesh bureau of statistics (BBS).

Bernard, T., Collion, M. H., De Janvry, A., Rondot, P., & Sadoulet, E. (2008). Do village organizations make a difference in African rural development? A study for Senegal and Burkina Faso. *World Development*, *36*(11), 2188-2204.

Brett, E. A. (2003). Participation and accountability in development management. *The journal of development studies*, *40*(2), 1-29.

Burns, D., & Heywood, F. (2004). *Making community participation meaningful: a handbook for development and assessment*. Policy Press.

Cunningham, J. V. (1972). Citizen participation in public affairs. *Public Administration Review*, *32*, 589-602.

Faguet, J. P. (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local needs?: Evidence from Bolivia. *Journal of public economics*, *88*(3-4), 867-893.

Fritzen, S. A. (2006). Probing system limits: Decentralisation and local political accountability in Vietnam. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, *28*(1), 1-23.

Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999, June). Participation, citizenship and local governance. In *Background note for the workshop "Strengthening Participation in Local Governance," University of Sussex, Institute of Development Studies* (Vol. 21).

Graham, J., Plumptre, T. W., & Amos, B. (2003). *Principles for good governance in the 21st century*. Ottawa: Institute on governance.

Halachmi, A., Greiling, D., & Huque, A. S. (2011). Accountability and governance: strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. *International Journal of Productivity and Performance Management*.

Harrison, G. (2008). From the global to the local? Governance and development at the local level: reflections from Tanzania. *The Journal of Modern African Studies*, 169-189.

Huq, S. M. S. (2016). Women's participation in local Government: a tool for sustainable development of Bangladesh. *European Journal of Business and Social Sciences*, *4*(11), 169-183.

Hussain, D., (2017, September 18). Good Governance at the Local Level: Experiences from Union Parishad. *Daily Sun*, p.Editorial. Retrieved from http://www.daily-sun.com/arcprint/details/255355/Good-Governance-at-the-Local-Level:-Experiences-from-Union-Parishad/2017-09-18.

Ishii, R. (2017). Community participation in local governance–An empirical analysis of urbanized local governments in the Philippines and Uganda. *International Journal of Public Administration*, *40*(11), 907-917.

Islam, M. T., & Fujita, K. (2012). Dimension of Decentralization Process and Rural Local Government in India: A Comparison with Bangladesh. *Kyoto Working Papers on Area Studies*, (130), 1-26.

Islam, S. M. H. Z. (2015). Historical background of the municipalities of Bangladesh: An analysis. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, *20*(1), 62-71.

Kabeer, N., Mahmud, S., & Isaza Castro, J. G. (2010). NGOs' strategies and the challenge of development and democracy in Bangladesh. *IDS Working Papers*, *2010*(343), 01-71.

Kasar, G. D (2019). Community Participation in Rural Development. *Mizoram University Journal of Humanities & Social Sciences*, 5(1) 2395-7352.

Kelly, D. (2001). Community participation in rangeland management. A Report for the Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC). *RIRDC Publication*, (01/118).

Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International.

Laah, E. D., Adefila, J. O., & Yusuf, R. O. (2013). Community participation in sustainable rural infrastructural development in Riyom Area, Plateau State of Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, *4*(19), 83-93.

Lawton, A., & Macaulay, M. (2014). Localism in practice: Investigating citizen participation and good governance in local government standards of conduct. *Public Administration Review*, *74*(1), 75-83.

Local Government (Union Parishad) Act 2009. (Bangla.). Retrieved from http://www.clcbd.org/document/536.html

Lucky, O. (2016). Significance of community participation in rural development. *Journal of Agriculture and Earth Science*, *2*(2), 44-53.

McEwan, C. (2003). 'Bringing government to the people': women, local governance and community participation in South Africa. *Geoforum*, *34*(4), 469-481.

Mirza, R., Vodden, K., & Collins, G. (2012). Developing Innovative Approaches for Community Engagement. *Government of Newfoundland and Labrador and Memorial University*.

Nanda, V. P. (2006). The "good governance" concept revisited. *The ANNALS of the American academy of political and social science*, *603*(1), 269-283.

Naushin Parnini, S. (2006). Civil society and good governance in Bangladesh. *Asian Journal of Political Science*, *14*(2), 189-211.

Njunwa, K. M. (2010). *Community participation as a tool for development: local community´ s participation in primary education development inMorogoro, Tanzania: a case of Kilakala and Mindu primary schools* (Master's thesis, Universitetet i Agder, University of Agder).

Okafor, F. (1982). Community involvement in rural development: A field study in the Bendel State of Nigeria. *Community Development Journal*, *17*(2), 134-140.

Panday, P. (2017). Decentralisation without decentralisation: Bangladesh's failed attempt to transfer power from the central government to local governments. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, *39*(3), 177-188.

Panday, P. (2018). Making innovations work: local government–NGO partnership and collaborative governance in rural Bangladesh. *Development in Practice*, *28*(1), 125-137.

Paul, S. (1987). *Community participation in development projects*. Washington, DC: World Bank.

Pellini And, A., & Ayres, D. (2007). Community participation in local governance in Cambodia: learning from the village networks approach. *Development in practice*, *17*(3), 404-409.

Rahman, H. Z., & Ahmed, T. (2014). Strategy on Local government strengthening. *Background paper for 7th five year plan, Planning Commission, Ministry of Planning, Bangladesh, Dhaka)< http://www. plancomm. gov. bd/7th-five-year-plan/> Republic of Indonesia: Country Programme Evaluation (IFAD*.

Rashid, A. M. (2012). *Legal framework for community participation in governance: The role of co-management in the forest protected areas management of Bangladesh* (Doctoral dissertation, University of Western Sydney (Australia)).

Sarker, M. N. I., Bingxin, Y., Sultana, A., & Prodhan, A. S. (2017). Problems and challenges of public administration in Bangladesh: pathway to sustainable development. *International Journal of Public Administration and Policy Research*, *3*(1), 16-25.

Selman, P. (2004). Community participation in the planning and management of cultural landscapes. *Journal of environmental planning and management*, *47*(3), 365-392.

Shah, A. (1999). *Balance, accountability, and responsiveness: lessons about decentralization*. The World Bank.

Shah, A., & Shah, S. (2009). The new vision of local governance and the evolving roles of local governments. *Journal of Public Administration*, *3*(1), 2-15.

Sharmin, Z., Haque, M. A., & Islam, F. (2012). Problems of strengthening local government in Bangladesh: Towards a comprehensive solution. *Sust Studies*, *15*(1), 76-84.

Sismujito, A. Z. S. (2016). Social Motivation And Peoples Participation In Development Of Rural Development In District Of West Of Nias Province North Sumatra. *International Journal of Scientific & Technology Research*, *5*(10).

Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions. *International social science journal*, *50*(155), 17-28.

The Constitution of Peoples Republic of Bangladesh. amend. 17th. (Repealed 1972). Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=367andvol=15.

Toufique, K. A. (2017). Bangladesh Experience in Rural Development: The Success and Failure of the Various Models Used. *Bangladesh Development Studies*, *40*(1-2), 97-118.

Ura, K., & Kinga, S. (2004). Bhutan–sustainable development through good governance. *A case study from Reducing Poverty, Sustaining Growth*.

Vadeveloo, T., & Singaravelloo, K. (2013). Local government and community development. *International Journal of Business, Economics and Law*, *2*(2), 54-59.

Waheduzzaman, W., & As-Saber, S. (2015). Community participation and local governance in Bangladesh. *Australian Journal of Political Science*, *50*(1), 128-147.

Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. *Third world quarterly*, *21*(5), 795-814.

Wilcox, D. (1994). Community participation and empowerment: putting theory into practice. *Rra Notes*, *21*, 78-82.

KII List

Union Parishad Chairman, 10 No. Ujangram Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 01.

Union Parishad Chairman, 6 No. Jiaraakhi Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 01.

Union Parishad Member, 1 No. Ward, Ujangram Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 12.

Union Parishad Member, 3 No. Ward, Jiaraakhi Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 05.

Union Parishad Member, 4 No. Ward, Ujangram Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 12.

Union Parishad Member, 5 No. Ward, Jiaraakhi Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 06.

Union Parishad Member, 6 No. Ward, Jiaraakhi Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 08.

Union Parishad Member, 9 No. Ward, Ujangram Union, Kushtia Sadar Upazila, Kushtia District, Bangladesh. 2021, April 11.

A Historical Study of Mughal Miniature Paintings During Emperor Jahangir's Reign (1605-1627)

S M Saiful Islam[1], Shakti Pada Halder[2]

[Abstract : The origin of the Mughal School of Painting is a landmark in the history of Indian paintings. The school originated in the reign of Emperor Humayun. The origin of the Mughal style was a result of the synthesis of the indigenous Indian style of painting and the Safavid school of Persian painting. Mughal miniature paintings were a unique blend of Indian, Persian, and Islamic styles. Son of Emperor Akbar, Jahangir's love for art and painting was no less, and for realism, it was more. Under him, Akbar's energetic naturalism was refined into a calmer and intensely realistic style capable of revealing not only the outer appearance but also its unique inner spirit. The prime purpose of this study is to find out the development of Mughal miniature paintings during Emperor Jahangir's reign.]

Keywords : Mughal, Miniature, Art, and Jahangir.

The history of paintings in the Indian subcontinent is multi-layered and variegated. As the topic indicates, Mughal art, a characteristic of the Indo-Islamic-Persian style, flourished on the Indian subcontinent during the Mughal empire (1526-1857). India is a pluralist country. It has an array of mixed art, culture, history, and heritage which are amply reflected in artworks, paintings, sculptures, and architecture. Even, the three great religions – Hinduism, Buddhism, and Islam – played a pivotal role in reshaping the subcontinent. The rich cultural tradition of art is a happy blending of many variants (Brown, 2007, 18-33).

A major part of history is enlightened with the majestic Mughal art. In fact, Mughal art developed in the royal palace. So, every painting and artwork of the special artistic style has stood the test of time. The Mughal art bears testimony of the then social set-up. Mughal art fast expanded through manuscript illustrations and portraiture. Mughal art is highly regarded as miniatures. Because the paintings during the era were mostly

[1]Research Fellow, The International Centre for Study of Bengal Art.
[2]Deputy Keeper, Contemporary art and World Civilization Department, Bangladesh National Museum.

book illustrations. Miniature is an art that depicts a scenario or event in detail and on a small scale. So, miniature painting has carved out a niche in Indian art history (Rogers, 2006, 18-21).

The first phase of the Mughal miniatures, which started during the rule of the first Mughal emperor Zahir-Ud-Din Muhammad Babur (1526-1530), had a strong resemblance with the Persian miniatures. Mughal art can be divided into three phases (Hasan, 2003, 291):

1. Primary era [Indo-Persian phase];
2. Golden era [self-styled Mughal art developed during the period] and;
3. Declining era.

In the light of the historic background, emperor Nasir-Ud-Din Muhammad Humayun (1530-1556) got asylum in Persia after a rigorous defeat with Sher Shah. In Persia, dazzling miniatures by the Persian painters – Abdus Samad and Mir Sayyid Ali – fascinated him. Humayun returned to India with the two artists and innovated the Indo-Persian school of miniature art in 1556. It deserves a special mention that the Mughal art form fully flourished during the reign of emperor Abul Fath Jalal-Ud-Din Muhammad Akbar (1556-1605) for his farsightedness and direct patronage (Rogers, 2006, 29-31).

Mughal art and paintings developed and flourished fast during the reigns of Akbar, his son Nur-Ud-Din Muhammad Jahangir (1605-1627), and grandson Shahab-Ud-Din Muhammad Sahib Qiran Sani Shah Jahan (1628-1658). Jahangir had an artistic inclination. During his reign, Mughal painting developed further. The brushwork became finer and the colours lighter. Jahangir used his intellectual prowess in patronizing the development of art. So, historians have duly dubbed the Jahangir era as the "golden age" of Mughal art or "Mughal renaissance".

Jahangir was a real connoisseur of art and architecture (Brown, 2007, 125-128).



Figure-1 : Jahangir With a Portrait of Akbar, Artist : Abu'l Hasan (Nadir Al-Zaman) and Hashim. Gouache on paper, 1614, Musee Guimet, Paris.



Figure-2 : Celebrations at the Accession of Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri*, Artist: Abu'l Hasan (Nadir Al-Zaman), Gouache on paper, Circa 1615-1618, The Saint Petersburg Album, Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences.



Figure-3 : Emperor Jahangir Preferring a Sufi Sheikh to kings, Artist: Bichitr (borders by Muhammad Saddiqi), Gouache on paper, Size: 25.3 × 18.0 cm, Circa 1615-1618, Page from the Saint Petersburg Album, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institute, Washington DC.



Figure-4 : Portrait of Jahangir, Artist: Abu'l Hasan (Nadir Al-Zaman), Gouache on paper, 1617.

But Mughal art and portrait paintings faced a setback during the reign of Shah Jahan, son and successor of Jahangir, as he was engrossed in architecture. The style of Mughal architecture found expression of exceptional splendor during his reign. Shah Jahan is, thus, called the "architect of Mughal architecture".

Later, Muhi-ud-Din Muhammad Aurangzeb (1618-1707) did not actively encourage Mughal paintings, but as this art form had gathered momentum and had several patrons, Mughal paintings continued to survive, but the decline had set in. It may be mentioned that the development of Mughal art would have been hampered without the royal patronage. The art form Humayun imported from Persia changed its shape in the Indian environs

when Akbar was in power. The art form did not flourish fully, it was not able to evolve as a complete fine art. It must be acknowledged that Mughal art developed under the auspices of Akbar (Figure-1). Percy Brown justifiably said, "Jahangir hatched the egg [symbolises the development of Mughal art] that Akbar lay" (Brown, 2007, 70).



Figure-5 : Allegorical Representation of Emperor Jahangir and Shah Abbas of Persia, Artist: Abu'l Hasan (Nadir Al-Zaman), Gouache on paper, Size: 23.8 × 15.4 cm, 1618, Freer Gallery of Art, Washington DC.

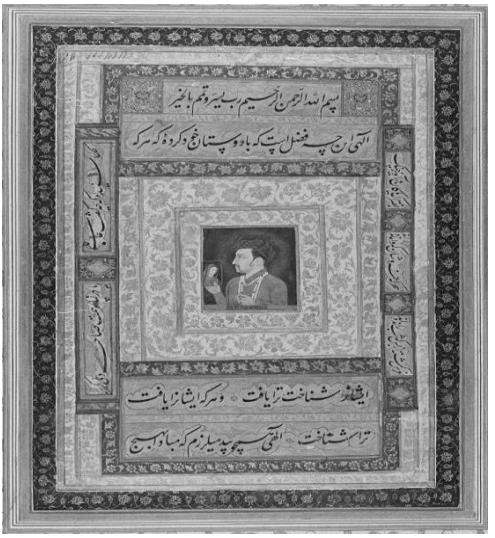


Figure-6 : Jahangir Holding a Picture of the Madonna, inscribed in Persian, Gold, and gouache on paper, Size: 33 × 49 cm, National Museum, New Delhi.

The artworks in Akbar's well-established art gallery were not the perfect combination of the Indo-Persian style. Abdus Samad and Mir Sayyid Ali established the gallery and the key source of artworks was Persia. Emperor Akbar was not as far-sighted and virtuoso as Jahangir for a number of reasons. He thought that artists from different parts of this empire and the outside could be able to practice artworks. If one artist is an expert in Persian sketch, the other was adroit in Indian style while another was skilled in Persian colour composition, making everything a mess. In addition, he had a huge collection of illuminated as well as illustrated Farsi (Persian) manuscripts. So, artists were also influenced by Persian art (Schimmel, 2004, 270-273).

However, a brief revival was noticed during the reign of Muhammad Shah 'Rangila' (1719-1748), but by the time of Shah Alam II (1759-1788), the art of Mughal painting had lost its glory. By that time, other schools of Indian painting had developed, especially by Hindu artists, in the royal courts of the kingdoms of Rajputana, Rajput painting, and in the cities ruled by the British East India Company.



Figure-7 : Jahangir and His Vizier, Artist: Manohar, Gouache on paper, 1615, Page from the Kevorkian Album, Metropolitan Museum of Art, New York.



Figure-8 : A Domestic Turkey-Cock, Artist: Ustad Mansur (Nadir-ul-Asr), Gouache on paper, 1612. Victoria and Albert Museum, London.

Yuvraj Daniel said, “The episode of love between Shirin and Farhad is now a hoary tale. When we read the saga, we do not get anything new from the stories we heard about them” (Coomarswamy, n.d., 9). Under the patronage of Jahangir, miniature form continued to decrease, because artists were more busy doing paintings of live things rather than illustrations. So, it can be easily surmised that the style of portrait paintings freed the Mughal art from manuscript illustrations.

Jahangir’s ascension to the throne of the Mughal Empire opened a new leaf in the history of Mughal art. Jahangir himself was also an artist. The court artists were greatly influenced by the emperor’s connoisseurship and committed patronage of art. The Indo-Persian style then continued to shrink fast paving the way for the grounding of the Indian art form. It happened only because of Jahangir’s affection for art and political stability. Emperor Akbar was too busy in warfare and other strategic issues to give time for the development of distinctive Mughal art. He commissioned a wide array of skilled artists, but he was not able to coordinate their artworks. But Jahangir was a great success in creating a congenial environment for practicing fine arts smoothly.



Figure-9 : Portrait of Abu'l Hasan (detail), Artist : Daulat, Gouache on paper, Circa 1610.

Jahangir's connoisseurship is widely known from his autobiographical sketch *Tuzuk-iJahangiri* (Figure-2). He ascended the throne of organized sovereignty only at the age of 37 and inherited an art gallery from his father. As a young emperor, Jahangir devoted himself to the overall development of Mughal art (Beveridge, 1914; Brown, 2007, 70-71). According to the illuminated manuscript of *Akbarnama* of Abul Fazl, Jahangir donated the book to the royal library (archive) in 1605. *Zafarnama*, which was collected from a garret, cited that there was a handwritten note of Jahangir. In the note, Jahangir showed his profound love for his father and had an appreciation of the beauty and artistry of six pairs of miniatures.

Jahangir inherited all the sterling traits, which an emperor needs, from his great grandfather emperor Babar, the founder of the Mughal dynasty. Both the personalities had identical features in their characters. Both had strong acumen as well as efficiency and a strong penchant for fine arts and craftsmanship. They loved nature, gardening, flowers, traveling, and deer as well. Both the emperors had a strong desire for an alcoholic drink, but they were real music lovers. Music, literature, and science were widely cultivated during their rule (Figure-3 & 4). Even, they showed equal sympathy to animals. Studying the genealogical tree, Jahangir was

hyphenated by birth. He had both the Mongoloid-Chagtai and Indian blood in his veins because he was the sonofa learned woman Jodhabai. But Babar had a blood connection with Mongol-Chagtai lineage. Percy Brown said that a radical change was marked in Jahangir's mindset as he had both Central Asian and Indian blood. We cannot term it non-Indian, because Jahangir pioneered the development of Mughal art in the Indian subcontinent. He was able to blend Persian-Turkey and Rajput styles in the Mughal art (Brown, 2007, 71-72).

Three forms of paintings were drawn in Jahangir's art gallery –

1) illustrations or miniatures
2) portraiture and
3) drawing of flowers and natures.

A painter named Aqa Riza came to the court of emperor Jahangir from Hirat. Aqa's son Abul Hasan set a mark of distinction in fine arts. After his assumption of power, Jahangir followed his father's footprints. He was engrossed in collecting huge illustrated books for the royal archive. He sent delegates to a different area of the empire to gather precious illustrated volumes and solo artworks. Various schools used his gallery to display their artworks. Even, royal painters had every reason to be influenced by the activities (Figure-5 & 6) (Hasan, 2003, 322).

The first miniature painting titled "Elopement of a Princess with Her Beloved", which was done in 1606 was kept at Rampur State Library. It was a night-time scene as a slice of the moon was seen at the top left side of the artwork. Even, other attendants and porters fell fast asleep. A famous landscape with a garden was sketched in the form of Persian architecture. But the trees, especially the banana tree, a peacock on the rooftop, visages of women, and dresses were completely Indian. The work of art was an excellent Persian-Mughal blending (Figure -7).

Emperor Jahangir was proud of a collection of four Persian paintings which were done in Bihzad's School in 1499. He bought the artworks at Tk 1,500. He admitted to the fact that it was very tough to collect the masterpieces from famous Persian artists. That's why he had to be satisfied with the miniatures of Bihzad's disciples. Another special collection was the illustrated manuscript of *Yusuf and Julaikha* by Molla Mir Ali. The nicely carved book was purchased at 1000 mohors. Jahangir in his autobiography also told the story of collecting a 200-years old miniature with the signature of noted painter Khalil Mirza. According to his own account, Shah Abbas' library director Sadeqi collected that Persian masterwork.

But incidentally, the miniature was in the hand of Khan Alam in Irfan. Shah Abbas came to know about it and collected it from Alam. Later, at the special interest of Emperor Jahangir, Abbas sent it to the representative of the emperor in Isfahan, the capital of Persia (Brown, 2007, 76).

Receiving the miniature, Jahangir let out a satisfactory note. It read: "It is really a tour de force and the same as the works of famous artist Bihzad. If no signature was inlaid, anybody could think it might be Bihzad's. As the artwork was done before his birth, he could easily be Khalil Mirza's disciple and take artistic finesses from him." We can easily predict Jahangir's farsightedness and wisdom from such an art and succinct statement (Brown, 2007, 76-77).

After the deaths of the founders of the Mughal art gallery – Mir Sayyid Ali and Abdus Samad, Central Asian national Farrukh Begh was made the principal of the gallery. In addition, two genius artists from Central Asia – Muhammad Nadir and Muhammad Murad – came to the Mughal palace. Even, during Shah Jahan's rule, there was only one non-Indian artist in the gallery. Others were Muslim and Hindu artists. In Jahangir's art gallery, two very rare-born talented painters were Abul Hasan and Ustad (Master) Mansur. Abul Hasan got the title of "Nadir-Al-Zaman" (The wonder of the age) from the emperor in recognition of his frontispiece to *Tuzuk-i-Jahangiri* (Figure-9). The emperor said, "Abul Hasan's work was the best and the most attractive among the contemporary artists." As a portrait painter, Abul Hasan earned both name and fame during the period. His bust portrait of Jahangir was a magnum opus of the fine arts. The profile picture of the emperor was an outstanding work of art. In the picture, Jahangir holds the portrait of his father while Akbar presents his son a map, meaning that Jahangir would be the sovereign of the entire world (Brown, 2007, 82).

Jahangir was pleased with the innovative works of Mansur also. The emperor gave him the title "Nadir-ul-Asr" (The Miracle of the age). Mansur shot to prominence for his paintings of the animal kingdom. According to a panel of experts, Mansur was great for his heart-touching portraiture of birds, especially peacock and Turkey cock (Figure-8).

Other paintings were a blue-necked Himalayan bird, zebra, cock, white crane, a herd of buffalos, red-crested water bird, etc. A special soft corner for the member of the animal kingdom is found in Mansur's artworks. Daulat was the best among the celebrated Indian Muslim artists. Like Akbar's Hindu painters, Jahangir had a number of skilled Rajput-style painters, including Bishndas, Tarachand, Jagannath, Manohar Das and Govardhan (Rogers, 2006, 95-98).

Conclusion

To sum up, art lover Jahangir's great success was to give a complete shape to the Mughal art that flourished during his 22-year rule. The Mughal art and portraiture were at the height of excellence. Last but not least, Emperor Jahangir's outstanding contribution to the Mughal renaissance or the development of art and paintings remains etched in the history of Mughal fine arts in the subcontinent.

References

Beveridge, H. (Ed.) (1914), *Tuzuk-i-Jahangir or Memoirs of Jahangir*, Trans. by J.M. Rogers, Vol. II, London: Royal Asiatic Society.

Brown, P. (2007), *Indian Painting Under the Mughals: A.D. 1550 to A.D. 1750*, New Delhi: Cosmo Publications.

Coomar swamy, *Suz-u-Gudaz of Naui* (Indian Collection), British Museum.

Hasan, S.M. (2003), *Muslim Chitrakola (Muslim Painting)*, Dhaka: Mowla Brothers.

Rogers, J.M. (2006), *Mughal Miniatures*, London: The British Museum Press.

Schimmel, A. (2004), *The Empire of the Great Mughals – History, At and Culture*, London: Reakiton Books Ltd.

Impact of Waterlogging and Coping strategies of Women : A Sociological study on Jashore and Satkhira District

Piyush Mondal*

[Abstract : Waterlogging is a common phenomenon in the southwest region of Bangladesh and women are the worst victims of waterlogging. This study examined the suffering of women during waterlogging and how they adapt to this adverse situation. The survey was conducted by random sampling of 105 respondents from Manirampur Upazila under Jashore District and Tala Upazila under Satkhira District. A pretested questionnaire was developed and multiplied for data collection. After analysis, it was found women faced different types of problems during waterlogging. Women were attacked by various diseases at that time. Besides, women are always worried about safety and the future. They always try to cope with this situation, but it is difficult for them during waterlogging. The findings of this research have been able to highlight the plight of women during waterlogging and provide insight into how they cope with these issues. This study will help policy makers to take next steps.]

Keywords : Waterlogging, Safety, Health hazard, Livelihood, Adaptation, Sanitation.

Introduction

Bangladesh is known as one of the most vulnerable countries in the world. Every year Bangladesh faces a severe natural disaster which damages our natural properties. At the beginning of the 21st century, a new problem called "waterlogging" emerged in the southwest coastal region of Bangladesh (Awal, 2014). The main cause of such intense waterlogging is the gradual replacement of sediments. Waterlogging problems can be more serious than floods (Chowdhuri, 2007). Waterlogging has negative effects on many socio-economic sectors, such as tree roots, salinity destroys all vegetation, fruit trees die, agriculture suffers, and livelihoods and livestock rearing becoming impossible (Unnayan Onneshan, 2007). Prolonged inundation has greatly reduced agriculture and allied occupations. Environmental disasters such as

*Documentation Officer, Rabindra University, Bangladesh.

waterlogging, river siltation and salinity have become common events in the southwestern Bangladesh and are causing unimaginable human suffering (Ashraf-ul-Alam, 2005). People are severely affected by waterlogging, which damages a huge number of crops and infrastructural elements in the affected areas. Women are the worst sufferers due to waterlogging. Women, being the primary breadwinners of the family, are compelled to live within the waterlogged premises, shouldering the entire burden of managing and cooking food, collecting drinking water, and taking care of the family members and their livestock as well (Awal, 2014). Most of the time, they have to do work with contaminated water. As a result, they are exposed to many water-borne or infectious diseases as well. Furthermore, women are susceptible to various sexually transmitted diseases, such as vaginal infections and other reproductive issues. Pregnant women cannot walk properly in slippery and marooned conditions. They are forced to stay back inside the house and ultimately fall victim to unhygienic reproductive health conditions. Women always feel insecure, especially when the male members go out in search of work. Waterlogging is a global phenomenon, but its prevention and mitigation methods have received little attention to date. Specific research on waterlogging problems is scarce. Much research has been done on waterlogging but the dire situation women go through during waterlogging has been ignored. The researcher in this study has tried to give an accurate idea about what problems women face during waterlogging and how they deal with them.

The objective of the study

- To know the impact of waterlogging on women,
- To identify the nature of the suffering of women due to the migration of male members,
- To know the coping strategies of women.

The Rationale of the Study

Waterlogging is one of the most serious problems in the southwestern region of Bangladesh. In the last decade, the region faced a significant experience due to waterlogging. Areas in various upazilas of Satkhira and Jessore districts are more vulnerable and areas are severely vulnerable to various hazards such as water logging, floods, arsenic, salinity or water etc. Waterlogging has dangerous effects on both humans and animals. So, it is the most important of problems. It can have many effects such as infrastructure damage, human loss, human disease, socio-economic problems, lack of neighborhood interaction. There may even be severe epidemics in these areas. Tala upazila of Satkhira district and Manirampur

upazila of Jessore district are located in lowland areas. Rainwater cannot be drained properly due to silting of the river. In this situation, people are suffering severely due to waterlogging, which is indescribable. The area remains waterlogged for almost half a year and various roads and houses are damaged. Women get trapped in water during waterlogging. A large number of women said they suffered from severe vaginal infections and other reproductive health disorders. Women in rural Bangladesh always feel insecure both physically and mentally. In swampy conditions, males can take advantage of the helplessness of females. In general, a patriarchal society does not ensure justice, often due to the lack of eyewitnesses to an incident. In this society men are just men even in swamped situations. Only women are permanently water bound. Also, women accept the consequences of unsanitary conditions. Although, this is a serious issue in this field, only a small number of empirical studies have been conducted in the context of Bangladesh. This research has tried to find out an accurate scenario in this context and to ensure reliable information about the problem. Thus, it will be helpful for the academic sector, researchers and policy makers who want to increase their understanding of the problems faced by women due to waterlogging.

Literature Review

A review of literature provides researchers with knowledge and guidance about their research topic. This limits the previously published works of scholars and researchers in the respective fields. The present review is an attempt to highlight the impact of waterlogging on the local population. Generally, previous research reviews on relevant topics have been published before. It is an important part of sociological research. Below are some literature reviews based on watershed:

Shamind Neelormi et al. (2009) in their article titled "Gender dimensions of differential health effects of climate change-induced waterlogging: A case study from coastal Bangladesh," they state that economic and agricultural activities are severely disrupted due to inundation. Loss of land, livelihood often forces men to go away for weeks in search of alternative livelihoods. Women, as the primary caretakers of the family, are forced to live in waterlogged areas, collect, manage and bear the burden of drinking water, cooking food, and taking care of family members and livestock. Women are the biggest victims of social evils. This article also shows that waterlogging greatly affects the health status of women in affected communities. Local sanitation systems are ineffective under water. The entire reservoir was found to be contaminated with human excreta and household waste. Women are

forced to stay close to the community and drink unclean water, as the tube wells are also contaminated. Pregnant women cannot carry out their daily activities in slippery and discolored condition.

Mubarak Arfin, Umrneh Saika and Khondaker Mohamad Shariful Huda et al. (2012) conducted a study on, "Causes of Water Logging and its Impact on Women: A Case Study on Dhaka City in Bangladesh". The study was concerned with discussing the drainage system of the study area to analyze the causes of waterlogging and its impact on women in the study area. The study reveals various causes of waterlogging, such as improper drainage system, drainage congestion, lack of public awareness etc. The study briefly analyzes the impact of waterlogging on women in Dhaka city, such as their social harassment issues, socio-economic status, etc.

Another scholar, Namrata Chindarkar (2012) conducted a study on "Gender and Climate Change induced Migration: Proposing a Framework for Analysis." Women who are forced to migrate with their families or on their own due to climate change also face unique challenges. It found that women from rural poor families in Bangladesh who migrate to cities like Dhaka are often forced into long hours and low-paying jobs such as sweet shops and domestics due to their lack of skills and education. Thus, climate change-induced migration could potentially push women into poverty traps or permanently displace them from their homes.

A group of studies was conducted using monthly panel data collected in the Chitwan Valley of Nepal that covers ten years (Shrestha and Bhandari 2007, Massey et al.2007, Bohra Mishra and Massey 2010). The main objective was the effect of environmental diversion on external migration; All studies disaggregated effects by gender. The methods and results of these studies differ but a common conclusion is that increases in fuelwood and fodder collection time and decreases in agricultural productivity increase the likelihood of local exodus.

The Disaster Crunch Model

A disaster is a simple and common event in our country. A disaster is usually the result of a natural or manmade hazard that impacts negatively on the natural environment. This diagram shows how hazard and vulnerability combine to squeeze or crunch a population, causing a disaster.



A hazard may be natural, for example, an earthquake, drought, waterlogging, or cyclone, or it may be a Conflict or industrial accident (for example, tree cutting can cause drought in this area). Climate change is increasing the risk of extreme weather events. This is also impacting the wider areas.

Elements at risk

Many parts or elements create human life, like building family networks, livelihoods, and available natural resources, elements of human life. These elements are very important, but if an element is in danger of being harmed by a hazard or problem, then they are known as an element at risk, or we can say that this is an element at risk. Individual (male/female), Social (including spiritual), Natural, Physical (including constructed), and Economic are the five categories into which we can be classified.

Underlying causes

The structures and processes considered often have deeper roots known as "underlying causes". Such causes are embedded in the culture, customs, or beliefs of the community concerned. They operate from power bases many miles away from the community concerned. They fall into four main categories.

Politics : For political reasons or issues, the nationalized government may provide resources to a particular government that is always going to retain power in the next election. For those reasons, the government takes many steps, and it is one of the main aims of a government.

Economics : The national government has an important role in economics. The national government must make decisions about how to spend its money or property. For example, if more money is directed toward defense or debt repayment, health and agricultural services may be underfunded.

Culture and Beliefs : A culture that attributes disaster to the bad behavior of spirits may not be willing to embrace measures to reduce disaster risk.

Natural Environment : Climate, soil type, and geography are the main elements of the environment that affect vulnerability. The environment and land are the main factors in farming. For example, as steep hillsides

will influence what types of farming practices are used and increase the livelihood of landslides.

As discussed in this chapter, the present study mainly incorporates the Crunch Model in explaining the coping strategies as well as the waterlogging situation adaptation mechanism from a sociological viewpoint.

Methodology

Method and Techniques : "Triangulation methods" is used in this study. To ensure greater validity in the findings quantitative and qualitative method is the best way to find out proper data about the problem of the research. The study is mainly focused on primary data. "Quantitative data" has been collected through the questionnaire as a part of the survey method. On the other hand, a checklist for the case studies has been used as the tool of the research. That is the technique of "qualitative methods".

Sampling and sample size : Sampling are a procedure of choosing subgroups from the populations. Mainly there are four types of sampling procedure techniques followed in different research. Purposive sampling is taken in this research. Purposive sampling always represents the researcher's own judgment about the study. In this research total sample size is 105 respondents that are selected from that area's population.

The sample mean : Sample mean is the average of the total data that a researcher collected from the whole population in the specific study area.

$$\text{Sample Mean} = \frac{\sum x}{n}$$

Study problem restatement : The main problem of the study is to find out the waterlogging problem of the Jashore and Satkhira districts. Women face miserable conditions in the waterlogging in this area. This study focuses on finding out the condition of women during the disaster time and what types of coping strategies they have taken on the condition.

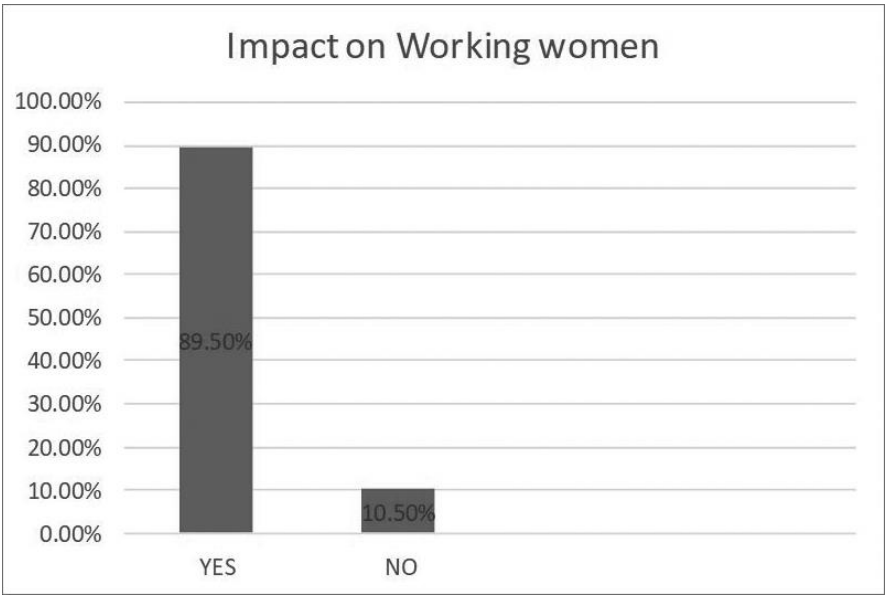
Study area of Jashore District : The study was conducted in two upazilas, Manirampur under Jashore and Tala under Satkhira district, considering their vulnerability during waterlogging. Manirampur is located between 22°55' and 23°06' north latitudes and between 89°09' and 89°22' east longitudes. The area of Manirampur Upazilla is 444.72 sq km. It is bounded by Jashore Sadar Upazila on the north; Kalaroa, Keshabpur, and Dumuria Upazila on the south, Abhaynagar Upazila on the east, Jhikargachha Upazila on the west.

Study area of the Satkhira District : On the other hand, Tala Upazila is located between 22°32' and 22°50') in the fourth latitude and between 89°05' and 89°20' east longitude with a 344.15 sq km area. It is bounded by Paikgachha Upazila on the east, Kalaroa, Keshabpur, and Dumuria Upazilla on the north, Satkhira Sadar Upazila on the west, and Assasuni Upazilla on the south (Banglapedia, 2016).

Among the two Upazila, the Haridaskathi union from Manirampur Upazila and the Islamkati union from Tala Upazila were selected. Four areas in two unions have been selected for facilitating the study. These are Kumershima, Pachbaria, Kharail, and Bhabanipur. By using purposive sampling, a total of 105 samples were selected as samples for face-to-face interviews. The respondents included all categories, i.e., housewives, working women, and self-dependent through cattle rearing. As it is an exploratory type of study, the researcher has considered some case studies.

Results and Discussion

Figure 1: Percentage distribution of the impact on working women during waterlogging.



Source : Field survey, 2018

Women are the worst victims of waterlogging. They face problems from various sides. Working women are facing problems due to waterlogging. Of the respondents, nearly 90% said they faced problems during the situation. Most of them opine that they play dual roles as housewives and working women. In a general sense, it is difficult for a person to manage two jobs. So, the situation worsens during waterlogging. Working women face safety issues related to their transportation. During this time, the roads are submerged in water and sometimes the roads are broken, resulting in lack of regular vehicles. So, everyone has to walk, but it is very unusual for women. Because after returning from work she has to finish her housework. If she can't come earlier, she won't be able to finish her homework. At the same time, it creates problems with their security. The lack of normal transport forced her to take a crowded car. Many times, women cannot get into the car. So, they are late to return home. As a result, family members are worried about her safety.

Table 1: Percentage distribution by nature of the effect on women's occupation

Nature of effect	Percentage (%)
Low Wage	10.50
Doing more work	57.50
Becoming Jobless	18.30
Different Harassment/ Security	4.70
Others	9.00
Total	100.00

Source: Field survey, 2018

Table 1 shows the nature of the impact on women's occupation during waterlogging. Most of the respondents (57.5%) said that they worked more during this period. On the other hand, about 18.30% of the respondents said that they lost their jobs due to waterlogging, and some respondents (10.5%) said that they get low prices at their workplaces. Moreover, various types of harassment and safety issues affect their profession. Apart from the workplace, they are dealing with this situation by engaging in various small businesses and producing various handicraft products. Besides, they seek alternative livelihood opportunities like: duck rearing, cage fish farming, craft training, tailoring, poultry and fish feed farming etc.

Table 2: Percentage distribution by nature of the effect on household activities

Nature of effect on household activity	Percentage (%)
Cooking Problem	20.95
Washing Problem	2.86
Lack of pure drinking water	30.48
All problems	45.71
Total	100.00

Source : Field survey, 2018

Table 2 indicates the types of problems faced by women during their household activities due to waterlogging. First, women work at home, and they face problems with their work. Every day they have to prepare food for their family members. But they face scarcity of materials like rice, vegetables etc. 21% of the respondents said that cooking was the main problem during this period. 30% of respondents said that lack of pure drinking water affects their household activities. About 46% opined that all these problems affect them. We know that waterlogging destroys homes, latrines and sources of safe drinking water and disrupts daily life. The picture is similar to the research results. Women have to struggle to cope with this situation. Women take various steps to solve this problem. They store rainwater in large pots at home to use for cooking and washing and even drinking as drinking water.

Table 3: Percentage distribution of the problem faced by women due to the migration of male members

Effect of Women during male member's migration	Percentage (%)
Maintain children alone	42.00
Lack of social security	30.00
Searching livelihood	3.00
Lack of food security	9.00
Sexual Harassment	2.00
All Problem	14.00
Total	100.00

Source : Field survey, 2018

Through informal interviews, the researcher obtained information that, due to severe financial crisis, many people could not eat three meals a day even after removing the stagnant water. Lack of food or safe drinking water has forced many villagers to migrate.

In this context, the researcher tries to find out what kind of problems women face due to the emigration of male members. In response to this question, the respondents said that the absence of male members for the maintenance of children is the most problematic because, in the absence of male members, the entire responsibility of the family falls on a female member. Lack of social security (30%) and food security (9%) are other problems. These things hurt women emotionally. But get no help from anyone. They have to wait for relief from various organizations. Not everyone is relieved there either. They are forced to resort to local dignitaries hoping for help from various agencies.

Table 4 : Percentage distribution by nature of diseases among women

Nature of diseases	Percentage (%)
Waterborne	74.28
Malnutrition	16.19
Infectious	9.52
Total	100.00

Source : Field survey, 2018

Since it is very difficult to cook meals every time, family members do not eat three meals a day. During waterlogging most of the family members take one meal a day. Thus, the calorie requirement per person is incomplete. Thus, it creates a different health risk for the problem, especially for women. Women are suffering from various diseases due to waterlogging. Most of the respondents (74%) suffer from water borne diseases such as diarrhea, cholera, typhoid etc. About 10% of the respondents reported that they suffer from various infections, and acute vaginal infection is one of them. Collection of clean drinking water is a serious problem at this time. Hence lack of clean drinking water is responsible for various diseases. When the women complete their daily household chores, they go over the water. Contaminated water causes various skin problems and infections. Also, malnutrition played an important role during this period.

Table 5 : Percentage distribution of the problem of using firewood

The problem of firewood	Percentage (%)
Yes	93.33
No	6.67
Total	100.00
Type of problem	Percentage (%)
Go to another place to collect firewood	17.35
Drying problem of firewood	11.22
Lack of adequate firewood	29.59

All problem	41.84
Total	100.00

Source : Field survey, 2018

The researcher wanted to know whether, due to waterlogging, the respondents faced any problem in using firewood. In response to this question, 93% of the respondents said that they faced problems. They lack firewood and stoves. A stove made of clay is destroyed by water. Knowing this, the researcher tried to determine the nature of the problem in the use of firewood. Among them, about 30% of the respondents said that they lacked enough firewood, 17% of the respondents said that they went to other places to collect firewood, and some respondents said that the problem of firewood drying was another problem. To solve this problem, the use of cylinder gas and the use of electric equipment have increased significantly in the studied area.

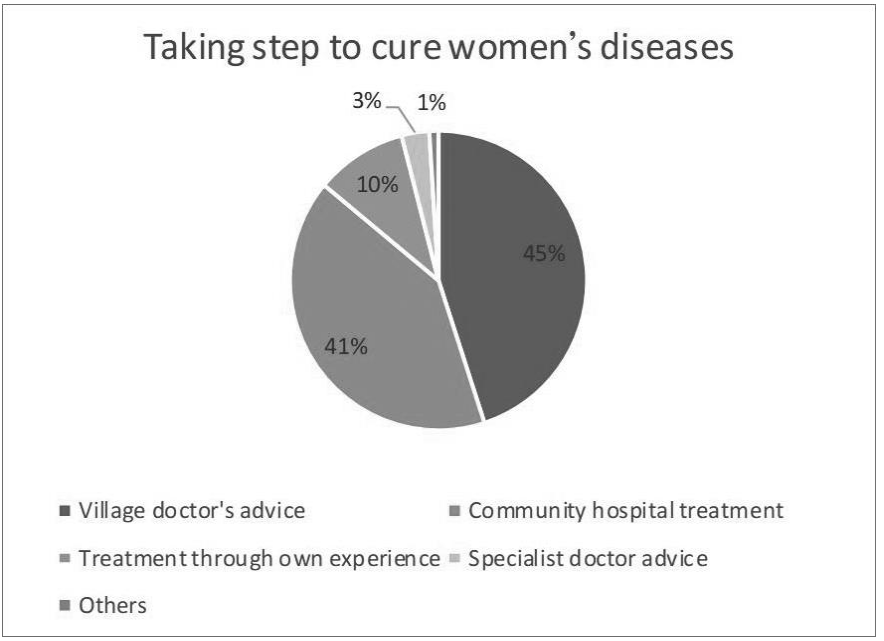
Table 6 : Percentage distribution of the respondent's opinions about the problem of the pregnancy period

Create a problem for women during pregnancy time	Percentage (%)
Strongly agree	32.4
Agree	49.5
neutral	14.3
Disagree	1.9
Strongly Disagree	1.9
Total	100.00

Source : Field survey, 2018

The researcher tried to know the opinion of the respondent about the problem of pregnancy. However, we know that pregnant women are the most victims of this situation. Villagers face problems with sanitation, and most villagers do their normal work in the open. But the sanitation problem of women and girls is beyond description. Thus, it poses a serious health risk to women and girls. The situation creates a bitter experience for pregnant women. Their problems cannot be expressed in words. The table also shows that about 50% of the respondents agree and 32% strongly agree that waterlogging causes many problems. Respondents said that women do not move freely due to waterlogging. All kinds of social activities, i.e. weddings, social interactions, everything seems to be suspended. There are hardly any opportunities for entertainment. Except in emergencies, they do not go out and they do their daily household chores very carefully.

Figure 2 : Percentage distribution by taking steps to cure the diseases



Source : Field survey, 2018

A major concern in health and nutrition lies in food security. Due to decrease in production and income, people reduce food consumption. They also said children are suffering from severe malnutrition as mothers try to feed their children with what they have when they are half-fed or even starving. In previous Table 4, we have shown that during waterlogging, respondents suffer from various diseases due to lack of adequate food and clean drinking water. Women are unable to wash their clothes due to lack of clean water. So, they use dirty clothes and utensils which are the fuel of disease. Figure 2 shows the steps taken by the respondents to cure the disease. The pie chart shows that most of the village women visit the village doctor for consultation. About 45% of the respondents prefer to go to the village doctor for consultation and treatment. 41% of the respondents visit a community clinic for consultation and 10% of the respondents take medicine from their previous experience. Only 3% of the respondents visit a specialist and these people belong to the upper class of the society. Some people rely on Kaviraj for traditional treatment and their spiritual beliefs. This segment belongs to only 1% of the respondents. Thus, a large number of respondents are deprived of modern medical facilities.

Case study analysis

Case Study-1

Case study analysis also shows that women are the most vulnerable during waterlogging. This will appear more evident from the statement made by a woman, age 25, who discussed her experience as follows:

Waterlogging is a regular issue in her area, especially during the rainy season. Because there is no proper way to pass the water. The water drainage system has broken because of siltation in the local rivers. She lives in a joint family with eight members. She described the impact of waterlogging, which they faced in the last four years. She said their yard was under 3–4 feet of water. At that point, they cannot go out without a boat. Their toilet also sank underwater. She described that she faced a tremendous sanitation problem because she or other female members of her family cannot go to the bathroom in the daytime. They faced a major problem in cooking and rearing domestic animals because they could not manage firewood, food, or other necessary elements to live. She has tremendous experience related to waterlogging. She has two daughters. The elder daughter is four years old, and the younger daughter is one year old. When her elder daughter is about one year old, her house drowns underwater. One day when she was cooking in the kitchen, her daughter was fallen into the water. One of her neighbors rescued her daughter. Her eyes got wet at the time of describing the incident.

Case Study-2

Case study 2 was created by a woman who is a school teacher. She is the only married breadwinner in her family. After coming back from school, she has to finish the housework. Her husband is a farmer, but most of the land remains under water due to waterlogging. So, he is not able to cultivate crops. So, it is not easy for her to maintain everything. She has two children and they both go to school. Children cannot go to school during waterlogging. The school grounds are under water most of the year. So, students cannot play and their physical health is deteriorating day by day. Being a teacher and attending regular academic activities is also problematic for her to go to school. When the waterlogging continued, she had to go by boat as her school was five kilometers from her home. Most of the roads are under water. So, boats are the only way to get from one place to another.

A health hazard is a major threat at that time. She faced various health problems caused by water and some problems related to psychology. She received some basic treatment from the village doctor, but could not go to a hospital or any specialist as her family did not agree with her. It created some physical problems and every day she fights with herself to overcome the problems. Every member of the women's family in that area

faces various mental and physical problems, but the women cannot express themselves. One of the main problems is that family members never pay attention to their problems.

Another important issue is related to livestock safety. She had three cows, but during the waterlogging she lacked food. Her cowshed was submerged under water. So, she had to shift his cow to her relative's house. But the cow drank the contaminated water and contracted a waterborne disease and all the cows died.

General Discussion

The Crunch model primarily focuses on both processes and structures, which involve local, institutional and government agencies in disaster response strategies as well as watersheds. This model suggests that several social, economic, political and environmental factors negatively affect disaster risk mitigation as well as adaptation processes, which is one of the fundamental concerns of current research. Also, this model plays an important role in understanding adaptation processes during disasters as well as waterlogging. This model analyzes how certain social factors disrupt disaster mitigation and adaptation processes. The primary concern of this study is the risk to women. This model helps to understand such hazards. Women are subjected to various types of harassment during natural disasters. Then natural calamities and their vulnerability combine to become major calamities that create mental barriers for them to deal with calamities. For this reason, I think this study is closely related to the disaster crunch model.

Women are the worst victims of waterlogging. They face problems from various sides. First, if women work at home, they face problems in their work. Every day they have to prepare food for their family members. But they face shortage of materials like rice, vegetables etc. At the same time, they lack fire wood and stove. A stove made of clay is destroyed by water. As the family members do not eat three meals a day it is very difficult to cook every meal. During waterlogging most of the family members take one meal a day. Thus, the calorie requirement per person remains incomplete. Hence, it poses various health risks to people especially women.

Women cannot wash their clothes due to lack of clean water. So, they use dirty clothes and utensils which spread disease. Working women face safety issues related to their transportation. During this time, due to waterlogged roads, there is a regular shortage of vehicles, sometimes the roads are broken. So, everyone has to walk but it is very unusual for women. Because after returning from work, she has to finish the housework. If she can't come earlier, she won't be able to finish her

homework. At the same time, it creates problems with their security. Lack of normal transport forces him to take crowded vehicles. Many times, women cannot get into the car. So, they are late to return home. As a result, family members are worried about his safety.

When waterlogging continues for months, family members take shelter along high roads or in schools or relative's homes. So, sheltering on the roadside is totally unsafe for everyone especially women. Women face both physical and mental problems. She cannot do her regular work. She is always worried about security and future. At the same time, they are under tension of various types of physical attacks. There is a lack of psychologists or social workers to help women in those places. Villagers face problems with sanitation and most of the villagers do natural work in the open. But sanitation problems for women and girl's are indiscribable. Thus, it poses serious health risks to women and girls. The situation creates a bitter experience for pregnant women. Their problems cannot be expressed in words.

Conclusions and Recommendations

Waterlogging is an acute problem in the study area located in southwestern Bangladesh. During this time people face various mental and physical problems. Health risks for women and girls are dire. They face problems like sanitation, drinking water, medicines etc. Although there is a lot of research on waterlogging, the issue of women has not been given much importance. Some recommendations are made in light of the findings from the above research:

- The government should take initiatives to re-drench the Kapotaksha and Mukteshwari rivers located in Satkhira and Jessore districts respectively.
- Proper earth spoil management during river mining or dredging.
- Health facilities should be increased especially for women.
- To create alternative sources of livelihood and ensure social security for women.
- Establishing new small and medium industries for income generation where women can easily work.
- Relief agencies should extend their hands massively especially for women during waterlogging.
- Government should appoint a women psychologist or psychiatrist to whom women can freely express their feelings during waterlogging.

The women who did not give up in the battle of life in spite of various adversities saved their families with utmost mercy during the waterlogging with their own abilities. Women play a more prominent role

than men in dealing with flood-related disasters. Due to their efforts, the study area has survived several natural calamities every year. However, if this problem is not eliminated as soon as possible, this region will face extreme danger. So, policy makers need to take quick steps to sustain this region and free women from various problems.

References

Arfin, M., Saika, U. and Huda, K.M. (2012). *Causes of Waterlogging and its effect on women : A case study on Dhaka city (ward no-53) in Bangladesh.* LAP LAMBERT Academic Publishing

Ashraf-ul, A. (2005). "River management in Bangladesh : a people's initiative to solve waterloggin". *Coastal Development Partnership (CDP).* Khulna, Bangladesh.

Awal, M. A. (2014). "Water logging in the south-western coastal region of Bangladesh : local adaption and policy options", *Science Post print 1(1)* Bangladesh Agricultural University, Bangladesh.

Blaikie, P., Cannon, T., and et al (1994). *Disaster Pressure and Release Model in At Risk : Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*, Routledge London.

Bohra-Mishra, P. and Massey, D.S (2010). *Environmental Degradation and Out Migration : New Evidence from Nepal*. J: Office of Population Research, Princeton University, Princeton

Chindarkar N. (2012). "Gender and climate change induced migration proposing a framework for analysis", *Environmental Research Letters*, IOP Publishing Ltd, Vol. 7, No-2.

Chowdhury R.K (2007). *Climate Change Impact and Disaster Vulnerabilities in the Coastal Areas of Bangladesh.* Dhaka.

Massey W., Axinn W., and Ghimire D. (2007). *Environmental change and Out-Migration : Evidence from Nepal.* MI: Population Studies Center, University of Michigan Institute for Social Research, Ann Arbor.

Neelormy S., Adri N., and et al (2009) *Gender dimensions of differential health effects of climate change induced waterlogging : A Case study from coastal Bangladesh,* Climate change : Global Risk, challenges and Decisions, IOP conf. series: Earth and Environmental science 6, IOP Publishing.

Onneshan U. (2007) *The Development Disaster Water logging in the Southwest region of Bangladesh.* Dhaka, Bangladesh

Rahman A, (2008). *Land Cover and Environmental Hazard; Satellite Remote Sensing Approach and Solutions in Bangladesh*, Austria, 9-12 September.

Shreshtha S.S, and Bhandari P. (2007). *Environmental security and labor migration in Nepal Popul.* Environ, 29. P. 25-38.

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় লেখার নিয়মাবলি

১. গবেষণা প্রবন্ধের কম্পোজ করা পাণ্ডুলিপির দুটি কপি ও একটি সিডি (CD) সরাসরি বা ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

২. প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'সুতন্বী এমজে' ফন্টে দুই লাইনের মাঝে ১.৫ ফাঁক রেখে দুই দিকে সমতা (justified) বিধান করে কম্পোজ করতে হবে।

৩. নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখার শিরোনাম, লেখকের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি/পদবি লিপিবদ্ধ থাকবে।

৪. নিবন্ধের শব্দ সংখ্যা হবে অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার)।

৫. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রণীত *আধুনিক বাংলা অভিধান*-এর বানান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. প্রবন্ধের শুরুতে ১০০ শব্দের সারসংক্ষেপ থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ বাংলায় এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ ইংরেজিতে লেখা বাঞ্ছনীয়।

৭. প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতিটি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাঁ দিকে ১/৪ ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে নতুন অনুচ্ছেদে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অক্ষুণ্ন থাকবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না।

৮. মূল পাঠে সারণি (table) ও চিত্রাদি থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যেমন : ১, ২, ৩ ...) প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) প্রদান জরুরি।

৯. মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে তা মূল পাঠের শেষে অন্ত্য-টীকায় (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দিয়ে ([১], [২], [৩] ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

১০. অন্য কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম :

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা* বইয়ের ২৫২তম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হবে :

চিত্রকল্প প্রধানত বিষয়ের আত্মার চেয়ে বিষয়ের শরীর ফলিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষী। অনেক সময় উপমা, রূপক ও প্রতীক : কবিতার এই সব উপচারের ছদ্মপোশাক প'রে লুকিয়ে থাকে চিত্রকল্পে; অবশ্য উপমা, ও প্রতীক মাত্রেই-যে চিত্রকল্প নয়—সে তো বলা বাহুল্য। (মান্নান, ১৯৭৭ : ২৫২)

১১. প্রবন্ধের মূল পাঠের শেষে একটি সহায়কপঞ্জি (reference) থাকবে। এই সহায়কপঞ্জিতে কেবল মূল পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তা বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সহায়কপঞ্জি রচনা করতে হবে, যেখানে প্রথমে বাংলা বই স্থান পাবে। সহায়কপঞ্জি রচনার নিয়ম নিম্নরূপ :

গ্রন্থ

আহমদ শরীফ (১৯৭৭)। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। মুক্তধারা, ঢাকা।

M. A. Rahim (2013). *The History of the University of Dacca,* Dhaka University, Dhaka.

গবেষণা পত্রিকা

আনোয়ার পাশা (১৩৭৫)। 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দুমেলা'। *সাহিত্য পত্রিকা*, দশম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২. গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্যনির্দেশে সকলের নাম থাকতে হবে।
১৩. প্রকাশিত কিংবা প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা গ্রহণ করা হয় না।
১৪. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকাটির দুটি কপি ও নিয়মানুযায়ী সম্মানি পাবেন।

প্রবন্ধ প্রেরণ ও যোগাযোগ

সম্পাদক
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
ই-মেইল : rub.patrika@rub.ac.bd